তন্ত্রকন্যা

(প্রথম খণ্ড)

জিতেন্দ্র মোহন ভৌমিক

দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স
একশো নয়, বিধান সরণী
কলকাতা-চার

তন্ত্রকন্যা (প্রথম খণ্ড)

প্রকাশক :
অলোকনাথ বাগচী
দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স
একশো নয় বিধান সরণি, কলিকাতা-চার

TANTRAKANYA (First Part)
a novel by Jitendra Mohan Bhowmik

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
বাট্, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-নয়

উৎসর্গ

সাহিত্য সেবিকা ও লেখিকা শ্রীমতী
উত্তরা ভৌমিক, এম. এ. এর হাতে
স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ তুলে দিলুম—

তোমার বাবা

গ্রন্থকার সাহিত্যকর্মে সৃষ্টি করেছেন দর্শন ও ধর্মের রস-সৃষ্টি। এভাবে 'তন্ত্রকন্যা'র বিভিন্ন পৃষ্ঠায় তিনি ভারতীয় সাধন-রহস্যের পরিচয় দিয়েছেন। তা'ছাড়া ৫ম পরিচ্ছেদে পুরীর মন্দির ও বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে তিনি ইতিহাস দৃষ্টিরও পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে এটাই আমার বক্তব্য যে, উপন্যাস সাহিত্য-সৃষ্টি কর্মেরই একটি অপরিচ্ছেদ্য অংশ এবং উপন্যাস স্রষ্টা যদি এভাবে উপন্যাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোক-জীবনে বা লোক চরিত্রে ধর্ম ও দর্শনের আলোকপাত করে সমাজ-জীবনকে সত্যের পথে ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন তবেই সাহিত্যসৃষ্টি হয় সার্থক। আমি চক্ষুষ্মান গ্রন্থকারের সাহিত্য-সৃষ্টির তাই প্রশংসা করি ও অভিনন্দন জানাই তাঁর কল্যাণী মনোবৃত্তিকে। সাহিত্য-জগতে এ গ্রন্থ সমাদৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

আমার কথা

'তন্ত্রকন্যা' প্রথম খণ্ড লেখবার পর যাঁর নাম প্রথমেই আমার স্মৃতিপটে উদয় হয় তিনি হলেন সঙ্গীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচী বাণীকণ্ঠ সরস্বতী। গৈরিশ যুগের তিনি ছিলেন সর্বজনখ্যাত সুরকার, নাট্যকার ও বহু প্রতিষ্ঠানের সংগঠক। তিনি কয়েকখানি অপেরাধর্মী বলিষ্ঠ নাটকও লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, দানশীল ও দরিদ্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ। কিন্তু মন স্বভাবতই বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায় যখনই মনে হয় তিনি আর ইহজগতে নেই। এর পরেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি ছিলেন ৺দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ৺তারকনাথ বাগচী। বহুদিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, বহুদিন দেখা হলেই আমরা চিন্তা করেছি ৺দেবকণ্ঠবাবুর নামে একটি পাবলিশিং কোম্পানী সৃষ্টির কথা। তারকদা'র জীবদ্দশায় যদিও তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীঅলোকনাথ বাগচী সঙ্গত কারণেই তার অকুণ্ঠ অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্যদানে 'তন্ত্রকন্যা'র প্রকাশকে তরান্বিত করে তাঁরই পুণ্য স্মৃতি কল্পে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছেন, 'দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স।

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'তন্ত্রকন্যা'র ভূমিকা লিখে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বইখানি পড়ে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন, তাতে বইখানির সারমর্মই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এরজন্য আমি তাঁকে আমার মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এঁদের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহই আমার এই সফলতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই প্রসঙ্গে শ্রীমান্ কঙ্কণ ভৌমিকের কথাও আমি না তুলে পারছি না। গ্রন্থখানির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রুফ্-সংশোধনের কাজে সে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বহু উচ্চাঙ্গের তন্ত্রশাস্ত্র, বেদ-বেদাঙ্গ-

বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ্ ও ধর্মগ্রন্থ আছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ লোকে দুর্বোধ্যতাবশতঃ ঐ সব গ্রন্থ পড়েন না বা পড়বার সুযোগ পান না। সুতরাং ধর্মের ও সাহিত্যের এই প্রয়োজনীয় বৃহৎ দিকটা তাঁদের কাছে চিরদিনই অন্ধকারে থেকে যায়। 'তন্ত্রকন্যা' একখানি সহজপাঠ্য উপন্যাস মাত্র। একটি সুন্দর ও চমকপ্রদ গল্পের মাধ্যমে তন্ত্র, দর্শন ও শাস্ত্রের ছায়াপাতে উপন্যাসখানিকে মধুময় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে বইখানি পড়ে সাধারণ মানুষেরা কিছুটা জ্ঞানার্জন ও তৃপ্তিলাভ করতে পারেন। এখন, বইখানি পড়ে যদি পাঠকগণ কিছুটা আনন্দ লাভ করেন এবং এতে যদি সমাজের সামান্যতমও উপকার হয়, তবে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব।

পরিশেষে আমি কলিকাতা নিউ রূপলেখা প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার সাউ ও কর্মচারীগণকে এই বইয়ের সুষ্ঠু মুদ্রণ ও সময়োচিত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

৯৩/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

গ্রন্থকার

তন্ত্রকন্যা

এক

হাওড়ার বিশিষ্ট আইনজীবি শ্রীধরিত্রী মিত্রের একমাত্র কন্যা লীনার শুভ বিবাহকার্য নির্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হয়ে গেল। পরদিন শুভলগ্নে বরবধূ সকলের আশীর্বাদ গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে এল বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে।

বরের পিতা যোগেশচন্দ্র দে মহাশয় অমলের বিয়ে দিয়ে হৃষ্টমনে 'বউ' ঘরে তুললেন। সকলেই তারিফ করে বললেন, "হ্যাঁ, এ নইলে আবার বউ! রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী—এমনটি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।"

যোগেশের স্ত্রী মালতিদেবীর চোখে-মুখে আনন্দচ্ছটা। আর, না হবেই বা কেন? এতদিনতো একলাটিই ঘরের কোণে মুখ গুঁজে পড়েছিলেন। কেউ দেখবারও ছিলনা, বলবারও ছিলনা; স্বামীপুত্র নিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষায় এতদিন মালতিদেবী উদ্‌গ্রীব হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। আজ ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। তাই তাঁর ঘর আজ ভরে গেছে আলোর বন্যায়, মন উপছে উঠেছে আনন্দ হিল্লোলে। মুখ তুলে তিনি পাশের বাড়ীর মঞ্জুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিগো দিদি, বউ কেমন দেখলে?"

একগাল হেসে হাতের তর্জনীর ডগা থেকে চুণটুকু জিভে তুলে নিয়ে মঞ্জুর মা উত্তর দিল, "হ্যাঁ ভাই গঙ্গাজল, এমনটি না হলে কি তোমার ঘর মানায়! দু'জন দাঁড়ালে মনে হয় যেন লক্ষ্মীনারায়ণ।"

"তাই বলো ভাই, তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" মালতিদেবী এগিয়ে গেলেন।

এদিকে নিমন্ত্রিতদের মৌখিক আদর আপ্যায়ণ শেষ হলে যোগেশ-

বাবু সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করবার মানসে সকলকে নিয়ে ছাদে উঠে গেলেন। সেখানেই নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।

খাওয়া-পর্ব শেষ হতে অধিক রাত হয়ে গেল। এদিকে মালতিদেবী ফুলশয্যার ঘর সাজিয়ে হাঁক দিলেন, "ওরে, কে আছিস ওখানে, অমলকে পাঠিয়ে দে, বৌমা একা রয়েছে।"

কিছুক্ষণ পর অমল এসে ঘরে ঢুকলো। মালতিদেবী বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দিয়ে সরে গেলেন।

অমল দেখতে পেল সাজান খাটের উপর বসে আছে লীনা। তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অমল আবিষ্টের মত লীনার দিকে অগ্রসর হতেই লীনা একদৃষ্টে অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অমল তার একখানি হাত বুকের কাছে তুলে নিয়ে বলে, "কাছে এসো লীনা! বড় ভাল লাগছে আমার—তুমি কত সুন্দর! তুমি কিছু বলবে না লীনা?"

লীনা তবু কথা বলে না, শুধু অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে। হঠাৎ সামনে ভেসে ওঠে এক জোড়া মুখ—মাথায় টোপর ও মুকুট। সে চম্‌কে ওঠে- এক মুহূর্তমাত্র। অমল বলে ওঠে, "কি হ'ল লীনা? কি হ'ল তোমার?"

লীনার পাপড়ির মত ঠোঁট দু'টি কাঁপতে থাকে শুধু।

অমল উদ্‌ভ্রান্তের মত ব'লে ওঠে, "তোমার কি হয়েছে লীনা? কথা বল্‌ছনা কেন? শরীর খারাপ লাগছে? আচ্ছা তুমি শুয়ে পড়ো, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি'।" বলেই অমল ধীরে ধীরে লীনাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল ও সে তার মাথার পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

দু'দিন যেতে না যেতেই যোগেশবাবুর এই সুখের সংসারে কালো ছায়া নেমে এল। কি এক অমঙ্গলাশঙ্কায় যোগেশবাবু ও মালতি

দেবীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এমনটিতো হবার কথা নয়! তবে কেন এমন হল! ছেলের মুখ থেকেও কোন সদুত্তর না পেয়ে তাই মালতিদেবী অমলের বন্ধু পাশের বাড়ীর সত্যেনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে সতু! তুইতো প্রথম দিন কনে দেখতে গেছিলি। কি দেখেছিলি বল্‌তো? কনে তোদের সঙ্গে কথা কয়েছিলো?"

"তুমি যে কি বলো মাসীমা! শুধু কথা কইবে কেন? আমাদের সকলকেই তো বৌদি গান গেয়ে শোনালেন। তাঁর গান শুনে তো আমরা সকলেই মোহিত হয়ে পড়েছিলুম। অমল তো সবই জানে।"

"সেই কথাই তো সকলেই এসে বলেছিলি। তবে কেন এমন হল!" মালতিদেবীর মুখে চাপা উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল।

"আচ্ছা মাসীমা, বৌদি কি একদম কথা বলছে না? এমনও তো হতে পারে নতুন জায়গায় এসে গুম্ খেয়ে গেছেন?" সত্যেন বোঝাবার চেষ্টা করে।

"তাহলে তো কথাই ছিলনারে! মুখচোখের ভাবেও তো বুঝতে পারতুম সেটা! তা' নয়রে সতু, আমাদের কপাল পুড়েছে, ও একেবারেই বোবা!"

"তা কেমন করে হয় মাসীমা? আমি তো আর একা ছিলুম না, রমেন ছিল, কাজল ছিল, পতাই ছিল। তুমি কি বলতে চাও আমাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়েছেন বৌদি?" সত্যেনের মনে কেমন যেন খট্‌কা লাগে।

মালতিদেবী কি যেন চিন্তা করে বলেন, "আচ্ছা, বৌমার কোন যমজ বোন-টোন ছিল কি?"

বস্তুত, মালতিদেবীর এ প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, তাঁরা লীনার বাপের বাড়ীর সমস্ত খুঁটি-নাটি খবর যাচাই করেই সেখানে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন; বৈবাহিক ধরিত্রীবাবুর এই একটি মাত্রই মেয়ে, অন্য কোন সন্তানাদি তাঁর নেই। তবে দিশাহারা মনের গ্লানি

কাটাবার জন্য শেষ আশা হিসাবেই তিনি সত্যেনকে এই প্রশ্ন করে বসলেন।

সত্যেনের কাছ থেকেও কোন সদুত্তর না পেয়ে মালতি-দেবী ভেঙ্গে পড়লেন। যোগেশবাবুও যেন এই ক'দিনেই কেমন হয়ে গেছেন। তাঁরও ঐ একটিমাত্র ছেলে অমল। মনে তাঁরও কত আশা ছিল, কত আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আকাশ কুসুমের মত সে সবই যেন হাওয়ায় উপে গেল। ছেলের মুখের দিকে তিনি তাকাতে পারেন না। কি এক অব্যক্ত বেদনায় মন তাঁর হাহাকার করে ওঠে।

সময় এক ভাবেই কেটে চলল। ঘটনাস্রোতও ভিন্নগতি নিলনা। কিন্তু মায়ের প্রাণ। মালতিদেবীর চিন্তাধারা এক ভিন্নমুখী গতিতে বেয়ে চলল। তাই উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করে তিনি কালক্ষেপ করতে লাগলেন।

সময়ও জুটে গেল।

একদিন নিভৃতে তিনি পুত্রকে ডেকে বললেন, "অমল, বাবা, একটি কথা বলব যদি কিছু না বলিস।"

"কি এমন কথা মা?" অমল সাগ্রহে মায়ের মুখের দিকে তাকাল।

দ্বিধাগ্রস্তভাবে সংক্ষেপে মালতিদেবী বললেন, "তুই আবার বিয়ে করনা বাবা? আমরা ভাল মেয়ের সন্ধান করে আবার তোর বিয়ে দিতে পারি।"

"ভাল করে সন্ধান করেই কি এ বিয়ে তোমরা দিয়েছিলে না মা?"

"তা বললে কি হয় বাবা! এই ভাবেই কি তুই তোর জীবনটা নষ্ট করবি?"

"কিন্তু পুনরায় বিয়ে করলেই কি লীনার জীবন সার্থক হবে? একজনের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশায় আর একজনের জীবনে

দুঃখ এনে লাভ কি মা? আর তাতেই কি সত্যিকারের শান্তি আসবে বলে তুমি মনে কর?"

পুত্রের এই উত্তরে মালতিদেবী যেন কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু সম্পূর্ণ খেই হারালেন না। তাই, কণ্ঠস্বরটাকে আরো কিছুটা বেদনার্ত করে তিনি বললেন, "বউমারতো দাম্পত্য জীবনের প্রতি কোন আসক্তিই নেই বলে আমাদের মনে হয়; কি যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব; পার্থিব কোন কিছুর উপরেই যেন কোন আসক্তি নেই। কাজেই তুই আবার বিয়ে করলে তাতে কোন দোষ হবেনা, আর, বৌমারও মনের কোন প্রতিফলন হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে বাবা?'

অমল কিছুক্ষণ নীরব থেকে দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "মা, ভগবানের যখন এইটাই নীরব নির্দেশ, তখন এইটাই আমাকে মেনে নিতে হবে! আমার কোন কষ্ট হবে না মা, সব অবস্থাতেই আমি আমাকে খাপ খাইয়ে নেব। আমার জীবনে যে সম্পত্তি আমি পেয়েছি, আমি তাতেই খুসী থাকতে চাই, তাঁর নির্দেশকেই আমি স্বাগত জানিয়েছি।"

মালতিদেবী তবুও পুত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, "তুই যাই কিছু কেন বলিস না বাবা, আমি মা, তোর মুখ দেখে আমি যে সব বুঝতে পাচ্ছি বাবা! তুই আর আপত্তি করিস নে!"

"মা, এবিষয় নিয়ে তুমি আর আমায় পেড়াপিড়ি করনা, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ভগবানেরও এই ইচ্ছা। তুমি, শুধু আমাকে আশীর্বাদ কর, জীবনে যেন আমি কর্তব্যচ্যুত না হই।" অমল বলল।

পুত্রের এই উত্তরের পর মালতিদেবীর যেন আর কিছুই বলবার রইল না। তিনি একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে স্থান ত্যাগ করলেন, ভাবলেন, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয় তো কোনদিন পুত্রের মনেরও পরিবর্তন হতে পারে এবং তারজন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

যেন সে তাঁদের দিকে তাকাল। যেন সে বলতে চায়, 'তোমরা ভেতরে যাওমা, আমার কাজে তোমরা বাধা দিওনা।'

যোগেশবাবু বুঝতে পারলেন এভাবে বৌমার মন ঘোরাতে পারা যাবে না। তাই তিনি আর অযথা কালক্ষেপ না করে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি মালতিদেবীকে নিম্নস্বরে বলে গেলেন, "বৃথা চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। তবে তুমি দেখো।"

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে যোগেশবাবু তাঁর আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে ছাদের কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে কি যেন ভাবতে লাগলেন। এক্ষেত্রে তার ভাবনা-সূত্রের বিষয়বস্তু অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না।

এই সময় তাঁর বন্ধুরা গোপালবাবু, হরিপদডাক্তার ও গিরীনবাবু কক্ষ প্রবিষ্ট হলেন। প্রায়ই তাঁরা এইসময় এসে আড্ডা জমান।

অন্যমনস্কতা বশতঃ যোগেশবাবু তাঁদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন নি। হঠাৎ মৃদুশব্দে তাঁর সম্বিত ফিরে আসতেই তিনি ধড়্মড়্ করে উঠে বসে বললেন, "এসো···ব'স।"

বসতে বসতে গোপালবাবু বললেন, "তারপর? বাড়ীর খবর বল। বৌমা কি এখন মন্দিরেই থাকেন?"

যোগেশবাবু উত্তর দেন, "তা' একরকম তাই। বেশভূষার কোন বালাই নেই, আহারের মধ্যে পূজার প্রসাদ, ফলমূল। কখনো কখনো নিজের হাতেই কিছু আতপচাল ফুটিয়ে নেয়। নিত্য নূতন উপসর্গেরও বিরাম নেই। এইমাত্র দেখে এলুম থান্ কাপড় পরে বৌমা মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো।"

গিরিনবাবু বলে উঠলেন, "থান্ কাপড়!"

যোগেশবাবু একটি ছোট্ট শব্দ করলেন, "হুঁ!"

ছোট্ট হলেও ওইটুকুতেই তাঁর মনের কথা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়।

এবার গিরীনবাবু একটু উপদেশচ্ছলেই যেন বললেন, "আচ্ছা, কোন ভালো ওঝাকে ডেকে, মানে একটু ঝাড়িয়ে নিলে হয় না? কোন অশরীরীর উৎপাতও তো হতে পারে?"

হরিপদডাক্তার প্রতিবাদের সুরে বললেন, "দেখো, যে যাই বলুক, আমি কিন্তু ওসব কথা বিশ্বাসই করি না। আমি তো দেখেছি—মন্দিরে বসে আছে বৌমা যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। ভূতে পেলে আবার কেউ মন্দিরে গিয়ে ঢোকে নাকি? এর পেছনে কোন রহস্য আছে যা মানুষের বুদ্ধির অগোচর।"

সান্ত্বনার ছলে গোপালবাবু বললেন, "যাক্, ভেবে আর কি করবে ভাই! দেখো শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়।"

তাঁদের কথার ফাঁকে ভৃত্য ট্রেতে করে চা এনে সামনের টেবিলের উপর রেখে চলে গেল।

গিরীনবাবু মন্তব্য কবলেন, "চাকরটা দেখ্ছি নূতন?"

যোগেশবাবু উত্তর দেন, "হ্যাঁ, বৌমার তদ্বিরের জন্যই ওকে রাখা—খুব বিশ্বাসী।"

গোপালবাবু এই সময় স্মরণ করিয়ে দেন, "তা' এবার উঠবে তো? পরিমলবাবু কিন্তু তাঁর বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করছেন দাবার ছক সাজিয়ে, দেখে এলুম।"

যোগেশবাবু বললেন, "সামনে চা-টা রেখে আর কি করে যাই। কি বল তোমরা?"

"নিশ্চয়ই। শুধু চা হলে কথা ছিল। সঙ্গে রয়েছে 'টা'!" হরিপদডাক্তার জোরালো মন্তব্য করেন। সকলে হেসে ওঠেন। মনখোলা হাসিই বলতে হয়।

চায়ের পর্ব শেষ করে সকলে উঠলেন।

সেই সময় দেখা গেল দু'টি তরুণী ঘরে ঢুকলো। যোগেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে রানু তোরা?"

"এই, দেখা করতে এলুম। মাসীমা কোথায়?" রানু জিজ্ঞেস করে।

"আসছে, ব'স। আমরা একটু আসছি। চলে যাসনে, সন্ধ্যাকে চা খাইয়ে দিবি, বস্।" বলে যোগেশবাবু সকলকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

চেয়ারে বসতে বসতে রান্নু জিজ্ঞেস করে, "তুই কি অমলদার বিয়ের পর এই প্রথম এলি ?"

সন্ধ্যা উত্তর দেয়, "না, আরো একদিন এসেছিলাম। বউদির ব্যাপারে মাসীমার মনটাও ভাল ছিল না। তাই বেশীক্ষণ বসিনি।"

"অমলদার কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয় ভাই! আমাদের ওই প্রতিমার সঙ্গেই অমলদার বিয়ের কথা উঠেছিল। তারপর কিসে যে কি হয়ে গেল!" বলে রান্নু একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করল।

তার কথার জের টেনে সন্ধ্যা বলল, "প্রতিমাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। আবো, অমলদার অসহায় অবস্থার কথাটা ভেবেও ও আরো মুষড়ে পড়েছে। হাজার হ'ক মেয়েছেলের মন তো!"

রান্নু তার কথায় সায় দেয়, বলে, "মাসীমার ভাগ্যটাই বা কি! আর একটা ছেলে থাকলে না হয় কথা ছিল। অত ঘটা করে বিয়ে দিলেন! তুই দেখবি একদিন···এই, চল্ অমলদার ঘরে; তাঁর সঙ্গেই না হয় আগে দেখা করে আসি।" বলে তারা উঠে গেল।

দুই

মাসাধিক কাল হল যোগেশবাবুর পুত্রবধূ লীনা নিজের শয়নঘর ছেড়ে শিবমন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বাড়ীর ভেতরে সে প্রবেশ করে না। তার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যোগেশবাবুর শান্তিময় সংসারে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোড়নের ঢেউ শুধু এই বাড়ীর গণ্ডির মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। পাড়ায় পাড়ায় এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অনেকে অনেক কথাই বলছে। কেউ বলছে—বউটাকে সত্যি ভূতে পেয়েছে। যোগেশবাবুর উচিৎ এর একটা বিহিত করা। আবার কেউ বলছে —এমন দিব্বি সুন্দর চেহারা! থান্ পরে বসে আছে যেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী!

কিন্তু এই প্রকার সমালোচনা যোগেশবাবুর উদ্যান মধ্যস্থিত মন্দিরাশ্রিত একাগ্রচিত্তা লীনার মনে কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গন চৌদ্দটি দীপবর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

যোগেশবাবুর বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনের চতুর্দিকে ফুলোদ্যান। এই উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে একটি শিব মন্দির। যোগেশবাবুর প্রপিতামহ নয়নচাঁদ দে মহাশয় এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহটি খুবই জাগ্রত। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে আশে পাশের বহু ধর্মপ্রাণ নর-নারী এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। এই মন্দির তত্ত্বাবধানের যাবতীয় খরচ বংশানুক্রমে যোগেশবাবুরাই করে আসছেন।

যোগেশবাবুর পুত্রবধূ লীনা এই মন্দিরে আশ্রয় নেবার পর তাকে অন্দরে ফিরিয়ে নেবার বহু প্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। তাই উপায়ান্তর না দেখে, পুত্রবধূ লীনার সর্ব-প্রকার নিরাপত্তার জন্য মন্দিরেরই একপার্শ্বে একটি ঘরে সর্বক্ষণের

জন্য যোগেশবাবু একজন পাহারাদার নিযুক্ত করেছেন। পাহারাদার লগন কোঁহার অবাঙ্গালী, জাতিতে কুমার।

অমাবস্যার রাত।

মন্দিরের চৌদ্দদীপবর্তিকার আলো আজ যেন মন্দিরটিকে অধিকতর উদ্ভাসিত করে তুলেছে। লীনা তার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদি নিষ্পন্ন করে এক মোহময়ভাবে মন্দির মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গের সম্মুখে যোগাসনে বসে অতি অভিনিবেশ সহকারে দেবতার ধ্যানে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিল। কতক্ষণ যে সে এই ভাবে ছিল তা সে নিজেও হয়তো জানেনা। নিথর নিস্তব্ধ সে মূর্তি! মনে হল যেন পাষাণ দেবতার মূর্তির সম্মুখে ধ্যানগ্রস্তা এক জাগ্রতা দেবীমূর্তি! কি এক আকিঞ্চন নিয়ে সে যেন পাষাণের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। তবে কেন লোকে তার এই দশান্তরের জন্য তার বিরূপ সমালোচনা করছে! কেন তার চালচলনকে অশরীরীর প্রভাব বলে তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে! সত্যিই কি লীনা বাক্‌শক্তিহীনা, মূক! মূক হলে কি কেউ দেবতার সম্মুখে বসে তাঁর উদ্দেশ্যে ওষ্ঠ সঞ্চালন করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারে! আজ পৃথিবীর সকল অবিশ্বাসীরা এসে দেখুক! দেখুক, ধর্মপ্রাণা, সৌম্যদর্শনা এই নারী সত্যিই কি বাক্‌শক্তি রহিতা, সমাজ শৃঙ্খলা বিমুখা!

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লীনা একইভাবে বসে। তারপর কখন যে সে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা' কেউ জানেনা।

রাত তিনটার সময় কিসের শব্দে অমলের নিদ্রাভঙ্গ হল। মনে হল কে যেন আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল। অমল উৎকর্ণ হয়ে শয্যার উপর উঠে বসল। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার।

হঠাৎ তার মনে হল, কি যেন একটা দরজার উপর এসে পড়ল। তার গাটা ছম্ ছম্ করে উঠল। মনে সাহস সঞ্চয় করে সে শয্যা

থেকে নেমে এসে দেওয়ালের সুইচ টিপে দিতেই আলোর বন্যায় ঘর ভরে গেল।

অমল দরজার কাছে সরে গিয়ে অর্গল মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে উভয় কপাট পেছনে সরে এল ও সেই সঙ্গে একটা মানুষের দেহ গড়িয়ে তার পায়ের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চমকে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে অমল এবার আলোয় লোকটির মুখ দেখতে পেল। কি আশ্চর্য! এ যে বাগানবাড়ীর পাহারাদার লগন কোঁহার! ভয়ে তার চোখদু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। কি এক গভীর আতঙ্কে তার ওষ্ঠদ্বয় যেন তখনও কাঁপছিল।

অমল তার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে, তার গায়ে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করল, "লগন! কি হয়েছে? তুমি অমন করে কাঁপছ কেন?"

লগন কিছুক্ষণ অমলের দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে রইল; তারপর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠে সে ধীরে ধীরে উঠে বসল।

অমল পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে লগন?"

লগন শুধু বলল, "ছোটবাবু, আমি দেশে চলে যাব, আর আমি থাকবো না।" সে তখনও কাঁপছিল।

"বেশ তো যাবে; কিন্তু হয়েছেটা কি বলবে তো?" অমলের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের চিহ্ন।

লগন এবার চোখদু'টোকে আরো বড় করে বাইরের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, "ঐ বাগানে—শিবমন্দিরে—"

"শিব মন্দিরে! কি হয়েছে?" কি এক আশঙ্কায় অমলের মন আলোড়িত হয়ে উঠল।

"আপনি দেখবে চলো।"

"ওঠো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, দেখি কি হয়েছে।··এসো!"

অমল দরজা পেরিয়ে অগ্রসর হতেই লগনও স্খলিতপদে তার অনুসরণ করল।

অন্দরমহল পেরিয়ে সদর দরজার কাছে এলেই বাগানের পূর্ণ ছবিটা নজরে পড়ে। বাগানের মধ্যস্থলে শিবমন্দির।

অমল দরজার নীচের সিঁড়ি ভেঙ্গে মাটিতে নামতেই যে দৃশ্য এবার তার চোখে পড়ল তাতে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। সে দেখতে পেল মন্দিরের উচু মার্বেল পাথরের ঘোরান বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারীমূর্তি। নারীমূর্তির হস্তে জ্বলন্ত মৃন্ময় প্রদীপ। কিন্তু প্রদীপের শিখাটি যেন অত্যধিক জোরালোভাবে আলো বিকিরণ করছে। মৃন্ময় প্রদীপের শিখা কি এত প্রদীপ্ত হয়! নারীমূর্তি মন্দিরের বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে মুখ করে আছে।

অমল কম্পিতপদে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল। এবার সে সাশ্চর্যে দেখতে পেল নারীমূর্তি আর কেউ নয়—লীনা। সে আরো দেখতে পেল, লীনা বাগানের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে। কিন্তু কাদের বলছে বা কি বলছে, কিছুই সে বুঝতে পারল না। কি এক আশঙ্কায় তার মনটা ছুরু ছুরু করতে লাগল, গা'টাও যেন ছমছম করতে লাগল। কম্পিত পদে নির্বাক বিস্ময়ে সে শুধু সেইদিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ যেন অমলের কানে এল লীনা বলছে, "তোরা শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করতে আসিস্ কেন? যা' করলে তোদের গতি হয় তাতো আমি করছি। এখন চলে যা,' আগামী অমাবস্যার তিথিতে এই সময় আবার আসবি। বুঝলি?"

মনে হল যাদের উদ্দেশ্যে লীনা এই কথাগুলি উচ্চারণ করল, তারা তার মনোভাব বুঝতে পেরে যেন সরে গেল। কারণ লীনা তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আবার কাউকে যেন বলছে, "আমি তোর ব্যবস্থা সূর্যোদয়ের পরেই করে দিচ্ছি, তোকে আর আসতে হবে না, ওতেই তোর গতি হয়ে যাবে।"

লীনা তার হাতের প্রদীপটি এবার একটু তুলে ধরল; মনে হল

যাদের সঙ্গে সে এতক্ষণ কথা বলছিল তারা যেন সব চলে যাচ্ছে এবং সে প্রদীপ উঁচিয়ে তাদের পথ দেখাচ্ছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত অমল এতক্ষণ সব দেখছিল ও শুনছিল। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসতেই সে তার মোহাচ্ছন্ন ঘোর কাটিয়ে এক কঠিন কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করল। সে এখন বেশ বুঝতে পারল কোন দৈবদুর্ঘটনায় লীনা তার বাক্ শক্তি হারিয়ে ফেলেনি। বিয়ের পূর্বেও সে যেভাবে কথা বলতে পারতো, এখনও সে সেইভাবেই কথা বলছে। এতে তার মনের গ্লানি অনেকটা প্রশমিত হল ও মনে সাহস সঞ্চয় করে সে বারান্দার অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে ঠিক লীনার পেছনে এসে দাঁড়াল এবং গদগদ কণ্ঠে ডাকল "লীনা!"

লীনা ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল ও ভাববিহীন দৃষ্টিতে অমলের দিকে চেয়ে রইল।

যতই কেন না হোক, লীনা তার পরিণীতা স্ত্রী। যদিও দাম্পত্য মিলনের সে আস্বাদ পায়নি, তথাপি কর্তব্য ছাড়াও একটা স্বাভাবিক প্রেমের অনুপ্রেরণা তার মনে প্রথম থেকেই দানা বেঁধে উঠেছিল। যে সুখের স্বপ্ন সে এতদিন মনে মনে কল্পনা করে এসেছিল, লীনার অবস্থান্তরে যদিও সে সেসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তথাপি তার মানসিক প্রেমোন্মাদনা একটুও হ্রাস না পেয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয়েছে। তাই সে এবার আরো কাতরভাবে ডাকল, "লীনা তুমি কি আমার কোন কথার উত্তর দেবে না? আমি যে সবসময় শুধু তোমার কথাই ভাবি লীনা।"

মনে হল এই সময় লীনার ওষ্ঠদ্বয়ে এক চাপা স্নিগ্ধ হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল অমলের এই পার্থিব ভাবাবেগকে করুণা করেই যেন তার ওষ্ঠপ্রান্তে এই হাসির বিদ্যুচ্ছটা। কিন্তু পরক্ষণেই সে কঠিনভাবে অমলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আমি এইমাত্র শেষ যার সঙ্গে কথা বললুম চিনিস তুই তাকে?"

লীনার এইপ্রকার আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে অমল হক-

চকিয়ে গেল। সে কার কথা বলছে কিছুই বুঝতে না পেরে অমল শুধু উত্তর দিল, "তুমি কার কথা বলছ লীনা? আমিতো কাউকে দেখতে পাইনি?"

"ও।···ওইযেরে, হারাণ ডাক্তারের নাতিটা। এক পার্থিব জিনিসের আকর্ষণে নীতিভ্রষ্ট হয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গতিতো ওর একটা করে দিতে হবে! তাই তো ওকে বলে দিলুম, কাল সূর্যোদয়ের পরই সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।"

অমলের চোখ কপালে উঠল! সে বিস্ময় বিমূঢ় ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "হারাণ ডাক্তারেরতো ঐ একটাই নাতি ছিল, পান্তু। তা' সেতো দু'মাস হল মারা গেছে?"

"হ্যাঁ।···তুই প্রত্যুষেই গিয়ে হারাণকে বলবি, পান্তু মরবার পূর্বে সে যে সব দুষ্প্রাপ্য 'ষ্ট্যাম্প' সংগ্রহ করে রেখেছিল সেগুলি তার ঘরের উত্তরদিক্‌কার কুলুঙ্গিতে রাখা আছে। এখনই যেন সে ঐগুলি পুড়িয়ে দেয়। কারণ, ঐগুলির মোহেই পান্তুর কোন গতি হচ্ছে না।" বলে লীনা উত্তরের প্রত্যাশা না করেই প্রদীপটি নিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে অর্গলবদ্ধ করে দিল।

তিন

লীনার কাছ থেকে ফিরে অমল আবার তার নিজের ঘরে এসে উপস্থিত হল। তার মনে নানা প্রশ্ন জট্ পাকিয়ে উঠল। কিন্তু মনের কাছ থেকে কোন সদুত্তরই সে পেল না। এতদিন সে জানতো কোন দৈব বিড়ম্বনায় লীনা তার বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তাতো নয়! এই মাত্র সে তার সঙ্গে বেশ স্পষ্টভাবেই তো কথাবার্তা বলল। কোন জড়তা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, ধীরভাবেই সে কথাগুলো বলে গেল। অধিকন্তু, তার সম্বোধনটা যেন একটু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিয়ের পর তার সঙ্গে লীনার এই প্রথম বাক্যালাপ। তাতে কোনরূপ শালীনতার বালাই নেই, পারস্পরিক অনুরাগের কোন মোহ নেই। আছে শুধু কর্তব্য পীড়িত এক আদেশের সুর। আরো একটা ব্যাপারে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। লীনা কি তবে শেষ অবধি অশরীরীদের কবলে গিয়ে পড়েছে! তার এই মানসিক আকস্মিক অবস্থান্তরের জন্য কি তবে ওরাই দায়ী!

কিন্তু তার এই সকল প্রশ্নের উত্তর কে দেবে! তার মনে এক দারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হল। মানসিক উত্তেজনায় সে কক্ষময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। তার মনে সন্দেহ হল সত্যিই কি লীনা অশরীরীদের সঙ্গে কথা বলছিল! সত্যি কি সে ওদের চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছিল! স্থূলদেহী মানুষ কি কখনো সূক্ষ্মদেহীর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে! হঠাৎ তার মনে পড়ল সেক্‌সপিয়ার বর্ণিত ওথেলোর কথা, চাণক্যের মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রায়শই কথোপকথন ও তার কাছ থেকে উপদেশগ্রহণের কথা। তার আরোমনেপড়ে গেল, আধুনিককালে অনেক মনিষীই তো অশরীরীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। মন্ত্র-আবাহন বা প্ল্যাঞ্চেটেও সে সূক্ষ্মাত্মাদের আগমন ও বাক্য বিনিময়ের বহু প্রামাণ্য ঘটনার কথা শুনেছে। সুতরাং যে

শক্তির প্রভাবে, যে জ্ঞানের আলোকে স্থূলদেহীর পক্ষে সূক্ষ্মদেহীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব, লীনাও কি তবে সেই ক্ষমতা বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে !

যতই অমল এইসব কথা চিন্তা করতে লাগল ততই তার মন দারুণ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে এক ভাবান্তব উপস্থিত হল। লীনা তার সঙ্গে আজ কথা বলেছে। তাহলেতো সুযোগের অপেক্ষায় থেকে সে আবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা কবতে পারে। আর যদি সে সে সুযোগ পায় তবে লীনাব কাছ থেকে এই অশরীবী সংক্রান্ত সব খবরই সে জেনে নিতে পারবে। কেনই বা সে সংসাব ছেড়ে সন্ন্যাসিনীর পথ বেছে নিল, কেনই বা সে স্বামীসঙ্গ ত্যাগ কবে নির্জন মন্দিরে এসে আশ্রয় নিল সব কিছুই সে তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে। এক নতুন অভিব্যক্তিতে তার বিক্ষুব্ধ মন মেতে উঠল।

শেষ রাতটুকুতে আর তার ঘুম হলনা।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেই সে ছুটে চলল হারাণ ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

হারাণ ডাক্তার প্রাচীন বিজ্ঞ চিকিৎসক। স্থানীয় বড় চিকিৎসক হিসাবে তাঁর বেশ নামডাক আছে। লোকটির আচার ব্যবহারও খুব ভাল। ইদানীং একটিমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধ বয়সে তিনি মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। তাই নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি বড় বাইরে বেরোন না।

অন্যান্য দিনের ন্যায় অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করে নৈমিত্তিক কার্য সমাধা করে তিনি সবে মাত্র তাঁর চেম্বারে এসে বসেছেন। এমন সময় অমলকে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হতে দেখেই কোন কিছু আশঙ্কা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অমল বাবা, কি মনে করে? বাড়ীর সব ভালত ?"

কোন কিছু ভূমিকা না করে অমল বলে উঠল, "জ্যাঠামশাই, াপনাকে একবার এখুনি আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে। তার আগে ন্তু যে ঘরে থাকতো সেই ঘরের উত্তর দিক্‌কার কুলুঙ্গীতে দেখুন ্যকগুলি ষ্ট্যাম্প লুকানো আছে। সেগুলিকে বার করে এনে াগে এখুনি পুড়িয়ে ফেলুন।"

"কি ব্যাপার! আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা বাবা! কি হয়েছে আমায় খুলে বল।" বৃদ্ধের মুখে বিস্ময়ের াভাষ।"

"ওই ষ্ট্যাম্প গুলোর জন্যেই নাকি পান্তর আত্মার গতি হচ্ছেনা। াপনার বৌমা শেষরাতে আমায় সেই কথাই বললে।"

অমলের সব কথা শুনে বৃদ্ধ দ্বিরুক্তি না করে লীনার নির্দেশ মত সকল কাজ সমাধা করে যখন অমলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

হারাণ ডাক্তার কি এক আশা নিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা হল 'মাকে' সন্তুষ্ট করে সে তার কাছ থেকে পান্তু সংক্রান্ত কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা সফল হলনা। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ উপবিষ্টা লীনা তাঁর শত কাকুতি মিনতিতেও তাঁর দিকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরে তাকাল না। বিফল মনোরথ হয়ে সেদিন বৃদ্ধকে হতাশ মনে ফিরে যেতে হল।

কিছু দিন পর।

গভীর রাত্রে যখন সকলেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে ঠিক সেই সময় অমল প্রায় প্রতি রাত্রেই সকলের অলক্ষ্যে নিজের শয্যা ত্যাগ করে বহির্বাটীস্থ উদ্যান মধ্যস্থিত শিবমন্দিরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তার সব সময়ই যেন মনে হয় লীনা মন্দিরের দরজা খুলে এবার বেরিয়ে আসবে এবং সেও তার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হবে তার নের ইচ্ছা জানাবার জন্য। রাতের পর রাত কি এক অদম্য আগ্রহ নিয়ে ভক্ত পূজারীর মত সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কিন্তু

তার মনোস্কামনা আর পূর্ণ হয় না, লীনার দেখা সে কোনদিনই পায় না। শেষে বিফল মনোরথ হয়ে প্রতি রাত্রেই সে ফিরে যায় নিজের শয়ন কক্ষে। এই বিফলতাই যেন তাকে উৎসাহ দেয় প্রতিনিয়ত। কিন্তু কি সে জিজ্ঞাসা করতে চায় লীনাকে? তার প্রশ্নের উত্তর আদায় করবার জন্যই কি তার এই কৃচ্ছসাধন? মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা শুধু এই কথারই সমর্থন পাওয়া যায় না। অপর যেকোন কারণের চেয়ে লীনার উপস্থিতিই তার অধিক কাম্য। বিবাহের পর থেকেই সে লীনার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত। বিবাহিত জীবনের কোন সুখ আহ্লাদেব আস্বাদই সে পেল না। তাই সর্বক্ষণ কি এক রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মনোবেদনায় তার বুভুক্ষু মন গুম্‌রে ওঠে। প্রতিদিনকার এই বিফলতাও যেন তার কাছে কত মধুর, কত আকাঙ্ক্ষিত। তার বিরহীমনের এই শাশ্বত উন্মাদনাই তাকে টেনে আনে এইখানে, রাতের পর রাত এক বিরামহীন অনুপ্রেরণায়।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল আবার সেই অমাবস্যার তিথি ফিরে এল। হঠাৎ একটি সম্ভাবনার কথা তার মনে উঁকি দিয়ে উঠল। যেদিন তার সঙ্গে লীনার দেখা হয়েছিল সেইদিন সেই অশরীরীদের উদ্দেশ করে সে বলেছিল পরবর্তী অমাবস্যার রাতে দেখা করবার জন্য। আজইত সেই দিন। কি এক সম্ভাবনার আশায় তার মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

শয্যায় শয়ন করে কিছুতেই অমলের নিদ্রাকর্ষণ হল না। একটু একটু করে রাত বেড়ে চলল মন্থর গতিতে। প্রতিটি মুহূর্ত এত বিলম্বিত যে এর পূর্বে সে কখনো তা উপলব্ধি করেনি। সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটির জন্য সে অধীরাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে দু'টো বাজল।

অমল ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসল। বেড্ সুইচ্ টিপে দিতেই সমস্ত কক্ষ আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দৃষ্টি অবনত করে আলোর প্রখরতা সয়ে এলে মুখ তুলে সামনে তাকাতেই তার

নজর পড়ল দেয়ালে ঝুলান লীনার ফটোটির উপর। ক্ষণিকের জন্য সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে অমল শয্যা ত্যাগ করে আল্না থেকে পাঞ্জাবীটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। যাবার পূর্বে সে কক্ষের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে গেল।

উদ্যানে পা দিয়েই অমল দেখতে পেল জ্বলন্ত মৃৎ-প্রদীপ হস্তে লীনা তার দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল সে যেন তারই জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

অমল তার নিকটবর্তী হতেই লীনা বলল, "তোর দেরী দেখে ভাবলুম তুই বুঝি আর এলিনা। ওরাও সব চলে গেল কিনা! আয় বস্ এখানে।" বলেই লীনা দীপবর্তিকাটি পাথরের বারান্দার উপর রেখে নিজেও সেইখানে বসে পড়ল।

অমল ধীরে ধীরে লীনার পাশে গিয়ে বসল ও স্থির দৃষ্টিতে তার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কি দেখছিস? কিছু জিজ্ঞাসা করবি?"

"তুমি বুঝি ওই সব অশরীরীদের দেখতে পাও?" অমল প্রশ্ন করে বসল।

"হ্যাঁরে। তুইও তো দেখতে পারিস চেষ্টা করলে। পারিস্ না?"

"কৈ, নাতো? ও তো আলাদা শক্তি।"

"ওরে শোন্ বলি।" লীনা একবার চারদিকে দেখে পুনরায় বলতে লাগল, "কোন কিছু পরম শক্তির আশ্রয় হল ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের মনে পবিত্রতা বা শক্তি এনে দেয়। সকল মানুষের মনেই এই স্বর্গীয় পবিত্রতা বা শক্তি বিদ্যমান। বেদান্তে আছে শুধু মানুষই নয়, সৃষ্টির সকল জীবের মধ্যেই এমনকি জড় পদার্থেও এই শক্তি বিদ্যমান। বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন রূপে আমরা এই শক্তির

বিকাশ দেখতে পাই। এই বিভিন্নতা কোন বিশেষ আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে না ; নির্ভর করে আঙ্গিকের পৃথক জ্ঞানের বিকাশের উপর। যে মানুষ পশুপ্রকৃতি ভাবাপন্ন হয়, আবার সেই মানুষকেই দেবত্বগুণে মণ্ডিত দেখতে পাওয়া যায়। সকল জীবেই এই মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে।"

"তবে আমরাই বা কেন এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারিনা?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

লীনা বলে চলল, "সকল জীবের মধ্যেই যদিও এই জ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত রয়েছে, অজ্ঞানতার বিভিন্ন আবরণে তা' চাপা পড়ে আছে। এই অজ্ঞানতার স্তর যে কাটিয়ে উঠতে পারে সেই এই মহাশক্তির ধারক। তখন সে আর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সবার মধ্যেই সে নিজের বিকাশ দেখতে পায়, তাকেও তখন সকলেই উপলব্ধি করতে পারে। উপনিষদে বলে—জ্ঞান ও কর্ম এই দু'য়ের কোনটাই এককভাবে অনুষ্ঠান করলে কোন ফললাভ হয় না। নিষ্কাম কর্মই চিত্ত শুদ্ধি ঘটায়। কাজেই, শুধু জ্ঞান দ্বারা যারা মোক্ষলাভের চেষ্টা করে তাদের সে চেষ্টা শুভ হয় না। আবার যারা শুধু কর্মের দ্বারাই ভোগের জন্য যত্ন করে, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তাদের সে যত্নও বৃথা হয়ে যায়। তাহলে আমাদের কি করা উচিৎ? আমাদের নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞান ও ভক্তিরূপা ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে মোক্ষ লাভ করার চেষ্টা করা উচিৎ। তাহলেই সে তখন ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। এই জ্ঞানের আলোকে সে সকল দুঃখ কষ্ট ও সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি কাটিয়ে ওঠে। অনুশীলনের দ্বারা তুইও এই শক্তি লাভ করতে পারিস। তখন তুইও সব কিছুই দেখতে পারবি বা বুঝতে পারবি।"

লীনার এই সকল কথায় অমলের মনে এক ভাবের উদয় হল। এতদিন সে যাকে সামান্যা নারীমাত্র বলে ধারণা করে এসেছে, এখন সে বুঝতে পারল, সে সামান্যা নয়। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত

জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি উপায়ে আমরা এই জ্ঞান লাভ করতে পারি?"

লীনা স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দেয়, "আমাদের দেশের যত ধর্ম ও মত আছে তার সকলগুলিই প্রায় বৈদিক ধর্ম ও দর্শনের ছায়া অবলম্বনে উদ্ভূত। সকল ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে মানুষের জীবনের পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য দু'টি জিনিসের প্রয়োজন। একটি, দেহকে সুস্থ রাখবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্যের, পানীয়ের ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের; দেহ সুস্থ থাকলে মানুষ সব কিছু করবার অনুপ্রেরণা পায়। অপরটি, আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করা। এই শক্তির প্রভাবে মানুষ জগতেরও যেমন উপকার করতে পারে, নিজের মনের উপরও তেমনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একদিকে কর্ম ও অপর দিকে সংসারে আবদ্ধ না থেকে ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণই বৈদিক ধর্মের মূল ভিত্তি। কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে কর্মের সকল ফল ভগবানের উপর ছেড়ে দেওয়াই মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম। মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি সংগ্রহের এইটাই একমাত্র নির্ভুল পথ। আমি তোকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এই পথে চললে তুইও চরম শক্তির অধিকারী হতে পারবি।"

"লীনা! তুমি এসব কথা কি করে জানলে? এতদিনতো তোমায় দেখে বুঝতে পারিনি আমরা যে তুমি এত কথা জান!" অমল বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকে।

তার কথা শুনে লীনা হেসে উত্তর দেয়, "কার মনে কি আছে বা কে কতটা পরমার্থিক জ্ঞান পেয়েছে তাকি তার বাহ্যিক আকৃতিতে প্রকাশ পায়? প্রকৃত জ্ঞানের জন্য উপাসনা করলে বা আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারলেই তার দৈহিক চেহারার কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন যা-কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তা' শুধু তার আচার ব্যবহারে, তার মনের বিশুদ্ধ গতি ভঙ্গিতে। এই জ্ঞানের প্রভাবে সে তখন নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে। তখন সে যা-কিছু

করে. লোকের মঙ্গলের জন্যই করে, যা কিছু বলে, সংসারের ভালর জন্যই বলে। অজ্ঞান, পাপাচারী তার সংস্পর্শে এসে মুক্তির পথ দেখতে পায়। ভাগবদ্‌গীতা বলে, যোগ সাধনাই আত্মাশুদ্ধির প্রশস্ত পথ। এই পথে যে শুদ্ধিলাভ করে, সে তার পারিপার্শ্বিক জগৎকেই সুন্দর ও শৃঙ্খলাময় মনে করে এবং নিজের মধ্যেই সকলের বিকাশ অনুভব করে। এই আত্মচেতনার দ্বারা জগতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য সে যে বিদ্যা দান করে উপনিষদে তাকে বলে পরাবিদ্যা। এতে মানুষের মন এক স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়, পার্থিব সব কিছুর মোহ কাটিয়ে তার মন তখন এগিয়ে চলে মুক্তির পথে। শুধু কতকগুলি ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করলেই বা ধর্মমূলক আলোচনায় সময় কাটালেই এই জ্ঞান লাভ হয় না। এ জ্ঞান পেতে হলে চাই কঠোর আত্মসংযমের মধ্যে উপযুক্ত সৎগুরুর নির্দেশে ভগবানে বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাওয়া।”

অমলের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পাচ্ছেনা লীনা কি চায়, তার উদ্দেশ্য কি। এই সুন্দর পৃথিবীর কিছুই কি তার ভাল লাগে না ? পার্থিব ভোগ বাসনা কোনটাই কি তার কাম্য নয় ? সৎভাবে সংসারধর্ম পালন করেও তো জীবনকে ভোগ করে নেওয়া যায় ! তাতেই বা দোষ কি, অপরাধ কোথায় !

এই সব নানা কথা চিন্তা করে সে আবার প্রশ্ন করল, “তাহলে লীনা, তুমি কি আমাকে সংসারধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বল ?”

‘লীনা হেসে উত্তর দেয়, “নারে, না। সংসার ধর্ম পালন করেও মনের অনাবিল শাশ্বত আনন্দ সঞ্চয়ের জন্য ঘরে বসেও সাধনা করা যায়। মহাঋষি জনকের নাম শুনিস নি ? আধুনিক কালেও অনেক মনিষী গৃহী থেকেও ভগবানের আরাধনা করে গেছেন।”

“কিন্তু আমি তো বুঝতে পাচ্ছিনা, সৎভাবে কাজ কর্ম করে যদি আমি যশোগৌরবের অধিকারী হই, পাঁচজনের উপকারের জন্য স্কুল,

কলেজ, হাঁসপাতাল, মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করে আনন্দ লাভ করতে পারি, তবে আর আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন কি ?" অমল প্রতিবাদ জানায়।

লীনাও যেন তাকে বুঝাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেও তেমনিভাবেই উত্তর দেয়, "সকলের জ্ঞান লাভের স্পৃহাই কি এক প্রকার ? একটি গরীব চাষার ছেলের আকাঙ্ক্ষা কি ? ভাল খেতে-পরতে পেলেই তার আনন্দ। তার উপর যদি সে-বছর চাষের ফসল ভাল হয় তবে তো কথাই নেই, আনন্দে তার মন ভরে উঠে, মনের চরম আকাঙ্ক্ষা মিটাবার পক্ষে তার এই যথেষ্ট। তাকে যদি আধুনিক বিজ্ঞানীর কঠোর পরিশ্রমে প্রাপ্ত মহা জাগতিক জ্ঞানের কথা শুনান যায়, সে কি তা উপলব্ধি করতে পারে, না, ঐ জ্ঞান পাবার জন্য সে লালায়িত হবে ? সে ওদের পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। সেইরূপ, আধ্যাত্মিক বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্পৃহা যাদের মনে দানা বেঁধে ওঠে, জগতের কোন পার্থিব জিনিসের উপরই তাদের কোন মোহ থাকে না, সেই পরম শক্তি সংগ্রহের ইচ্ছাই তাদের মনে অদম্য হয়ে ওঠে। ধনদৌলত, ব্যবহারিক জ্ঞানে মানুষের ইহজন্মে উপকার হয়। উপনিষদে এই জ্ঞানকে বলে অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা এই দু'য়ের পার্থক্য বুঝতে পারলেই তোর মনের গ্লানি কেটে যাবে। এবার যা, চারদিক ফর্সা হতে সুরু হয়েছে।"

লীনা উঠবার চেষ্টা করতেই অমল বলে উঠল, "আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা করব লীনা। তোমার যা বয়েস তাতে তো মনে হয় না এই সব জ্ঞান তোমার এই জন্মেরই সাধনার ফল।"

লীনা পুনরায় বসে পড়ল। সে অমলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলতে লাগল, "সব মানুষের পূর্ণ জ্ঞান এক জন্মেই পরিস্ফুট হয়না, পরবর্তী জন্মেও পূর্বজন্মের জ্ঞানের জের টেনে যায় সে। এ জগতে যিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করুন না কেন, দৃঢ় সঙ্কল্প ও নিষ্ঠা থাকলে একদিন না একদিন তিনি সফলকাম হবেনই।

এ জন্মে যিনি সফল মনোরথ হতে পারলেন না, ইহজীবনের সুকৃতির ফলস্বরূপ জন্মান্তরে তিনি কৃতকার্য হবেনই। শুধু চাই মনের দৃঢ়তা, প্রতিজ্ঞায় অচঞ্চল। তবেই তিনি মহাযোগী—অধিমাত্র অধিকারী —উত্তম সাধক। মোক্ষজ্ঞান লাভের পর আর তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।"

"সকলেই কি এই জন্মান্তর রহস্যের কথা জানতে পারে?"

"সকলেরই পারবার সুযোগ আছে। কিন্তু বিস্মৃতির কঠিন আবরণ ভেদ করে এই তত্ত্বকে উদ্‌ঘাটন করতে হয়। কাজেই সকলের পক্ষে তা' সহজসাধ্য নয়। নানা উপায়ে মানুষ এই তত্ত্ব অবগত হতে পারে। কেউ হয়তো তার পূর্বজন্মের ব্যবহৃত কোন বিশেষ জিনিস বা পরিচিত কোন স্থান দেখে অকস্মাৎ দিব্যজ্ঞান পেয়ে যায়। তখন তার মনে পূর্বজন্মের সব স্মৃতিই জাগরুক হয়ে পড়ে। কারও হয়তো পূর্ব-জন্মের কোন বিশেষ শিক্ষার ফল এ জন্মেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যেমন, কলকাতার মাস্টার শ্যামসুন্দর বারো বছর বয়সে ছত্রিশটি বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী হয়েছিল। অনেকেই তার বাজনা শুনেছে। আমিও শুনেছি। এক জন্মের ফলে সে এই জ্ঞান আহরণ করেনি। আবার কেউ হয়তো জন্মের পর থেকেই তার পূর্বজন্মের ইতিহাস জেনে ফেলে। এদের বলে 'জাতিস্মর'। উত্তরকালে জড়ভরত ও অনেকেই জাতিস্মর ছিলেন। একালেও অনেকে জাতিস্মর হয়েছেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর সাত জন্মের রহস্য জানতেন। পূর্বজন্মের রহস্য জানার কারণ যাই থাকুক, জ্ঞান লাভ হলে তাদেরই বলে জাতিস্মর।"

"তুমি কি পূর্বজন্ম বিশ্বাস কর লীনা?"

"করিনা! আগে অনেকেই, অনেক দেশই করতনা। আমাদের এই ভারতবর্ষই শুধু তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে এই পারলৌকিক জ্ঞানের গূঢ় ইতিহাস মানুষকে শুনিয়েছিল। এখন কিন্তু সকল দেশের এমন কি পাশ্চাত্য জগতের মনিষীরাও এই জ্ঞানে বিশ্বাসী। আমি যাদের সঙ্গে এখানে কথা বলি, ওরাও ওদের পূর্বজন্মে এই সুন্দর

পৃথিবীতেই স্থূল দেহে বাস করত। দেহান্তরের পর ওরা এখন সূক্ষ্ম দেহে এক বিশেষ রাজ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। ওদের দেহ নেই বটে, কিন্তু আত্মা আছে, যা অবিনশ্বর, কখনই নষ্ট হয় না।"

লীনার এই সকল তত্ত্বপূর্ণ কথায় অমলের জ্ঞান-স্পৃহা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনের আবেগ দমন করে মাঝপথে সে তাকে পুনরায় প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, ওরা এই সুক্ষ্ম আত্মা নিয়ে ঘুরেই বা বেড়ায় কেন? পুনরায় তো দেহ ধারণ করতে পারে?"

লীনা স্নিগ্ধ হেসে উত্তর দেয়, "ওদের রাজ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। পূর্বজন্মে ওরা যে যেমন কর্ম করেছে. দেহান্তরের পরও তাদের সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যারা মহাপাপ করে বা অপঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে, যারা আত্মহত্যা করে মহামূল্য জীবন নাশ করেছে মৃত্যুর পর তাদের সহসা গতি হয় না। সংগতিলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় এরা ঘুরে বেড়ায় মন্দিরের পাশে, দেবালয়ে বা যেখানে ভগবানের নাম-গান হয়। সেইজন্যই তো ওরা আমার কাছে আসে। ওরাও সংখ্যায় কম নয়—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। ওদের পাপ স্খালন হলেই ওরা সংগতি প্রাপ্ত হয়। তখন ওরা পুনরায় সহজ পথে জন্মগ্রহণ করবার সুযোগ পায়।"

"সে আবার কি! সহজ পথে মানে? অন্য কোন পথও আবার আছে নাকি?" অমল বিস্ময় প্রকাশ করে।

"আছে বৈকি। সে অনেক কথা। যাক্, এইটুকু জেনে রাখ্ আত্মা অনেক রকম, তার মধ্যে দু'রকম প্রধান। পবিত্র আত্মা আর পাপ আত্মা। যাদের সহসা গতি হয়না, তারাই পাপ আত্মা। এই পাপ আত্মাদের একটা সহজাত স্পৃহাই হল কোন পরিত্যক্ত দেহ পেলেই ওরা তার মধ্যে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করে। সেই জন্যই মানুষ মরে গেলে হিন্দুরা মৃত দেহকে ছুঁয়ে থাকে, যাতে কোন দুষ্ট আত্মা ওই দেহে আশ্রয় নিতে না পারে। কারণ এই সূক্ষ্মাত্মারা মানুষকে বড়ই ভয় করে।"

"ও! এইজন্যই কেউ মারা গেলে, তার মৃতদেহ ছুঁয়ে থাকার রীতি! আচ্ছা, ওই আত্মা মৃত দেহে ঢুকে কি করে?"

"কি আবার করবে, নানা রকম উৎপাতের সৃষ্টি করে এবং তাই দেখে মানুষ ভয়ও পায়, আর, নানারকম ভুল ধারণার বশে অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করে বসে। কোন বিশেষ তিথিতেই এই সকল আত্মারা তৎপর হয়ে ওঠে। যেমন, পুষ্করা তিথিতে। এই তিথিতে দুষ্ট আত্মা একবার মৃতদেহে প্রবেশ করতে পারলে, চিতা সাজিয়ে আগুন দেবার পরও দেখা গেছে মৃতদেহের কোন অংশই এমনকি, একগাছি চুলও আগুনে দগ্ধ হয়না। সময়ে সময়ে শবটি ঠেলে চিতার উপর উঠে বসে। এই দৃশ্য দেখে যারা শব দাহ করতে যায় তারা ভয়ে পালিয়ে আসে। একে বলে 'পুষ্করাপ্রাপ্ত' শব। কিন্তু এই অবস্থায় শব ছেড়ে গেলে বা শব অর্ধদগ্ধ হলে এরা সংশ্লিষ্ট লোকের খুব অমঙ্গল করে। সেইজন্য শব দোষ পেলে তাকে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে আসতে হয় ও পরে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে বিপদ মুক্ত হতে হয়।"

"শব আড়্‌মোড়া ভেঙ্গে চিতার উপর ঠেলে ওঠার তাহলে ঐটাই কারণ?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"অপর কারণও আছে। অনেক সময় চিতার আগুনে দেহের প্রধান শিরার সঙ্কোচনেও শবের এ অবস্থা হয়। উপযুক্ত শবদাহ-কারীরা সেটা বুঝতে পারে।" লীনা উত্তর দেয়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মনুষ্যজন্মই তো শ্রেষ্ঠ জন্ম? মানুষ মরে গেলে পরজন্মে আবার সে মনুষ্য জন্মই তো গ্রহণ করে?"

লীনা উত্তর দিল, "হ্যাঁ। তবে সব ক্ষেত্রেই কি তাই হয়? হিন্দু জন্মান্তরবাদীরা মনে করেন মৃত্যুকালে যে যেমন চিন্তা করে, সেই চিন্তাই হয় তার পুনঃ দেহ ধারণের নিয়ামক। সৎ কর্মের ফলে জীবের যেমন উর্ধযোনী লাভ হয়, অসৎ কর্মের ফলেও তেমনি তার

অধোগতি হয়। চরম সাধনাকালে জড়ভরত মায়াপরবশ হয়ে মৃত্যুকালে এক হরিণ শিশুর চিন্তা করেই পরজন্মে হরিণজন্ম লাভ করেছিলেন। আবার, হরিণজন্ম লাভ করেও তিনি জাতিস্মর হয়েছিলেন এবং পূর্বজন্মের কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সর্বদা ভগবৎ চিন্তায় মনোসংযোগ করায় তাঁর পুনরায় ঊর্ধগতি হয়েছিল।...যাক্, আজ আর নয়, পরে আবার জানবি।"

বলেই লীনা উঠে মন্দিরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অমলের আরো কিছু প্রশ্ন ছিল। কিন্তু সে সে সুযোগ পেলনা। লীনা যে অকস্মাৎ এইভাবে তাকে কিছু না বলেই উঠে যাবে, তা সে ভাবতেই পারেনি। তার সব কিছুই রহস্যাচ্ছন্ন। মায়া, মমতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুর উপরই যেন তার কোন আসক্তি নেই। যতই সে লীনার কথা ভাবে, ততই তার মন উদাস হয়ে পড়ে। কোন-রকমেই কি তাকে এই রহস্যময় পরিবেশের আওতা থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়না!

অমল আবার ভাবে, যে শিক্ষা আজ সে তার কাছ থেকে পেয়েছে, তার মূল্যও কম নয়। যে মন এবং দৃষ্টি নিয়ে সে এতদিন লীনাকে বিচার করেছে, আজকের এই মিলনের পর তার সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। লীনা সাধারণ নারী নয়, লীনা অপূর্ব, লীনা মহীয়সী!

ভাবতে ভাবতে কখন যে সে উঠে গেল তা' সেও জানে না।

চার

"হ্যাঁরে অমু! তোর কি হয়েছে রে? কোথাও বেরোস্‌ও না, কারও সঙ্গে কথাও কোস্‌না; কি হয়েছে তোর?" মালতিদেবী বলতে বলতে অমলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

"কৈ, কিছুতো হয়নি মা!"

"আমায় লুকোবি বাবা! আজ ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি, বসে বসে তুই সর্বক্ষণই যেন কিছু ভাবিস। কি হয়েছে আমায় বলনা বাবা!"

মায়ের কথায় কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে অমল শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মালতিদেবী ধীরে ধীরে অমলের পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনি পুনরায় বললেন, "একটা কথা আজ ক'দিন থেকেই তোকে বলব বলব ভাবছি। তোরও শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছে—"

"কি মা!" অমলের চোখে বিস্ময়।

মালতিদেবী সহজ সুরে বললেন, "ও পাড়ার ধীরেশবাবুদের বাড়ীর সকলেই পুরীতে বেড়াতে যাচ্ছেন। কিছুদিন সেখানে থাকবেনও। পুরীর মন্দির আমারও তো এতদিন দেখা হয়ে ওঠেনি। তাই ভাবছি, ওদের সঙ্গে তোকে নিয়ে আমিও ঘুরে আসি। তোরও শরীরটা ভাল নয়, আর আমারও এই সুযোগে জগন্নাথ দর্শন হয়ে যায়।"

"সেকি মা! এখানে লীনার দেখাশুনা কে করবে? এত বড় বাড়ীতে—"

"কেন বাবা! কর্ত্তাতো থাকছেন। তাছাড়া সুনন্দার মা রয়েছে, ঠাকুর চাকর রয়েছে। বৌমার কোন অসুবিধা হবে না বাবা।"

"সে হয় না মা। তাছাড়া লোকেই বা বলবে কি! একটা কর্তব্যও তো রয়েছে।" অমল মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

মালতিদেবীও কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, "তোকে বলতে বাধা নেই বাবা! মনে ইচ্ছে আছে তোকে নিয়ে জগন্নাথদেবের চরণে গিয়ে মানৎ করব বৌমার মতিগতি ফিরিয়ে ঠাকুর যেন তাকে আবার সংসারে ফিরিয়ে আনেন।"

"কিন্তু, কেন মা! লীনাতো বেশ আছে। ওতে তো ওর কোন কষ্ট নেই! আমিও খাপ খাইয়ে নেব মা। শুধু শুধু আর কেন এসব করতে চাইছ মা?"

"শুধু শুধু! তুই কি শুধু তোর মনটাকেই চিনতে শিখেছিস? আর আমার মনটা কিছুই নয়?" বলেই মালতিদেবী বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছলেন। নিজেকে কিছুটা সংযত করে জলভরা চোখে তিনি বলতে লাগলেন, "মনে কত সাধ ছিল আমাদের, পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে আনন্দ আহ্লাদে ঘর সংসার করব! কিন্তু—" তিনি আর বলতে পারলেন না। মনের আবেগে তাঁর দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়তে লাগল।

অমল বিষম বিপাকে পড়ল। মায়ের চোখে জল! যে মাকে সে জন্মাবধি দেবীর মত ভক্তি করে এসেছে, সেই মায়ের চোখে জল!

মনে হল ঠাকুর জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে লীনার মতি পরিবর্তনের আবেদন ও মায়ের চোখের জল, মালতিদেবীর এই দ্বিমুখী অস্ত্র প্রয়োগে অমলের মন কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। কারণ, অমল মাকে প্রবোধ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, তুমি কি মনে কর, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেই তিনি লীনার মতি ফিরিয়ে দেবেন?"

"কেন বাবা! বিশ্বাস রেখে ভগবানকে ডাকতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বেহুলা ভগবানে বিশ্বাস রেখে তার মরা স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিল যমের কাছ থেকে। এতো পুরাণের কথা বাবা!" মালতিদেবী পুনরায় বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অমল উত্তর দিল, "আচ্ছামা, আমি তোমার কাছে দু'দিন সময় চাইছি, আমার মন স্থির করতে দাও।"

"বেশ বাবা, তাই হবে। আমিই বা আর ক'দিন বাঁচবো। তাই ভাবছি, এক সঙ্গে দু'কাজই হবে। আমার ঐ সঙ্গে তীর্থস্থান দেখবার সুযোগ হবে। তুই আর অমত করিসনে বাবা।—নে স্নানটান্ করেনে—বেলাও তো বেড়েই চললো। নে, উঠে পড়—"

মালতীদেবী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বস্তুত, যাবার আগে তিনি যে মোক্ষম চাল চেলে গেলেন, মাতৃভক্ত পুত্রের বিরুদ্ধ মনোদ্বন্দ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করতে এই অস্ত্র যথেষ্ট কাজ করবে।

অমলের মনে এক বিষম সমস্যা দেখা দিল। লীনাকে ছেড়ে এতদূরে গিয়ে সে কি থাকতে পারবে? তার অবর্তমানে পরোক্ষভাবে তার মতন করে কে লীনার তদ্বির করবে! নিজের দ্বারা যে কাজ হয়, ঠাকুর চাকরের কাছ থেকে কি সেই কাজ আশা করা যায়! নানা চিন্তায় তার মন আলোড়িত হয়ে উঠল। উপর থেকে যেমন অনুমান করা যায়না বটগাছের শিকড় মাটির তলা দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক সুদীর্ঘ স্থান জুড়ে প্রসারিত হয়েছে, তেমনি অমলের বহিঃপ্রকাশ দেখে কেউ বুঝতে পারেনা কি নিবিড় অনুরাগ, কি বিরাট আকর্ষণ এতদিন নিভৃতে উভয়ের মনে দানা বেঁধে উঠেছে। অমলও আজ এই প্রথম বুঝতে পারল লীনার স্বার্থে তার মন কতটা আগ্রহান্বিত।

কিছুক্ষণ চিন্তাচ্ছন্নভাবে বসে থেকে এক সময় সে মুখ তুলে তাকাতেই দেওয়ালে সংরক্ষিত লীনার ফটোর দিকে তার নজর পড়ল। মনে হল যেন ছবিটি জীবন্ত—যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে! কি সরল কি মোহময় সে দৃষ্টি! এ দৃষ্টির সঙ্গে মন্দিরাশ্রিতা লীনার চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন কত পার্থক্য! এ দৃষ্টিতে কত মাধুর্য, কত প্রেম, কত কমনীয়তা—আর সে দৃষ্টি কত জ্যোতির্ময়, কত সচেতন, কত আদেশ ব্যঞ্জক! কিন্তু তা' কেমন করে সম্ভব হ'ল! একই

দেহেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তি! লীনা সুন্দরী। এ সৌন্দর্য মনে দোলা দেয়, কিন্তু ও সৌন্দর্য মনকে কেন্দ্রীভূত করে। তবুও উভয়েই এক—একই দেহের বিভিন্নরূপ।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল তা' সে নিজেই বুঝতে পারেনি। হঠাৎ দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে বেলা বারোটা বাজতেই অমলের সম্বিত ফিরে এল। সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে পড়ল।

এদিকে অমলের কাছথেকে ফিরে এসে মালতিদেবী তাঁর শয়নঘরে প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন ধীরেশবাবুর স্ত্রী হৈমবতীদেবী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

মালতিদেবীকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"কতক্ষণ এসেছ ভাই?" মালতিদেবী প্রশ্ন করেন।

"না না। এই তো এলুম···তারপর খবর কি? সব ঠিক?"

"আরে বোস না ভাই, বলছি।" বলে মালতিদেবী হৈমবতী-দেবীকে বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসে পড়লেন। তিনি বললেন, "কথা তো পাড়লুম খোকাকে। সহজে কি রাজী হতে চায়? নানা রকম করে বোঝাতে শেষ পর্যন্ত তিন দিনের সময় নিয়েছে। যাই কেন বলিস না ভাই, বৌমার আকর্ষণী শক্তি আছে। কোন সম্পর্কই তো রাখেনি। কিন্তু পারলুম খোকার মন ঘোরাতে! চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি আমি। আমি মা। ছেলে-বৌয়ের এই রকম অদ্ভুত ছাড়াছাড়ি দেখে কি আমরা ঠিক থাকতে পারি? আমাদের তো উদ্দেশ্য খারাপ নয়। বৌমার তো সংসারের প্রতি কোন মোহই নেই। কিন্তু ছেলের তো আমার কাঁচা বয়েস! কাজেই পাঁচটা ভেবেচিন্তে এই পথেই পা বাড়িয়েছি। এখন ঠাকুর ভরসা।" মালতিদেবী হু'হাত জড়ো করে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে হাত তুললেন।

"প্রতিমা যে সঙ্গে যাচ্ছে' সে কথা ছেলে শুনেছে?" হৈমবতী প্রশ্ন করলেন।

"তোমাদের বাড়ীর সকলেই যাচ্ছে এই কথাই বলেছি। আমাদের মনের কথা ও কিছুই বুঝতে পারেনি।"

"কিন্তু পরে যখন দেখবে?"

"তাতে কি হয়েছে, সে কিছু ভাববে না। তারপর প্রতিদিনকার দেখা সাক্ষাতে ও স্বাধীন মেলামেশার সুযোগে উভয়ের মধ্যে নতুন অনুরাগ জেগে ওঠাও কিছু আশ্চর্য নয়। ছোট বেলায় তো বেশ ভাব ছিল। আর মেয়েও তো তোমার দেখতে শুনতে ভাল। কাজেই মনের মিল হতে বেশী সময় নেবে না। তুমি দেখে নিও, এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি।" বলে মালতিদেবী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

"ঠাকুর যেন তাই করেন ভাই! শেষকালে ভয় হয়, তোমার বৌমার কোন অভিশাপ যেন না লাগে।" হৈমবতীর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাষ।

তাঁকে আশ্বাস দেবার জন্য মালতিদেবী দৃঢ়স্বরে বলেন, "না না, তুমি তা' ভেবনা। সাংসারিক দাম্পত্য জীবনের প্রতি কোন আসক্তিই তার নেই। সে আর-এক জগতের মানুষ।"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ নানা কথা আলোচনার পর হৈমবতী নিজ-গৃহে ফিরে গেলেন।

সেইরাতে অমল লীনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য রাত দু'টোর পর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাগানে মন্দিরের পাশে এসে দাঁড়াল। লীনার সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে। সে মাকে কথা দিয়েছে তিন দিনের ভেতর সে তার মতামত তাঁকে জানাবে। কিন্তু তার আগেই লীনার সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। তার মতামতও তাকে জানতে হবে। আর কেউ না জানুক, সে তো বুঝতে পেরেছে লীনা সাধারণ নারী নয়! সুতরাং তার মতামত গ্রহণ করাও তার যথেষ্ট সমীচীন বলে মনে হয়েছে।

অধীরাগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও লীনার সঙ্গে তার দেখা

হলনা। সে কম্পিতপদে মন্দিরের বারান্দায় উঠে দরজার নিকট গিয়ে দাঁড়াল। পরক্ষণে সে দরজার কপাটে কান পেতে কিছু শুনবার আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দই সে শুনতে পেলনা। অবশেষে সে ধীরে ধীরে কপাটের উপর টোকা দিতে লাগল। কিন্তু তথাপি সে কোন প্রত্যুত্তর পেলনা।

এদিকে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। অবশেষে বিফল মনোরথে সে নিজের ঘরে ফিরে এল।

বিছানায় শয়ন করে অমল আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। এইভাবে একসময় সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

হঠাৎ অমল দেখতে পেল কক্ষের দরজা ঈষৎ ফাঁক করে কে যেন উঁকি মারছে। পরক্ষণেই নিঃশব্দে দরজা ঠেলে লীনা কক্ষে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে অমলের শয্যার নিকট উপস্থিত হল। তাকে দেখে অমল উঠে বসতেই লীনা কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কাছে গিয়েছিলি ?"

অমল মোহাচ্ছন্নের মত উত্তর দিল, হ্যাঁ। কিন্তু তুমিতো কই আমার সঙ্গে দেখা করলে না ?"

"তাই বুঝি তুই রাগ করে ফিরে এলি ? সেই জন্যই তো আমি ছুটে এলুম। কিন্তু কেন গিয়েছিলি তাতো কই বললিনি ?" লীনা স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

অমলের নিকট সব শুনে লীনা তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তার সে হাসিতে যাদুকরীর আবেশ, নয়নে কুহকিনীর উন্মাদনা! মনে হল অমলের অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত সে যেন দেখতে পাচ্ছে। মোহময়ভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, "মা যখন যেতে বলেছেন তুই যাবিনি ?"

"তুমি কি আমায় যেতে বলছ ?"

"দোষ কি ?"

কড়া নাড়ার শব্দে অমল দরজার দিকে ফিরে তাকাল। সে জিজ্ঞাসা করল, "কে ডাকছে অমন করে?"

"দেখে আসছি।" বলে লীনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পুনরায় কড়া নাড়ার শব্দে অমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়-মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসল।

আবার সেই শব্দ।

এবার অমল তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দরজার নিকট গিয়ে অর্গল খুলে দিতেই মালতিদেবী কক্ষে প্রবেশ করেই বলে উঠলেন, "কিরে! আজ তোর হল কি? এতবেলা অবধি ঘুমোচ্ছিস্? শরীর খারাপ হয়নি তো?"

"না মা।"

হঠাৎ স্বপ্নের সব ঘটনা অমলের মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল লীনা তাকে মায়ের সঙ্গে পুরী যাবার অনুমতি দিয়েছে। তাই সে হঠাৎ মাকে বলে ফেলল, "মা, তুমি পুরী যাবার বন্দোবস্ত কর, আমার কোন আপত্তি নেই!"

"বেশ তো বাবা; আমি আমার সইকে খবর পাঠাচ্ছি। নে, হাত মুখ ধুয়ে ফেল্, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে মালতিদেবী হৃষ্টমনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ

রেলগাড়ী ছুটেছে ধূম উদ্‌গীরণ করে।

তার সঙ্গেপাল্লা দিয়ে চলেছে মন—একবার ক'লকাতা, পরক্ষণেই সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনের কাছাকাছি চলন্ত রেল কামরায় উপবিষ্ট অমলের বুকের মাঝখানে। কিছুতেই স্থির হতে পাচ্ছে না অমল। কেবলই লীনার জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। মনে হচ্ছে যেন সে মুখ কত করুণ, কত অসহায়। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে—'ওরে ফিরে আয়, আমায় ছেড়ে যাস্‌নে।'

অমলের মন উদাস হয়ে পড়ে। কিছুই যেন তার ভাল লাগছে না। মনে মনে ভাবছে, না এলেই যেন ভাল হতো। আবার ভাবছে, দু'দিন পরেই তো সে ফিরে যাবে। নূতন দেশ দেখারও তো একটা আনন্দ বা আকর্ষণ আছে! তা ছাড়া জগন্নাথদেবের চরণ দর্শন করেও মনের গ্লানি অনেকটা সে লাঘব করতে পারবে। এইরূপ নানা প্রলোভনে সে তার অশান্ত মনকে বশে আনবার চেষ্টা করতে লাগল।

হু হু করে ট্রেন চলেছে খোলা মাঠের হাওয়া কাটিয়ে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে হাজার হাজার নারকোল গাছ মহাবেগে ছুটে চলেছে ছাড়িয়ে আসা অতীতের উদ্দেশ্যে। এত নারকোল গাছ যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, অমল তা পূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি।

ধীরে ধীরে গাড়ী এসে থামল সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনে। ছোট্ট ষ্টেশন। এর পরের ষ্টেশনই হল পুরী।

অমল তখনও তন্ময়ভাবে ষ্টেশনের বিপরীত দিকে অবস্থিত তিনতলা উঁচু জলের ট্যাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে আছে। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে গিয়ে বহু পুরাণো ইটের দেওয়াল গড়িয়ে জল উপচে পড়ছে সর্বক্ষণ। হঠাৎ কারও ডাকে অমলের সম্বিৎ ফিরে এল। সে মাথা তুলে পাশে তাকাতেই প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "ডাব খাবেন অমলদা?"

"এ্যাঁ! ও, বেশতো তোমরা খাওনা।"

"হ্যাঁ, আমরাও খাব, আপনিও খাবেন। এই নিন।" প্রতিমা একটি মুখ ছাড়ান ডাব অমলের হাতে তুলে দিল।

অমল জল খেয়ে ডাবটি জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দিল। মালতিদেবী প্রতিমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, তোর অমলদা'কে জিজ্ঞাসা কর্ চা খাবে কিনা।"

"না মা, এরপর আর চা খাব না। তোমরা কিছু খাবে তো খেয়ে নাও।"

"নানা, এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। একেবারে ঠাকুর দর্শন করে প্রসাদ নেওয়া যাবে। আরতো এসেই পড়লুম।" মালতিদেবী বললেন।

আবার গাড়ী ছুটতে আরম্ভ করল শেষ থামবার জন্য।

অধীরাগ্রহে এবার সকলেই জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইল নারকোল গাছভরা ছুটন্ত মাঠের দিকে। সকলেই ভাবছে এইবার পুরীর মন্দির নজরে পড়বে। যেন মন্দিরটি রেল লাইনের ধারে-কাছেই কোথাও হবে। পুরী রেলষ্টেশন থেকে মন্দিরটি অন্ততঃ দু'মাইল দূরে পুরী সহরের মাঝখানে অবস্থিত। এ হদিস অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু পুরীর সমুদ্রই বা কোথায়? কিছুইতো নজরে পড়ছেনা। সে এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত!

হঠাৎ অমল চেঁচিয়ে উঠল "মা, দেখ দেখ ওই একটা মন্দির!"

সকলেই তার জানালার কাছে হুমড়ী খেয়ে পড়ল। সত্যিই তো, ঐ দূরে একটা মন্দির দেখা যাচ্ছে। প্রতিমাও দেখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মন্দির দেখার চেয়ে অমলের বুকের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবার জন্যই তার প্রয়াস বেশী। কেউ হয়তো আবার কিছু ভেবে বসবে! যেন তাদের দিকেই সকলের দৃষ্টি। কথায় বলে, কার মন কার দিকে। তা' বলুক; বুদ্ধিমানেরা সময়ের সম্ভাবনাময় মুহূর্তের সদ্ব্যবহারের সুযোগও হাতছাড়া করেনা। হয়তো প্রতিমা বা

অমল কেউই ঐ পর্য্যায়ে পড়ে না। যাক্, যতদূর মনে হয় প্রতিমা মন্দিরটিকে দেখেছে।

হৈমবতীদেবী এর পূর্বেও একবার পুরী এসেছিলেন। তিনি দেখেই বলে উঠলেন, "ওই তো জগন্নাথদেবের মন্দির গাছগুলির উপর দিয়ে উঁকি মেরে ঘুরে যাচ্ছে ট্রেনের বাঁক ঘোরার সঙ্গে।"

ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরটি কোথায় হারিয়ে গেল।

গাড়ী তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। আর যেন বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। নামবার জন্য তখনই সকলে দরজার কাছে এসে জড়ো হল। কিন্তু গাড়ী যেন থামতেই চায়না, তাদেরও আর সবুর সইছেনা।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি সাইকেল রিক্সায় চেপে মালতি ও হৈমবতীদেবী এসে উপস্থিত হল মার্কণ্ড সাগরের একটি দ্বিতল বাড়ীতে। আগে থেকেই এই বাড়ী বন্দোবস্ত করা ছিল। তাদের দেখতে পেয়ে হোটেলের ম্যানেজার মহান্তিবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "চলুন উপরে আপনাদের ঘর দেখিয়ে দি। আপনাদের চিঠি আগেই পেয়েছি। পুরীতে এই প্রথম এলেন বুঝি?"

"না, আগেও এসেছি। দেখুন, এক্ষুনি আর একটি রিক্সায় করে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আসছে। তারা এলেই আমাদের ঘরে পৌঁছে দেবেন।" মালতিদেবী নির্দেশ দিলেন।

"নিশ্চয়ই; আমি আপনাদের পৌঁছে দিয়েই নীচে নেমে আসছি।"

মহান্তিবাবু তাদের নির্দিষ্ট কামেরায় পৌঁছে দিয়েই নীচে নেমে গেলেন।

হৈমবতীদেবী মালতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, "ওরা দুটিতে চিনে আসতে পারবে তো?"

মালতিদেবী উত্তর দেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকানা জানেতো। কেমন চালাকি করে তাড়াতাড়ি একটা রিক্সায় চেপেই আমরা পালিয়ে

এলুম, ওদের বোঝবার সুযোগই দিলুম না। আমরা যে সলা করে ওদের মেলামেশার সুযোগ করে দিচ্ছি, মেয়ে তোমার জানে ?"

হৈমবতীদেবী বলেন, "কিছু কি না বোঝে! বয়েস হয়েছে তো।"

উদ্দেশ্যে জগন্নাথদেবকে হাতজোড় করে প্রণাম করে মালতি-দেবী বলেন, "ঠাকুর, মুখ রেখো!"

হৈমবতীদেবী এখনকার মেয়েদের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাই তিনি প্রশ্ন করেন, "কিন্তু ছেলে তোমার যে রকম দেখছি, প্রতিমা কি শেষ রক্ষা করতে পারবে ?"

মালতিদেবী কটাক্ষ করে উত্তর দেন, "না, মেয়ে তোমার বুদ্ধিমতী। বালেশ্বর ষ্টেশনে কি করে ওকে চা-জলখাবার খেতে বাধ্য করল দেখলে তো? বিকেলেই ওদের দু'টিকে পাঠাব একসঙ্গে সমুদ্র তীরে বেড়াতে। যে করেই হোক্, ওদের এক গাট-ছড়ায় বাঁধতেই হবে। আরে দেখোনা কি হয়—" বলেই মালতিদেবী সইয়ের গায় একটা রসের টিপ্পনী দেয়।

তাদের কথা শেষ হতে না হতেই প্রতিমা অমলকে নিয়ে ঘরে ঢুকে ঈষৎ ক্রোধে বলে উঠে, "তোমরা বেশ যা' হক! আমাদের ফেলে তো পালিয়ে এলে! কি বিপদেই না পড়েছিলুম!"

কিছু একটা আন্দাজ করে মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, কি আবার হলো?"

প্রতিমা ব্যাখ্যা করে হাত নেড়ে বলে, "তোমরা তো চলে এলে। কি করি! একটা সাইকেল রিক্সা ডেকেতো চেপে বসলুম। ওমা! তোমার ছেলেতো কিছুতেই পাশে উঠে বসবে না! সে কি লজ্জা তার! যখন হাত ধরে টেনে তুললুম—"

অমল তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলে, "ওরা কিন্তু সব বিশ্বাস করে ফেলবেন।"

"কি? আমি তাহলে এতক্ষণ সব বানিয়ে বললুম? আরো তো সব এখনো বলিনি।"

"ওমা! আরো আছে নাকি! থাক্, এখন আর তোদের ঝগড়া করতে হবে না।" মুচ্‌কি হেসে মালতিদেবী সইয়ের দিকে কটাক্ষ করেন।

সহানুভূতি পেয়ে অমল বলে, "দেখুন না!"

প্রতিমাও কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, "ওঃ! মরে যাই আরকি! কী বীর পুরুষ! রিক্সায় তোলবার জন্য হাত ধরে টানতেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমার বুকের উপর। ব্যালান্সও রাখতে জানে না।"

"আর কিছু বলবে না?" অমলের কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাসের ছাপ। মালতিদেবী আশ্বাস দেন, "সে পরে বলবে'খন, এখন বস্।"

সামান্য গোছগাছ ও স্নান সেরে হৈমবতীদেবী সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জগন্নাথদেবের মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে মন্দির বেশী দূরে নয়।

এই সেই জগন্নাথদেবের মন্দির। মন্দিরটি দু'ভাগে বিভক্ত। মূল মন্দিরের সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত নীচু দ্বিতীয় মন্দিরটি অবস্থিত।

জগন্নাথদেবের আবির্ভাব ও কে এবং কবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। অতি পুরাকাল থেকে এক শ্রেণীর চারণরা জগন্নাথদেব বা মন্দির প্রতিষ্ঠার "দেউল তোলা" ইতিহাস ওড়িয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে লোককে গেয়ে শোনাত। তাদের সঙ্গীত থেকে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে জানা যায়, ভারতবর্ষের কোন এক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কোন এক দেবতার সন্ধানে পাঠালেন, যিনি পৃথিবীর জনগণের পাপ মোচন করতে পারেন। এই পুরোহিতের নাম ছিল বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি নানা দেশ ঘুরে অবশেষে পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। পুরী তখন ছিল একটি জঙ্গল পরিবেষ্টিত অনার্য দেশ। সারাদিন ঘুরে অবসন্ন হয়ে তিনি বিশ্ববসু নামে এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ

করলেন। বিশ্ববসুও সন্তুষ্টচিত্তে তার মেয়ের উপর তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার ছেড়ে দিল।

কয়েকদিন অবস্থানের পর বিশ্ববসুকে প্রায়ই গৃহে অনুপস্থিত থাকতে দেখে একদিন বিদ্যাপতি শবর কন্যাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। কিন্তু তাঁর নাভিমণ্ডল ভস্মীভূত না হওয়ায় দ্বারকার অদূরে সমুদ্রগর্ভে ওকে নিক্ষেপ করা হয়। বিশ্ববসুর পূর্বপুরুষ ঐ নাভিমণ্ডলকে জ্যোতির্ময় অবস্থায় সমুদ্রে ভাসতে দেখে তাকে তুলে পুরীতে নিয়ে এসে নীলগিরি পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠা করে এবং নীলমাধব নামে তাঁকে পূজা করতে থাকে। বংশপরম্পরায় অদ্যাবধি বিশ্ববসুও তাঁর পূজা করে আসছে।

এই কথা শুনে একদিন বিদ্যাপতি বিশ্ববসুকে তাঁর ভগবান নীলমাধবকে দর্শনের গভীর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিশ্ববসুও সুযোগ বুঝে, যদি তার মেয়েকে বিদ্যাপতি বিবাহ করতে রাজি হন তবেই সে তাঁকে নীলমাধবের মন্দিরে নিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দেয়। বিদ্যাপতি রাজি হলেন। তারপরই বিশ্ববসু যাতে তিনি মন্দিরে যাবার পথ জানতে না পারেন, তাই তার দু'চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে চলল নীলগিরি পর্বতের দিকে। কিন্তু বিদ্যাপতি যাবার পূর্বে গোপনে কিছু সর্ষে সঙ্গে রাখলেন ও যাবার সময় রাস্তায় তিনি ঐ সর্ষে ছড়াতে ছড়াতে গেলেন। বিশ্ববসু এর কিছুই জানতে পারল না।

নীলগিরিতে উপস্থিত হয়ে বিদ্যাপতির চোখের বাঁধন খুলে দিতেই তিনি নীলমাধবের মহা জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। পরে প্রতিশ্রুতি মত বিদ্যাপতি শবর কন্যাকে বিয়ে করে ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

সব কথা শুনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবকে দেখবার অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে বিদ্যাপতিকে সঙ্গে করে পুরীতে এসে উপস্থিত হলেন। বিশ্ববসু

পূর্বাহ্নেই খবর পেয়ে মন্দির থেকে নীলমাধবের মূর্তি সরিয়ে ফেলল।

সর্ষে গাছের অনুসরণ করে রাজা মন্দিরে এসে দেখলেন সেখানে দেবতা নেই। তখন রাজা বিশ্ববসুর কাছে ফিরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল ভগবান নীলমাধব পাপীকে দর্শন দেন না।

এই কথা শুনে ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজের পাপস্খালনের জন্য কঠিন তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে বর দিয়ে বললেন "রাজা, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি সমুদ্রে ভাসমান নিমগাছের কাঠে আমার মূর্তি গড়িয়ে পূজা কর।"

বর পেয়ে রাজা চারদিকে তাকাতেই সমুদ্রে একখণ্ড নিমকাঠ ভেসে যেতে দেখে তাকে জল থেকে তুলে এনে বিশ্বকর্মার স্তব করে তাঁর উপর মূর্তি তৈরীর ভার দিলেন। বিশ্বকর্মাও এই প্রতিশ্রুতিতে কাজ আরম্ভ করলেন যে, তাঁর কাজের জন্য তিনি একটি আলাদা ঘর পাবেন ও কাজ আরম্ভের দিন থেকে একুশ দিন পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে।

কাজ আরম্ভ হল। কিন্তু অধৈর্য হয়ে রাজা পনের দিন পরেই ঘরের দরজা খুলে ফেললেন। তিনি সাশ্চর্যে চারটি অর্ধসম্পন্ন মূর্তি দেখতে পেলেন ; কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় বিশ্বকর্মা তখনই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই পাপকর্মের জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হতেই অন্তরীক্ষ থেকে তিনি এক দৈববাণী শুনতে পেলেন, 'রাজা, একটি মন্দির তৈরী করে তুমি মূর্তিগুলি তাতে প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত আমার পূজা কর।'

দৈবাদেশ পেয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলগিরি পর্বতের উপর এক প্রকাণ্ড মন্দির তৈরী করে মূর্তি চারটি ওতে স্থাপন করে স্বর্গে চলে গেলেন ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি এসে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন।

একশত বছর পর ফিরে এসে তিনি দেখলেন গাল মাধব নামে এক রাজা মন্দিরটি দখল করে বসে আছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর দাবী জানাতে গাল মাধব তাঁকে উপযুক্ত প্রমাণাদি দেখাতে বললেন। তখন ভূষণ্ডি নামে এক ত্রিকালজ্ঞ কাক ইন্দ্রদ্যুম্নের দাবী সমর্থন করায় গাল মাধব তাঁর নিজের দাবী ত্যাগ করে চলে গেলেন।

পুরীর মন্দির যথার্থই কে তৈরী করেছিলেন বা কবে তৈরী হয়েছিল তা নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। কেউ বলেন গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার গঙ্গরাজাদের তাম্রলিপিতে পাওয়া যায় গঙ্গেশ্বর দেবই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

পুরীর পৌরাণিক নাম হল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। কূর্মপুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্মস্থান বলে বর্ণিত আছে। নারদ পুরাণে আছে ভগবান বিষ্ণু নীলকান্ত মণিখণ্ডে নির্মিত হয়ে পুরীর সমুদ্র তীরের বালুবেলার নীচে লুক্কায়িত আছেন। পদ্মপুরাণ থেকে আমরা জানতে পারি, কাঞ্চির রাজা রত্নগ্রিব কোন ব্রাহ্মণের কাছে পুরুষোত্তমের খ্যাতির কথা জানতে পেরে পুরীতে এসে ভগবানের দেখা পান। তখন ভীল জাতীয় লোকেরাই তাঁর পূজা করত। এই ভীলদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন পৃথু নামে একটি কিরাত বালক জম্বুফল আহরণের জন্য বনে গিয়ে নীলগিরি পর্বতের উপর লতাগুল্মে ঢাকা একটি মন্দির দেখতে পায়। ঐ কিরাত বালকটি এই খবর ভীলদের এসে জানাতে তারা সেখানে গিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরটিকে উদ্ধার করে।

আবার, ব্রহ্মপুরাণে বলে অবন্তির রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই পুরাণে মন্দির তৈরীর বা বিদ্যাপতির কোন উল্লেখই নেই।

স্কন্ধ পুরাণে বিদ্যাপতির উল্লেখ থাকলেও সর্ষে বীজের সমর্থন পাওয়া যায় না। এই পুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নকে উজ্জয়িনীর রাজা বলে

উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আছে, তিনি মন্দিরটি তৈরী করে ব্রহ্মার কাছে গেলে গাল নামক কোন এক রাজা ঐ মন্দিরে ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির তৈরী করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাতে নীলমাধবের মূর্তি স্থাপন করেন।

ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাসের 'দারুব্রহ্মগীতা' নামক ওড়িয়া গাঁথার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ তাঁর মৃতদেহ সংকারের জন্য পুরীতে নিয়ে আসেন। যেস্থানে সংকার করা হয় সেই স্থানের নাম যমণিক। শবটি দাহ করার পর পাণ্ডবগণ চলে যান। পরে দেখা গেল নাভি-মণ্ডলটি ভস্মীভূত হয়নি এবং তা থেকে শত সূর্যের রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। বসু নামে কোন ব্যাধ ঐ জ্যোতির্ময় নাভিমণ্ডলটি দেখতে পেয়ে ওকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহাবশেষ বলে বুঝতে পেরে লুকিয়ে কুড়িয়ে এনে এক বটগাছের মধ্যে রেখে দেয় এবং প্রতিদিন তার পূজা দিতে থাকে। কিছুদিন পর বসু সাশ্চর্যে দেখতে পেল নাভিমণ্ডলটি আপনাহতেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পরে বসু স্বপ্নে জানতে পারল দেবতা রাজার পূজা চান। সেই মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এসে নাভিমণ্ডলটি নিয়ে গিয়ে মন্দির নির্মাণ করে তাতে ৮১ অঙ্গুলী দীর্ঘ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাই যে পুরীতে এই মন্দির তৈরি করে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে এমনও হতে পারে পুরীর বর্তমান মন্দির তৈরীর বহু পূর্ব থেকেই কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের অস্তিত্ব সেখানে ছিল।

* * * *

পূজা দিয়ে এবং ঠাকুর দর্শন করে অমল যখন সকলকে নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। বাসায় ফিরে আহারাদি করে যখন সকলে বিশ্রাম নিল, তখন চারটে।

সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই মালতিদেবী অমলকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "কিরে, এখনও ঘুমোচ্ছিস? ওঠ্। প্রতিমা বলছে সমুদ্র দেখতে যাবে। ওকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয় না।"

"তোমরা যাবে না?" ঘুমজড়িত কণ্ঠে অমল জিজ্ঞাসা করল।

"না, আজ আর কোথাও না, সব গোছগাছ করে নিই। থাকতে হবেতো কিছুদিন!" মালতিদেবী বললেন।

"তবে আমিও আজ আর বেরোবো না। এ বেলাটা একটু জিরিয়েনি।"

"বারে! ঘরে বসে থাকবো বুঝি? সে হবে না মাসিমা!" প্রতিমা তার মৃদু প্রতিবাদ জানাল।

অমল অপ্রতিভ ভাবে তার দিকে তাকাতেই সে পুনরায় বলল, "চলুন না অমলদা'! আহা, বেটাছেলে অমন নরম কেন?···বলুননা মাসিমা অমলদা'কে?"

"তুই তো বললি।" বলে মালতিদেবী মুখ ফিরিয়ে অমলকে বললেন, "নে না বাবা, বলছে, আর, শুয়েই বা থাকবি কেন? সত্যিই তো!"

"তোমরাও চলনা—"

হেসে মালতিদেবী উত্তর দিলেন, "বেশ, তাই চ।"

এই মীমাংসায় প্রতিমা সন্তুষ্ট হল কিনা বুঝা গেল না। সমুদ্র-তীরে বেড়াতে যাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে মীমাংসা তো হয়েই গেল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকরা যদি অপর কিছু মনে করেন, তাহলে কিছু বলবার নেই। পুরী হেন জায়গা, তায় সমুদ্রতীর। শুনতেও গায়ে কিসের যেন শিহরণ জেগে ওঠে। তার উপর যদি সহগামী মনানুকূল হয়, তবেতো—বাকীটা দার্শনিকরা বলতে পারেন। আর, এক্ষেত্রে বলতে পারে প্রতিমা নিজেই।

অমল যখন প্রতিমা ও মালতিদেবীকে নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে

পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। হৈমবতীদেবী বাসাতেই রয়ে গেছেন।

পুরীর সমুদ্রতীর।

কী নয়নাভিরাম দৃশ্য! দূরে বহুদূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু নীল জল আর নীল জল। কি এক বিস্তৃত গুরুগম্ভীর গর্জনে সাদা ফেনা তুলে বেগে ধেয়ে আসছে জলের বড়বড় ঢেউগুলি শত শত সাপের ফনার মত পরপারের সীমা থেকে। আকাশ আর জল—কোথায় গিয়ে মিশেছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সব একাকার। নীলাম্বুরাশি সহস্র হস্ত বিস্তার করে শূন্য নীলাকাশকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে চপোল শিশুর দুষ্টুমিভরা স্নিগ্ধ উন্মাদনায়। আবার পরক্ষণেই কাউকে দেখে সন্ত্রস্তভাবে ছুটে পালিয়ে এসে আছড়ে পড়ছে ধরিত্রী-মায়ের বুকে বালুবেলার উপর দিয়ে একেবারে পাড়ের গাঁয়ে। এ দুরন্তপনার যেন শেষ নেই—বিরামবিহীনভাবে অষ্টপ্রহর চলেছে প্রকৃতির এই মধুর খেলা! কী সুন্দর! কী মনোহর!

অমল ভাবে বিভোর, নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যেন তার কোন হুঁস নেই। পলকহীন দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। বিরাটের মধ্যে এত মাদকতা! এত ভাব-গাম্ভীর্য!

"চলুন না অমলদা' ঐ জলের ধারে, ভেজা বালুচরের ওপর।"

প্রতিমার আহ্বানে নিমেষে অমলের চমক ভেঙ্গে গেল। সে ধীরে ধীরে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন প্রতিমা? এইতো বেশ আছি। অত ধারে যাওয়া কি ভাল?"

"কেন? ওইতো অত লোক গিয়েছে। আহা, চলুন না?" বলে প্রতিমা তার সম্মতিসূচক উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। না গেলে প্রতিমা হয়তো তার মনোবলের উপর কটাক্ষ করতে পারে ভেবেই হ'ক বা তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পারার জন্যই হ'ক অমল বলল, "চল।"

আনন্দে প্রতিমা ঘুরে মালতিদেবীকে বলল, "মাসিমা, তুমি

এইখেনে অপেক্ষা কর, আমরা এখুনি ঘুরে আসছি।" বলেই সে ছুটে নেমে গেল ভেজা বালুচরের ওপর দিয়ে একেবারে সেখানে, যেখানে আরো অনেকে গিয়ে জড়ো হয়েছে সমুদ্রের জল ছোঁবে বলে।

জলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল অমল তখনো অনেকটা পেছনে পড়ে আছে। সে হেসে যেন তাকে বোঝাতে চাইল যে তার কত সাহস।

তার এই চপলতা দেখে একটি প্রকাণ্ড ঢেউ দূর থেকে তার দিকে তেড়ে এল তাকে ভয় দেখাবার জন্য। যাত্রীদের হৈ চৈ শুনে প্রতিমা ঘুরে সমুদ্রের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল সকলেই পাড়ের দিকে ছুটে আসছে। সেও আর কালবিলম্ব না করে তাদের অনুগামী হল। কিন্তু কত আর ছুটবে; পেছন থেকে সেই বড় ঢেউটি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেই সে অমলের বুকে আছড়ে পড়ল। এ যেন প্রকৃতির লুকোচুরি খেলা। সকলকে ছোঁয়া দিয়েই নিমেষে ঢেউটি কোথায় পালিয়ে গেল।

সিক্ত অবস্থায় তখনো প্রতিমা ভয়ে অমলের বুকে মাথা গুঁজে রয়েছে।

স্নিগ্ধ হেসে অমল বলল, "আর যাবেনা জলের ধারে? এইত সাহস!"

অপ্রস্তুত ভাবে অমলের বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে প্রতিমা দু'হাতে কপালের জল মুছতে মুছতে বলল, "ঢেউগুলি বড় বেয়াড়া তো! একদম ভিজিয়ে দিলে। আপনি তো পালাতে পারতেন? বড্ড বোকা!"

"চালাক হলেতো আরো ফ্যাসাদে পড়তুম!"

"তার মানে?"

"কি নিয়ে আর ফিরতুম!"

উভয়েই উভয়ের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে এক সময় উভয়েই হেসে উঠল।

"না, আর নয় এখানে। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। চল।" বলে অমল এগিয়ে চলল। প্রতিমা তার অনুসরণ করল।

রাত্রে আহারাদির পর নারীসুলভ কর্তব্যবোধে প্রতিমা অমলের বিছানাটি গুছিয়ে রাখছিল। অমল ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে তাকে দেখে চমকে উঠল। কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে সে বলে উঠল, "তুমি এখানে! কখন এলে?"

"কেন? এইতো ঢুকছি; দেখছেন না বিছানাটা কেমন হয়ে আছে?" বলেই প্রতিমা অমলের ভাবহীন স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "অমন করে চেয়ে কি দেখছেন?"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অমল বলল, "দেখছি তোমাকে! শাড়ী পরলে তোমায় কত সুন্দর মানায়! তুমি আর সাদা থান্ পরবে না বল?"

"ওমা! সাদা থান্ পরতে যাবো কেন!"

"সত্যি বলছ লীনা! তুমি আর মন্দিরে থাকবে না বল?" অমলের কণ্ঠস্বরে এক করুণ মিনতির ভাব ফুটে উঠল।

প্রতিমা বিস্মিত ভাবে বলে উঠল, "আপনি কি বলছেন অমলদা'!"

অমলের দৃষ্টি স্থির, বিস্ফারিত; যেন সে কিছু বোঝবার চেষ্টা করছে।

প্রতিমার যেন কেমন সন্দেহ হল। এমনতো সে কখনো তাকে দেখেনি! তার বুকের ভেতরটাও যেন কেমন করতে লাগল! সে ডাকল, "অমলদা' অমলদা'!...ওকি! অমন করছেন কেন?" বলেই সে অমলের কম্পমান দেহ ধরে ঝাঁকুনি দিতেই তার নিস্পন্দ দেহ গড়িয়ে পড়ল। প্রতিমা তাকে ধরে ধীরে ধীরে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "মাসিমা, মাসিমা—"

প্রতিমার চীৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে মালতিদেবী ও হৈমবতীদেবী ছুটে এলেন। প্রতিমা বলল, "অমলদা' কেমন কচ্ছে দেখুন!"

মালতিদেবী অমলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে বাবা ?"

অমল ড্যাব ড্যাব্ করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন বোঝার চেষ্টা করছে সে কোথায়। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসুনেত্রে সে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল, যেন কাকে সে খুঁজছে।

মালতিদেবী তার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে বাবা, আমাকে বলবিনি ?"

অমল আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, "চলে গেছে?"

"কে ? কার কথা বলছিস্ তুই ?" মালতিদেবী প্রশ্ন করেন।

"কৈ ? নাতো !" বলে অমল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

সকলকে তদবস্থায় দেখে সে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কি মা ! কি হয়েছে ?"

তাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হতে দেখে মালতিদেবী বললেন, "না, কিছু নয়। সারাদিনের পরিশ্রমে তোমার মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল। নাও, শুয়ে পড় দিকিনি এবার, কাল সকালে আবার কথা হবে।"

* * * * * *

এক এক করে পাঁচদিন কেটে গেল। এই ক'দিনের মধ্যে মালতিদেবী সকলকে নিয়ে পুরীর অনেক দর্শনীয় স্থান দেখে নিয়েছেন। যেমন—ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডাচিকা বা গুণ্ডিকাবাটী। অনেকে আবার গুণ্ডিভামণ্ডপও বলে থাকে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডাচিকা দেবীর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে। তারপর তাঁরা দেখেছেন জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ী। সেখানে আছে চন্দনতলাও। এখানে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা হয়।

আজো তাঁরা বেরিয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের মন্দির দর্শন করে সকলে এগিয়ে চলেছেন বুদ্ধদেবের মন্দির 'দগোবা' দেখবেন বলে। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের 'দাঁত' প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইজন্য পুরাকালে এই সহরের নাম ছিল

ন্তপুরা। এইটাই ছিল ওড়িষ্যার রাজধানী। হ্যাভেল লিখিত ারতবর্ষের ইতিহাস ও পাশ্চাত্য স্থাপত্য গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে।

অনেকে বলে থাকেন পুরাকালে পুরী একটি বৌদ্ধ ধর্মস্থান ছিল। ন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং-এর ববণী থেকে আমরা এর সঠিক পরিচয় জানতে পারি। তিনি তাঁর বরণীতে লিখেছেন যে সাত শতক থেকে পুরী হিন্দুদিগের ধর্মস্থান ল। তখন এইস্থানের নাম ছিল 'চেলিটালো'। চীনা ভাষায় লিটালো' শব্দের অর্থ 'ক্ষেত্র' বা ধর্মস্থান। কিন্তু বৌদ্ধধর্মস্থানকে নেই ক্ষেত্র বলে না। যদি এটা বৌদ্ধদিগের ধর্মস্থান হতো, ব তিনি তা' তাঁর বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে যেতেন, যেমন তিনি ধ গেছেন 'পুষ্পগিরি' সম্বন্ধে। সুতরাং পুরী বা পুরুষোত্তম ত্র যে পুরাকাল থেকেই হিন্দুদিগের তীর্থস্থান ছিল, সে বিষয়ে ান সন্দেহই নেই।

দগোবা দেখবার পর সকলে এসে উপস্থিত হলেন 'বিমলাদেবী- ঠ'। এইখানে সতীর পদদ্বয় পতিত হয়। বাহান্ন পীঠের মধ্যে অন্যতম।

মন্দিরে পূজাদি সম্পন্ন করে সকলে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন হল সকলেই যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। ক'লকাতার মানুষ, -ফেরার তো সে রকম অভ্যাস নেই! পা যেন আর চলতেই ছে না।

এই অবসন্নতার মধ্যেও যেন কিছুটা সজীবতা আনবার চেষ্টা ছিল প্রতিমা। পাছে এই অজুহাতেই যদি তাদের ফিরে যেতে আবারতো সেই সীমাবদ্ধ গৃহকোণ! তারচেয়ে বরঞ্চ এই । ক্লান্তিবশতঃ তার পক্ষে একটু পিছিয়ে পড়াটাও কিছু আশ্চর্য তার শুধু আশ্চর্য লাগে তার অমলদা' তো এখনো পিছিয়ে ছেনা! মায়ের বা মাসিমার কথা সে ভাবেনা। তাঁরা প্রাচীন । তীর্থ দর্শনে তাঁদের যেমন বিরাম নেই তেমনি ক্লান্তিও নেই।

"কি, এত পেছিয়ে পড়লে যে ? চলতে কষ্ট হচ্ছে ?"

"একি ! আপনি দাঁড়ালেন কেন ? ওঁরা কি ভাবেন ব তো ?"

প্রতিমার সতর্কতা দেখে অমল হেসে উত্তর দিল, "ওঁরা ঠি ভাববেন, আমাদের মধ্যেই যত ভয়। নয় কি ?"

"জানিনে যান্ !···দেখবেন, আবার যেন আমাকে দেখে আঁৎ না ওঠেন !" বলে প্রতিমা আড়চোখে একবার তাঁর দি কটাক্ষ করল।

"ও, সেই রাতের সেই ব্যাপারটা ? ওটা একটা অনুশাসন অমল বলল।

"অনুশাসন ! তার মানে ?"

"সে আর একদিন বলব'খন। এবার একটু এগিয়ে চ নইলে ওঁরা আবার কিছু ভাবতে পারেন।"

অমলের এই ছোট্ট মন্তব্যে প্রতিমা কৃত্রিম ক্রোধে তার মু দিকে তাকাতেই সে হেসে উঠল।

ছয়

রবিবারের সকাল।

ভোর থেকেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে।

বিছানায় বসে অমল অভ্যাস বশতঃ প্রথম দফায় চা পান করে স বসে কি যেন ভাবছে। আজ ক'দিন থেকেই তার যেন কি য়েছে; চলায় বলায় কোনোকিছুতেই যেন তার কোন মনোযোগ ই, সর্বদাই কি যেন সে চিন্তা করে। একটা বড় জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট-ব যেন তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে।

রাধাকান্তমঠে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যে ঘরে চৈতন্যদেব বাস তেন সেই ঘর দেখবার পর থেকেইতার এই উদাসীন ভাবের উদয় । এই ঘরে শ্রীচৈতন্যদেবের একজোড়া খড়ম, একটি কমণ্ডলু ও গণ্ড কাঁথা আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। ক'লকাতায় বা অন্যত্রও জায়গায় রাধাকান্ত জীউর মন্দিরে সে গিয়েছে। কিন্তু বিগ্রহ ন করে কোন দিনই তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। হয়তো ষের তৈরী মূর্তির কাছে সে কোন উত্তরই প্রত্যাশা করেনি। ন্তু আজ শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে তার মনে গে উঠেছে একটি প্রশ্ন—একটি শাশ্বত মীমাংসার আবেদন। ন্তু কে তার এই প্রশ্নের উত্তর দেবে!

হঠাৎ তার মনে এক সম্ভাবনার কথা উঁকি মেরে উঠল। তাই তঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করে সামান্য কিছু জলযোগ করে সে নিভৃতে লের অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে পড়ল কাশীমিশ্রের গৃহাভিমুখে।

চলার পথে অমল সার্বভামের বাড়ীর নিকট এসে পৌছাল। সার্বভামের বাড়ীতেই শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবৎপুরাণ শুনতে আসতেন। টি ঘরের দেওয়ালে এখনও সার্বভাম, শ্রীচৈতন্যদেব ও রাজা াপরুদ্রদেবের মূর্তি অঙ্কিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গ

দেশের শেষ রাজা সারংদেব এই প্রতাপরুদ্রদেবের পুত্র এবং তি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। 'হান্টারের উড়িষ্যা' থে আমরা জানতে পারি ১৫৩২ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

সার্বভামের বাড়ী বাঁয়ে রেখে অমল এগিয়ে চলল। কিছুদ গিয়েই নজরে পড়ে একটি কুটীর—যবন হরিদাসের কুটীর। এখা এক অলৌকিক বকুল গাছের তলায় বসে ভক্ত হরিদাস সাধ করতেন।

কাশীমিশ্রের গৃহে পৌঁছে অমল রঘুনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করল তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন আগে তার পরিচয় হয়েছিল। ইনি কটকে অধিবাসী। পুরীতে এলে প্রায়ই তিনি এখানে আসেন।

অমলকে দেখে রঘুবাবু হৃষ্টমনে তাকে কাছে বসিয়ে তার পুন আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেই অমল বলল, "প্রভু, যে আপনাকে প্রথম দেখি, সেইদিন থেকেই একটি প্রশ্ন আপনা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। কিন্তু সাহস বা সুযোগ পাইনি।"

মোহময় হাস্যে রঘুনাথবাবু বললেন, "কি প্রশ্ন? তুমি নিঃসঙ্কো আমায় জিজ্ঞাসা করতে পার।"

অমল ইতস্ততঃ করে বলল, "প্রভু, অপরাধ নেবেন না। আম মনে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। আপনি দয়া করে সেই দ্ব মীমাংসা করে দিলে আমি গ্লানিমুক্ত হতে পারি।"

"বেশ ত জিজ্ঞাসা কর।" রঘুনাথবাবু বললেন।

সাহস পেয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায় তিনি নিজেই গীতায় বলেছেন যে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং অধর্মের বিনা জন্য তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। তবে কেন তি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্য সমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ নিন্দনীয় কা করলেন? রাসলীলায় গোপিনীদের সঙ্গে যে ব্যবহার তিনি করে বা গোপিনীদের বস্ত্রহরণ বা অন্যান্য আরো যে সব কলঙ্ককাহিনী তাঁ সম্বন্ধে জানতে পারা যায়, এগুলির কি কোন সদুত্তর আছে?"

অমলের এই প্রশ্ন শুনে রঘুনাথবাবু প্রথমটা চমকে উঠলেন। পরক্ষণেই স্মিতহাস্যে তিনি উত্তর দিলেন, "বৎস, যে প্রশ্ন তুমি করেছ, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে বহু সময় দরকার। তবে, সংক্ষেপে তোমায় বলছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল কথা তুমি জেনেছ, যেমন—চোরাপবাদ, পরদারবাদ ইত্যাদি—এগুলোর কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। এ সবই অমূলক ও কল্পনাপ্রসূত। ভক্তিরসকে অধিকতর মাধুর্যময় করে তোলবার তাগিদেই ভাবপ্রবণ ভক্তেরা ঐরকম গল্পের অবতারণা করেছেন। পুরাণেও রাধার কোন নামোল্লেখ নেই। তবে গোপিনীদের সঙ্গে তাঁর লীলার বা মধুর মেলামেশার নজীর পাওয়া যায়। এর সপক্ষেও যথেষ্ট সংযুক্তি আছে—যেগুলি জানতে পারলে তোমার মন দ্বিধামুক্ত হবে।"

"আমায় বলুন!"

রঘুনাথবাবু বলতে লাগলেন, "শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জীবন কেটেছে তাঁর গোকুল ও বৃন্দাবনে। তাঁর চরিত্রের উপর যে কলঙ্ক-ছাপ আরোপিত হয়েছে, তার সময়-কাল এই বৃন্দাবনে অবস্থানকালে। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হল কংসবধ থেকে আরম্ভ করে দুর্যোধনাদির বিরুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতির সময় পর্যন্ত। এই সময়কালে শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভা ও মহাজ্ঞান দর্শনে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমস্ত গুণী ও শক্তিশালী রাজন্যবর্গ, এমনকি, সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং অবতার জ্ঞানে তাঁর পূজা করতে থাকে। তৃতীয় অধ্যায় সুরু হল ভারত যুদ্ধের আরম্ভ থেকে তাঁর তিরোধানের সময় পর্যন্ত। এই পর্যায়ে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা ও মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রথম অধ্যায় বাদ দিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় মহিমান্বিত। প্রথম অধ্যায়েরও প্রথম দিকটা অর্থাৎ অতি বাল্যাবস্থায় তাঁর বহু শৌর্যবীর্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময় তিনি পুতনাবধ, অঘাসুর, বকাসুর ও বৎসাসুর বধ, রথভঙ্গ, কালীয়দমন, ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ ইত্যাদি বহু শক্তির পরিচয় দেন। সুতরাং এইসব শক্তি ও গুণ যাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল তিনি কি তাঁর জীবনের সামান্য অংশে এমন কাজ করে গেছেন যা সমাজের চোখে নিন্দনীয়? তা'ছাড়া, তৎকালীন আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ-বণিতা ভগবান জ্ঞানে যাঁর পূজা করে গেছেন, হয় তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে এইসব কুৎসা বিশ্বাস করেননি, অথবা, এসকলের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাঁর জীবদ্দশাতে তাঁর সম্বন্ধে যে ইতিহাস সকলে জানতেন, এবং তা জেনেই সকলে তাঁকে অবতাররূপে পুজা করে ধন্য হয়েছেন।

আজ বহুযুগ পর আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁর সম্বন্ধে শুধু কল্পনা ছাড়া বেশী কিছু দিতে পারেন না বা দিলেও তা সর্বজনপূজিত অবতারের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। এখন, সকল দিক বিচার করে তুমি নিজেই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে পাবে নাকি?"

সত্যই তো এই সরল অখণ্ডনীয় যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা অমলের মনে কেন যে স্থান পায়নি, তা ভেবে সে মনে মনে লজ্জা বোধ করতে লাগল। তবুও তর্কের মাধ্যমে আরো কিছু জ্ঞান লাভের আশায় সে পুনরায় রঘুবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে রাধাকৃষ্ণের মিলন বা বৃন্দাবনে গোপিনীদের সঙ্গে লীলাখেলার কাহিনী শুধু নিছক কল্পনা প্রসূত?"

রঘুবাবু বললেন, "না, তাও নয়। বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতে রাধার নামের কোন উল্লেখ নেই। ভাগবতে আছে, বৃন্দাবনে বহু গোপিনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা ছিল এবং বিশেষ করে তাদের মধ্যে একজন গোপিনীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় হলে এক শরৎ পূর্ণিমার রাতে শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিয়ে অদৃশ্য হন। মনে হয় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রাধার উৎপত্তি হয়!

বৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন ও উভয়ের মধ্যে গভীর প্রেমের উন্মেষের মধ্যে হয়তো ইতিহাস আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের

এই মিলনকে সরস ও মাধুর্যময় করে তোলবার জন্য কতকগুলি কল্পিত রূপক স্থান পেয়েছে। জীবনকে চরম সীমায় বিকশিত করতে পারলে সিদ্ধিলাভ হয়। ভক্তিপ্রেমের মাধ্যমে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কি করে সিদ্ধিলাভ করা যায়, রাধাকৃষ্ণের মধুর ভাবগম্ভীর ও নিষ্কাম প্রেমের ভেতর দিয়ে তাই দেখান হয়েছে। এর একটা দার্শনিক দিকও আছে। ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য' বইখানিতে এই দার্শনিক দিকটা অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া আছে।

সিদ্ধিলাভ করবার পূর্বে তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। যেমন—ধর্ম, অর্থ ও কাম। কাম জয় করতে পারলেই চরম প্রাপ্তি। মানুষের যখন খুব জলতেষ্টা পায় এবং যে সাধন-শক্তির দ্বারা সেই তেষ্টাকে দমন করা যায়, তার চেয়েও লাখোগুণ সাধন-শক্তির প্রয়োজন হয় সামনে জল রেখে সেই তেষ্টাকে দমন করতে। সেই রকম, কাম জয় করতে হলে সম্পূর্ণ ভোগের ভেতর দিয়েই তাকে দমন করতে হয় এবং সেই চরম পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে পারে সেই মোক্ষলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণও রাধাকে তাঁর প্রতি আসক্ত করে ভক্তি-রসের মাধ্যমে তার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটান। রাধার কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমে যদি বিশুদ্ধতা বা সরলতা না থাকত, তবে প্রকাশ্যভাবে শত সখীর দ্বারা বেষ্টিত থেকে সে সেইরকম আচরণ করতে পারত না বা অন্যান্য গোপিনীরাও তার প্রতি এতটা সহানুভূতিসম্পন্না হতে পারত না। বরঞ্চ তার প্রতি ঈর্ষার ভাবই তারা মনে মনে পোষণ করত। কারণ, তারাও নারী। অধিকন্তু, যে কামাসক্তি মহাশক্তি-মান জীব এমন কি সময়ে সময়ে ভগবানও দমন করতে পারেন না, গোপিনীরা সাধারণ নারী হয়েও সেই প্রবৃত্তি দমন করে তাদের সকল প্রেম যেন রাধার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছে এবং রাধাকেই একক এবং একাত্মভাবে কৃষ্ণপ্রেমে প্রবুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। শ্রীকৃষ্ণের অদৃশ্য ইঙ্গিতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল এবং

তিনি জগৎকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি চরম আসক্তি এবং অনুরাগই প্রকৃত জ্ঞান এবং তিনি নিজেও সংযম ও বীর্যস্তম্ভন করে রাধাকে এই জ্ঞানলাভে সাহায্য করে তার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটান।"

কথার মাঝে অমল জিজ্ঞাসা করে, "রাধাকৃষ্ণের এই মিলন কি চিরস্থায়ী হয়েছিল?"

রঘুনাথবাবু উত্তর দিলেন, "তোমার প্রশ্নের সঠিক মর্ম উপলব্ধি না করলেও তোমায় সাধারণভাবে এই বলতে পারি, সাধনার দ্বারা যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন আর আত্মা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জগৎতকে তখন সে সুন্দর দেখে এবং তার এই সিদ্ধির ফল সে জগতের কল্যাণের জন্যই উৎসর্গ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর স্বার্থই তখন প্রাধান্য পায়। সেইজন্য, যখনই অধর্মের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য কংস বধের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ডাক এল, তখনই তিনি চিরদিনের জন্য বৃন্দাবন ছেড়ে গেলেন এবং শ্রীরাধাও যে তাঁর বিরহে উন্মাদিনী হয়ে আহারনিদ্রা ত্যাগ করেছিলেন, এর ইতিহাসও পাওয়া যায় নি।"

তিনি নীরব হলেন। অমলের মনে হল, আজ যে জ্ঞান তার লাভ হল, তাতে তার মনের দুয়ার যেন খুলে গেছে। চিরান্ধকার ভেদ করে সে যেন দিব্য আলোর রশ্মি দেখতে পাচ্ছে। তার মন ভরে গেছে। ভক্তিগদগদ ভাবে সে ভূমিষ্ঠ হয়ে রঘুবাবুর পদধূলি গ্রহণ করল।

ঠিক এই সময় মার্কণ্ডসাহির বাসায় এক বিপরীত কাণ্ড ঘটে গেছে। সকাল থেকেই ছেলেকে বাসায় অনুপস্থিত দেখে মালতিদেবী এক মহাদুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন। বিদেশ বিভূঁই; এখানে কোন পরিচিত লোক বা আত্মীয়স্বজন তাঁদের নেই যেখানে অমল যেতে পারে! আর না বলেই বা সে যাবে কেন! আজ ক'দিন থেকেই ছেলের হাবভাব তাঁর ভাল লাগছিল না। নানা রকম আশঙ্কায় তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

"হ্যাঁরে প্রতিমা, সকালে চা দেবার সময় সে তোকে কিছু বলেছিল?" মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

"কৈ না তো!" ছোট্ট উত্তর।

"তুই কিছু বুঝতে পেরেছিলি? কোন হাবভাব?"

"না। চা দিতে গিয়ে দেখি বিছানার উপর চোখ বুজে বসে আছেন তিনি। আমি শুধু 'চা দিয়ে গেলুম' বলে পালিয়ে আসি।"

রকম-সকম দেখে হৈমবতীদেবীও যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা দিদি, এমনও তো হতে পারে। সে জগন্নাথদেবের মন্দিরেই গিয়ে বসে আছে?"

"অত ভাববারই বা কি আছে? ছেলেমানুষ তো নয়, ঠিক ফিরে আসবে।" প্রতিমা মন্তব্য করল।

পরন্তু, প্রতিমার এই আত্মপ্রত্যয় মন গ্রাহ্যিক, না, ভাব-গ্রাহ্যিক তা বোঝা গেল না। কিন্তু তার মন্তব্যের পরেও একটা ব্যাখ্যা যে সে তার মাসিমা বা মায়ের মুখ থেকে চায়, তা' তার দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। উদ্‌ভ্রান্ত মনকে বশে আনবার জন্য আত্মপ্রবঞ্চনা হলেও সময়ে সময়ে আশাবাদের আশ্রয় নিতে হয়। প্রতিমারও মানসিক অবস্থা তদ্রূপ। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী। এরই মধ্যে এই কয়েক দিনের মেলামেশাতে অমলের প্রতি তার মন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মনের এই দুর্বলতা সে কারো কাছে প্রকাশ করতে চায় না। অনেক সময় ভাব গোপনের এই বিশেষ সতর্কতাই প্রয়োগ দোষে অন্যের চোখে বিপরীত ভাব ফুটিয়ে তোলে।

হৈমবতীদেবীও প্রতিমার কথা শুনে একবার তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মালতিদেবীকে বললেন, "দিদি, চলুন না একবার মন্দিরেই ঘুরে আসি, বলা তো যায় না!"

"দেখে আসতে আর দোষ কি!" মালতিদেবী জানাল।

"আমি কিন্তু এই রোদ্দুরে বেরোতে পারব না।" প্রতিমা তার সুচিন্তিত অভিমত জানিয়ে দিল।

"কেনরে? তুই একা একা থেকেই বা এখানে কি করবি? মালতিদেবী কটাক্ষ করেন।

নির্লিপ্ত ভাবে প্রতিমা উত্তর দেয়, "আমি বরঞ্চ রান্নাবান্নাগুলো সেরে রাখি; এসে তো আবার করতেই হবে।"

"বেশ! আর এর মধ্যে যদি খোকা ফিরে আসে, আটকে রাখবি, যেন আমাদের খোঁজে আবার মন্দিরে গিয়ে হাজির না হয়।" মালতিদেবী বললেন।

"এখানে আসতে তার বয়ে গেছে!"

"কেন, তুই রইলি বলে?" মালতিদেবী মুখ টিপে হেসে হৈমবতীর দিকে তাকালেন।

"থাক্, আর যেতে হবে না।" বলেই প্রতিমা রহস্যময় অভিমানে পাশের ঘরে চলে গেল।

কিছু অনুমান করে উভয়ে পেছন ফিরতেই দেখতে পেলেন ধীরে ধীরে অমল ঘরে প্রবেশ করছে। তার মুখে একটা প্রসন্নতার ছাপ।

"কোথায় গিয়েছিলি বাবা! বলে যেতে হয়তো!"

মায়ের উক্তিতে অমল আশ্চর্য বোধ করে, "কেন মা, আমি কি আজো তোমার সেই কুণো ছোট্ট খোকাটি আছি নাকি!" বলে মায়ের মুখের কাছে এসে শিশুসুলভ চপল হেসে সে পুনরায় বলল, "বলতো মা, আমি কোথায় গেছলুন?"

"কি করে আর জানবো! আমায় কি কিছু বলে গেছিলি?

"জানো মা, রাধাকান্ত মঠের এক সন্ন্যাসী রঘুনাথ ঠাকুর সত্যি খুব জ্ঞানী পুরুষ।"

"ও! ওইখানে বুঝি গিয়েছিলি? আর আমরা এদিকে ভেবে মরি! প্রতিমা ঠিকই বলেছিল।"

প্রতিমা এই সময় কি এক 'বিশেষ জরুরী' কাজে ঘরে ঢুকে মালতিদেবীর কথা শুনেই ঘোর প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল, "ওমা!

আমি আবার কি বললুম!" বলে যে কাজে এসেছিল তা' অসম্পূর্ণ রেখেই বা হয়তো ভুলে গিয়েই সে ঘুরে চলে গেল।

"প্রতিমার কি হয়েছে? মনে হল খুব খানিকটা চটে গেছে?… দাঁড়াও, ওকে আরো খানিকটা রাগিয়ে দিয়ে আসি।" বলেই অমল দুষ্টু হেসে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মালতি ও হৈমবতীদেবী উভয়েই অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। একটি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস তাঁদের বুক থেকে বেরিয়ে এল কিনা তা' ঠিক বোঝা গেল না। তবে এর পরে কোন সরস ঘটনার জন্য তাঁরা অধীরাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেইদিন শেষ রাতের দিকে অমলের জ্বর এল। পরের দিন সকালবেলা মালতিদেবী ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন কপালটা খুব গরম। তিনি আবেগে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?"

অমল শুধু মাথা নাড়ল। ঠিক মনে হল কি একটা অস্বস্তি যেন সে ভোগ কচ্ছে। আচ্ছন্নের মত সে পড়ে রইল।

সারাদিন একইভাবে কেটে গেল।

সন্ধ্যার পর থেকে দেহের উত্তাপ ক্রমশঃই বেড়ে চলল। মালতি দেবী একভাবে ছেলের মাথার কাছে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন।

"মাসিমা, এবার আমি একটু বসছি, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এক জিরিয়ে নাও, সেই কখন থেকে বসে আছো!" প্রতিমা এগিয়ে এল

"বস্‌বি? তবে বোস্‌। আমি এই ফাঁকে আহ্নিকটা সেরে নিই। বলে তিনি ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে উঠে প্রতিমার হাতে পাখাটি দিয়ে সরে এলেন।

পাখাটি হাতে নিয়ে প্রতিমা অমলের বুকের কাছে বসে কিছুক্ষণ তার মোহাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ঘুমুচ্ছেন ?"

অমল যন্ত্রণাকাতর মুখখানি ধীরে ধীরে তার দিকে ফেরাতে প্রতিমা আস্তে আস্তে তাকে বাতাস করতে লাগল।

"কি কষ্ট হচ্ছে অমলদা' ?"

"প্রতিমা !"

"হ্যাঁ। মাসিমা এইমাত্র উঠে গেলেন।"

"ও। জানো প্রতিমা, মানুষ মরে গেলেই কিছু তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার সেই আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য তাকে আবার জন্ম নিতে হয়।"

"এসব কথা কেন বলছেন অমলদা' ?"

অমল তার কথার উত্তর দেয় না ; শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—যেন কিছু বোঝবার চেষ্টা করে। প্রতিমাও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মুখের প্রতিটি ভাবান্তর লক্ষ্য করে। কি এক আবেশে তার কুমারী-মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মানুষের কতকগুলি কোমল বৃত্তি আছে। স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে এই বৃত্তিগুলি সজাগ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রেল ভ্রমণে, তীর্থস্থানে, রোগশয্যার পাশে—কী এক সূক্ষ্ম আকর্ষণে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মানুষ একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রতিমাও যেন আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সে জানে না এই পাওয়ার শেষ পরিণতি কোথায়।

"অমন করে কি দেখছেন ?" প্রতিমার চোখে বিস্ময়ের ভাব।

"আচ্ছা প্রতিমা, তুমি পরকাল বিশ্বাস কর ?"

প্রতিমার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে আসে। বিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসা করে, "এ আবার কি কথা! পরকাল বলে আবার কিছু আছে নাকি ?"

"নেই।" অমল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে "—আত্মা অবিনশ্বর, এর ধ্বংস নেই। জীব মরে গেলে তার পার্থিব দেহটাই শুধু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার আত্মা আবার অন্য দেহ অবলম্বন করে এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর

অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, তেমনি পরকাল না থাকলে ইহকালেরও কোন বোধ থাকতো না। আসা যাওয়া নিয়েই সংসার।"

তার কথায় বাধা দিয়ে প্রতিমা প্রশ্ন করে, "সব আত্মাই কি ফিরে আসে?"

অমল উত্তর দেয়, "না। মরার আগে যে সব দেহী সংস্কার বা সকল প্রকার বাসনা মুক্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন, তাঁদের আত্মা আর ফিরে আসে না। সরাসরি তাঁদের আত্মা মহাশূন্যে দেবলোকে চলে যায়। এরা মুক্তাত্মা। অন্যান্য সাধারণ আত্মারা দেহীর মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করে চলে আসার পর তারা তাদের পূর্ব কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করতে থাকে। ভোগ শেষ হলেই আবার তারা পার্থিব জগতে ফিরে আসে। যেসব আত্মারা আর ফিরে আসে না, অনেক নূতন আত্মা তখন তাদের স্থান পূর্ণ করে—জন্ম-মৃত্যুর ভারসাম্য ঠিক রাখে। আরো একটা কথা। আত্মা উভয়লিঙ্গ। যে আত্মা পুরুষ, সেই আত্মাই আবার স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে।"

"সে কি!" প্রতিমা আশ্চর্য বোধ করে।

"হ্যাঁ। আত্মা স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। মাতৃগহ্বরে আশ্রয় নেবার পর যে দেহ অবলম্বন করে সে ভূমিষ্ঠ হয় সেইটাই হয় তার পার্থিব বাহ্যিক রূপ। দেখতে পাওনা, অনেক পুরুষের দেহ জন্মের কিছুদিন পর মেয়ে ছেলের দেহে রূপান্তরিত হয়? এ রকম ঘটনা আজকাল বিরল নয়।"

"আপনি এসব কথা জানলেন কি করে?"

"এই পুরীতেই সেদিন এক মহাপুরুষের কাছে শুনছিলুম। স্বর্গদ্বারের কাছে এক মন্দিরে তিনি থাকেন।"

"তা' আজ এইসব কথা তুলছেন কেন?"

প্রতিমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বেই মালতিদেবী ঘরে ঢুকে প্রতিমাকে বললেন, "যা, এবার তুই খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ বসছি।"

মনের উপর একটা বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে মায়ের দিকে কটাক্ষ করে প্রতিমা উঠে যায়।

একটু একটু করে রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অমলের দেহের উত্তাপও যেন বেড়ে চলল। মালতিদেবী একভাবে ছেলের শিয়রের কাছে বসে তার মুখের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য কচ্ছিলেন। তাঁর একাগ্রতা ও মনের দৃঢ়তা দেখে হৈমবতী দেবীও মনে মনে মুগ্ধ হলেন।

রাত বারটা।

এই সময় মনে হল অমলের দেহের উত্তাপ অনেক কমে এসেছে। পূর্বে যে অস্বস্তির ভাব দেখা গিয়েছিল, এখন যেন তার' অনেকটা উপশম হয়েছে। আরাম পেয়ে অমল পাশ ফিরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

"আমি এবার বসি মাসিমা? তুমি একটু শুয়ে নাও না?"

মালতিদেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, "আয়। কিছু এখন আর করতে হবে না তোকে, ঘুমুচ্ছে।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় বললেন,—"এইখানে কিছুক্ষণ ব'স্। শুধু নজর রাখবি। সেরকম কিছু মনে হলে আমায় ডাকবি। এবার 'রেমিশন' হয়ে যাবে। ঘণ্টাখানেক পরে আমায় ডেকে দিস।',

ঢং ঢং করে রাত দু'টো বাজল।

অমল তখনও ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ অমলের মনে হল কে যেন অতি সযত্নে তার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে তার। চোখ মেলেই দেখতে পেল লীনা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাব গদগদস্বরে সে বলল, আমার জ্বর হয়েছে লীনা! তাই এতদিন তোমার কাছে আসতে পারিনি। সকলেই পুরীতে রয়ে গেল, আমিই শুধু চলে এলুম।"

'বেশ করেছিস্। ওখানকার কাজ তোর শেষ হয়ে গেছে। এবার কাজের কাজ করতে হবে তো! দেখতে পাচ্ছিস্ না, কত

পাপ জমে উঠেছে? চারদিকে হাহাকার! দেশ এবার রসাতলে যাবে যে! নে, প্রস্তুত হয়ে নে। আমি তোর জন্য সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রেখেছি।' লীনার কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর বেজে উঠল।

অমল সাগ্রহে বলে উঠল, "তুমি আমায় পথ দেখাও লীনা! আমি—"

"অমলদা', অমলদা'—"

কার ডাকে অমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মোহাচ্ছন্নভাবে সে চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেল প্রতিমা তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তার গা ধরে মৃদু ঝাকুনি দিচ্ছে।

—"কার সঙ্গে কথা কইছেন? ··অমন করে তাকিয়ে কি দেখছেন?"

অমল প্রতিমার কথার কোন উত্তর দেয় না, কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে।

প্রতিমার কণ্ঠস্বরে মালতিদেবীর সজাগ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ধড়্মড়্ করে উঠে তিনি অমলের শয্যার পাশে চলে এলেন।

তাঁকে দেখে প্রতিমা উঠে পড়তেই অমলের পাশে বসে মালতিদেবী ডাকলেন, "কি হয়েছে বাবা?" তিনি তার চুলে হাত বুলোতে লাগলেন।

অমলের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল।

"মা!" সে ডাকল।

"হ্যাঁ বাবা!"

চারদিকে একবার দেখে নিয়ে অমল বলল, "মা, চল আমরা লীনার কাছে চলে যাই, এখানে আর থেকে কাজ নেই!"

"বেশতো বাবা, তোমার শরীরটা ভাল হলেই আমরা সব চলে যাব।" মালতিদেবী বললেন।

"হ্যাঁ, সেই ভাল, প্রতিমাও আমাদের সঙ্গে যাবে।" বলে অমল চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

প্রতিমার বুকে অমলের কথার প্রতিধ্বনী জেগে উঠল—প্রতিমাও আমাদের সঙ্গে যাবে। কি এক আবেশে প্রতিমার চোখদুটি বুজে এলো।

অমল যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বেলা আটটা। সামনে প্রতিমাকে দেখে সে বলে উঠল, "জানো, আমরা সব ক'লকাতা চলে যাচ্ছি।"

প্রতিমা বলে, "আমাকে নিয়ে যাবেন না?"

অমল বলে, "বারে, তুমিতো সঙ্গেই থাকবে, মা থাকবে, মাসিমা থাকবেন।"

প্রতিমা হাসে। তাদের মধ্যে যখন এইরকম কথাবার্তা চলছিল ঠিক সেই সময় কলকাতায় বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের বাড়ীর শিবমন্দিরে এক অভাবনীয় কাণ্ড চলছিল। মন্দিরের মার্বেল পাথরের চাতালের উপর বসে আছে লীনা ভাব গম্ভীর মুর্তিতে। আর ঠিক চাতালের নীচে জমায়েত হয়েছে একদল ভিখিরী। স্কুলের শ্যামপণ্ডিত মশায় একটা প্রকাণ্ড বেতের ধামায় করে মুড়ি-মুরকি-বাতাসা উপস্থিত সব ভিখিরীদের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। এই দৃশ্য দেখবার জন্য সেখানে পল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত লোক জড়ো হয়েছিলেন। শ্যামপণ্ডিত একদিক থেকে আর একদিকে তার বিরাট ভূঁড়িটি দুলিয়ে তাঁর মুড়ি-মুরকি-বাতাসা বিতরণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল কিসের এক আবেগে গভীর আনন্দে তিনি মেতে উঠেছেন। ভিখিরীরাও কেউ তাঁর আধ-খোলা কাছা ধরে টানছে, আবার কেউ তাঁর হাতের ধামা ধরে বিশেষ করুণা আদায়ের চেষ্টা করছে। আজ কিন্তু সর্বজন বিদিত পরনিন্দুক ও কর্কশভাষী সেই শ্যামপণ্ডিত এতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা বিচলিত হচ্ছিলেন না। কিন্তু কেন?

ব্যাপারটা মোটামুটি এই—শ্যামপণ্ডিত এই পল্লীরই একজন বাসিন্দা—কোন এক স্কুলের হেড পণ্ডিত। অন্যান্য সব গুণের মধ্যে

তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল পরচর্চা করা। অবশ্য তাঁর এই পরচর্চা কারো গুণকীর্তন করে নয়। এক ধরণের লোক, বিশেষ জীবও বলা যেতে পারে, আছে যারা নিজেদের কোন স্বার্থ না থাকলেও অভ্যাসবশতঃ পরচর্চা বা পরের নিন্দা করে থাকে বিরামহীন ভাবে। এই শ্যামপণ্ডিতমশায়ও ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। যোগেশবাবুর পুত্রবধু লীনার মন্দিরে অবস্থানের পর থেকেই শ্যাম পণ্ডিত বিশেষ ব্যাখ্যা করে লোককে এতদিন বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে মেয়েটিকে ভূতে পেয়েছে এবং শীঘ্রই এর যথাযথ ব্যবস্থা না করালে এতে পাড়ার লোকেরই অকল্যাণ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে নিদানের নির্দেশ দিতেন তা হল—কোন ভাল ওঝার শরণাপন্ন হওয়া, আরো কতকি। তাঁর উক্তি শুনে শ্রোতারা তাঁর অদ্ভুত জ্ঞানে ও আবিস্কারে মুগ্ধ হয়ে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন কিনা জানা নেই, তবে দূর থেকে তাঁকে দেখলেই তাঁরা যে ভিন্ন পথে ঘুরে যাবার চেষ্টা করতেন তা' প্রায়শঃই অনুধাবন করা গেছে।

এই শ্যাম পণ্ডিতের একটা বিশেষ রোগ ছিল শূলব্যথা। বহুদিন থেকেই তিনি এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন; চিকিৎসাও করেছেন বহু প্রকারের—এলো, হোমিও, কবিরাজী, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি। কিন্তু রোগ তাঁর সারে নি। যখন রোগের প্রকোপ বেশী হয় তখন যন্ত্রণায় তিনি পাগলের মত ছটফট করে বেড়ান, এমন কি, ঘরের মেঝের উপর কখনো বা রাস্তার উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। ইদানিং শূলব্যথার প্রকোপ বেশী হওয়ায়, রোগমুক্তির আশায় তিনি গত কয়েক দিন পূর্বে শিব মন্দিরের চাতালে এসে 'হর্তা' দেন। শিবের কাছে অনেকেই এভাবে এসে 'হর্তা' দিয়ে রোগমুক্ত হয়েছেন।

চাতালের উপর শুয়ে পড়ে শ্যাম পণ্ডিত রাত দিন যন্ত্রণায় চীৎকার করে চলেছেন। গতকাল শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্য শ্যাম-পণ্ডিতের মোহাচ্ছন্নভাব হয়। তাঁর যেন মনে হল যোগেশ বাবুর বৌমা লীনা তাঁর যন্ত্রণা কাতর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছেন—

'মনে নেই, মাকে একদিন লাথি মেরেছিলি? যা, তাঁর পা-ধোয়া জল খেয়ে নেগে, সব ব্যথা সেরে যাবে।'

শ্যাম পণ্ডিতের মোহাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে মন্দিরের দরজার দিকে তাকালেন, দেখলেন দরজা বন্ধ। তিনি উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেন, "মা, তুই আমার সব দোষ ক্ষমা কর্ মা! তুই মানুষ নস্! তুই দেবী -মা, তুই দেবী"—বলতে বলতে তিনি পাগলের মত ছুটে চললেন বাড়ীর দিকে। বৃদ্ধা মাকে অনেক বুঝিয়ে, শেষকালে লীনার নির্দেশের কথা শুনিয়ে মায়ের পা-ধোয়া জল আদায় করে বাটিভরে তা' পান করলেন তিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! মায়ের মহিমায় তাঁর শূলব্যথা তখনই সেরে গেল। তার পরের ঘটনাই হ'ল এই।

সাত

সকালবেলা সাড়ে আটটার সময় একটা ফিটন গাড়ী এসে বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের যোগেশবাবুর বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়াতেই গাড়ীর ভেতর থেকে অমল ও মালতিদেবী নেমে পড়লেন। ভৃত্য ছুটে এসে মালপত্র নামিয়ে নিতেই মালতিদেবী হৈমবতীদেবীকে বললেন, "দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে একবার এসো ভাই।"

হৈমবতীদেবী সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

ফিটনটি আবার চলতে সুরু করল। কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল একখানি মুখ ফিটনের পেছনের কাঁচের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মালতিদেবী পেছন ফিরতেই দেখলেন অমলও সেইদিকে একভাবে চেয়ে আছে।

"নে, চ'।"

অমল চমকে সলজ্জভাবে উত্তর দিলে, "ও! হ্যাঁ, চল।"

উভয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ডান দিকে উদ্যান মধ্যাস্থিত মন্দিরের দিকে একবার তাকালেন ও ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হলেন।

মন্দিরের দ্বার খোলাই ছিল।

তাঁদের দেখে লীনা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। মালতিদেবী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাল আছ বৌমা?"

লীনা নিরুত্তরে শুধু চোখদু'টি নিমিলিত করে যেন তাঁর কথার প্রত্যুত্তর জানাল।

"মা, তুমি তাহলে ভেতরে গিয়ে সব দেখেশুনে নাওগে, আমি ততক্ষণ এইখেনে মন্দিরের দাওয়ায় একটু বসি।"

অমলের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে মালতিদেবী হৃষ্টমনে

বললেন, "সেই ভাল, তোমরা কথা কও, আমি বরঞ্চ পরে খবর নেব।" বলে মালতিদেবী অন্দরের দিকে এগোলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অমল ডাকল, "লীনা, তুমি ভাল আছতো?"

লীনার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু অমল যেন আরো কিছু চায়; তার বিরহীআত্মা এতদিনপর শুধু ওই টুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তাই, লীনার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে সে পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি আমার কোন কথার উত্তর দেবে না লীনা?" তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বেজে উঠল।

"এই কি উত্তর দেবার সময়? পরে আসিস্।" বলে লীনা উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘুরে মন্দিরের ভেতর চলে গেল।

অমল বুঝে নিল 'এই পরে আসবার' সময় কখন হবে। কিন্তুতার মনে এই কথাটাই মূর্ত হয়ে উঠল—এতদিন পর দেখা হল, শুধু মুখের একটু মিষ্ট সম্ভাষণও কি সে তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে না! স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বলে কথা! কত আশা, কত আবেগ নিয়ে সে এল! অনুরাগ বশে না হ'ক, কর্তব্য বলেও কি কোন কিছু তার জিজ্ঞাসা করার ছিল না! অথচ তার সান্নিধ্য লাভের জন্যই, তাকে দেখবার এক অত্যুগ্র মোহ নিয়েই সে এখানে ছুটে এসেছে। আজ তার যেন প্রথম মনে হল, নারী চরিত্র বড়ই দুর্গেয়।

আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর তার বুভুক্ষু আত্মা চাড়া দিয়ে উঠল। অতৃপ্ত বাসনার সহজাত দশনে, অভিমান ভরা অবশ মন নিয়ে সে উঠে এল।

অমলের কক্ষ।

দূরে কাঁসর ঘন্টা বাজছে। সরযূ ঘরের মেঝেটা জল-ন্যাকড়া দিয়ে পুঁছে দিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। এই সময় দয়াল ফুলের

সাজি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেই সশব্যাস্তে আঁৎকে উঠল—"এই সরযু, ছুঁসনে! দেখছিস না হাতে সাজি?"

সরযূ আদিখ্যেতা করে জিজ্ঞেস্ করে, "সাজিতে কি দয়ালদা?"

দয়াল ব্যাখ্যা করে, "দেখছিস্ না—এই হল বেলপাতা, আর, এইগুলো ফুল। বৌঠান পুজায় বসবেন যে!"

"আমায় এট্টা গন্ধ সাবান এনে দেবে দয়ালদা'?"

"না; এখন আর আমাকে ওইসব ভোগ-বাসনার জিনিসের কথা বলবিনি। দেখছিস না, পুজার উপ্‌করণ?"

সরযূ ব্যাঙ্গ করে, "বাস্‌রে! কি ঠাকুর মশাইটা এলোরে!"

দয়াল তাকে সতর্ক করে দেয়, "জানিস না! দাদাবাবু বলে গেছেন বৌঠানের যেন পুজার কোন বিঘ্নি না হয়? সরে যা, ছুঁয়ে ফেলবি।"

বিরক্তি প্রকাশ করে সরযূ বলে, "মর্কটটার রকম দেখো! তোকে ছুঁতে যাব কেন? রাস্তায় কত গু-মুত মাড়িয়ে এসেছিস! তফাৎ থাক্—" সরযূ বেরিয়ে যায় হন্ হন্ করে।

দয়াল তার দিকে কটাক্ষ করে বলে, "যা তুই—সংসারেই ডুবে থাক!"

দয়াল সাজিটি টেবিলের উপরে রেখে ফুলগুলি বাছতে লাগল।

ঘরে ঢুকে অমলের প্রথমেই নজর পড়ল তার বিছানার উপর। মনে হল কে যেন কিছুক্ষণ আগে অতি যত্নে তার বিছানাটি পরিস্কার করে পেতে রেখে গেছে। কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই; সুন্দর পরিপাটিভাবে সাজান, বালিশটি পর্যন্ত যেমনভাবে থাকা উচিৎ ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে। চাকরবাকরের দ্বারা যে এমনটি হতে পারে না, তা' সে সহজেই অনুমান করে নিল।

বিস্মিত নেত্রে অমল দরজার দিকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল ভৃত্য দয়াল কক্ষে প্রবেশ করছে। তাকে দেখেই অমল জিজ্ঞাসা করল, "দয়াল, বিছানা কে পেতেছেরে?"

"কেনে! দিদিমণি! তেনার কথা আর কি কব দা'বাবু! জান? তোমরা চলে যাবার পর দিদিমণি রোজ সকালে উঠে মন্দিরের ঘর মুক্ত করে তোমার বিছানা সাজিয়ে রেখে চলে যান্। এট্টা দিনও বাদ যায়নি।...জান দা'বাবু। দিদিমণির বাক্ না সরলি কি হয়, মানুষ ভাল।" দয়াল ব্যাখ্যা করে বলল।

"বলিস্ কিরে!" দিদিমণিকে তোর তাহলে খুব ভাল লেগেছে, কি বল?"

কিঞ্চিৎ আপ্যায়িত হবার ভাব প্রকাশ করে দয়াল পুনরায় বলতে সুরু করল, "আরো কি জান? রোজ সকালে পূজো সাঙ্গ হলে দিদিমণি আমায় পেসাদ খেতে দেছেন, আমি না চাইলেও।...দা'বাবু, তা' এট্টা কথা শুধোবো?"

"কি কথারে?" অমল কৌতূহল প্রকাশ করে।

আম্‌তা আম্‌তা করে নিম্নস্বরে দয়াল জিজ্ঞাসা করে, "দিদিমণি কি সন্নেসী হবেন? সারাক্ষণই তো মন্দিরে পড়ে থাকেন!"

অমল হেসে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, "মন্দিরে পড়ে থাকলেই কি আর কিছু সন্ন্যাসী হয়রে? তোর দিদিমণির খুব ধর্মে মন কিনা তাই। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তাই বুঝি?" বলে দয়াল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। মনে হল তার মন থেকে একটা মস্ত দুর্ভাবনা যেন কেটে গেল। সে আর কোন কথা না বলে টেবিলের উপর থেকে ফুলদানীটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত দু'টোর সময় কি একটা শব্দে অমলের ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে বেড সুইচ্‌টা টিপে দিল। আলোর বন্যায় ঘর ভরে উঠে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দু'টিকে ধাঁধিয়ে দিল। আলো সয়ে এলে সম্মুখে দেওয়ালের দিকে তাকাতেই তার নজর পড়ল লীনার ফটোর উপর। সে ধড়্‌মড়্ করে উঠে তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা পরে বেরিয়ে পড়ল।

একাদশীর চাঁদ।

আকাশভরা চাঁদের আলো। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের দল এক এক করে চাঁদের গা ঘেসে ভেসে চলেছে কোন্ অজানা দেশে। নীচে উদ্যানের মধ্যে মন্দিরটিকে দেখাচ্ছে যেন নীল সাগরের বুকে একটি শ্বেত-পাথরের দ্বীপের মত।

আলো আঁধারের লুকোচুরির মধ্য দিয়ে অমল এগিয়ে চলল মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের নিকটবর্তী হয়ে সে দেখল শ্বেত পাথরের বারান্দার উপর বসে আছে এক নারীমূর্তি। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তার গায়ে পড়ে তাকে মনে হচ্ছে যেন ধ্যানরতা কোন দেবীমূর্তি।

অমল বারান্দার নিকটবর্তী হতেই নারীমূর্তি বলল, "আয়, বস্ এইখেনে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অমল উঠে তার পাশে গিয়ে বসল। তার ব্যবহারে মনে হল, সে যে আসবে, তা যেন সে জানতো।

অমল পাশে বসলে লীনা একবার আকাশের দিকে চাইল ও পরক্ষণেই ভাবগদগদ কণ্ঠে পুনরায় তাকে বলল, "আকাশ ভরা এমন সুন্দর চাঁদের আলো, আর আমরা দু'জনে এখানে নিরালায় বসে। বেশ ভাল লাগছে, না রে?"

অমল চম্‌কে উঠল! লীনার মুখে আজ একি কথা! কোনদিন তো সে এমন ধরণের কথা শোনেনি। তার শরীরে কিসের যেন শিহরণ জেগে উঠল। সে বুঝতে পারল না এ কিসের ইঙ্গিত। হয়তো বা এ তার নিছক সরল কাব্য কল্পনা। কিন্তু যে অর্থ করেই লীনা কথাটা বলুক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে অমল তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসে। পরিবেশটার কথাও চিন্তা করতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক; সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকারাও এমন পরিবেশে নিজেদের হারিয়ে ফেলে কোন্ ভাবরাজ্যের মধ্যে যেখানে বাস্তব

পারিপার্শ্বিকতার কোন স্থান নেই। একদিন অমলের মনও ভরে উঠেছিল প্রেমের মাদকতায়, কল্পনা করেছিল আকাশকুসুম। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তার সে কল্পনায় ছেদ পড়েছিল, প্রেমের স্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হল। তাইবলে তার মনের প্রেম কখনো নিঃশ্বেষ হয়ে যায় নি। সে যতটুকু পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকতে চায়, হতাশায় নিঃস্ব হয়ে পড়লে তো তার আর কিছুই থাকবে না। লীনার কাছে তো সে আসতে পাচ্ছে, বসতে পাচ্ছে, নানারকম আলোচনাও করতে পাচ্ছে। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই সে তার শাশ্বত প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এ যারা পারে, মনের অনাবিল শান্তি থেকে তারা কখনো বঞ্চিত হয়না। তবুও লীনার কথা শুনে তার মনে কি এক ভাবের সঞ্চার হল যা বোঝানো যায় না।

"কি রে? কথা কইছিস না যে? তোর বুঝি এসব ভাল লাগেনা?"

"লাগে।"

ছোট্ট উত্তর। নীরব থাকলে আবার আলোচনার মোড় ঘুরে যায় ভিন্ন পথে, তাই উত্তর দিতে হল। কারণ, ক্ষণিকের হলেও সে চায় না তার এই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

লীনাও স্নিগ্ধহাস্যে তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, "আর কি ভাল লাগে তোর?"

হঠাৎ অমলের একটি কথা মনে পড়ে গেল। লীনার এই ধরণের প্রশ্নে সাহস পেয়ে সে তাকে বলল, "জান লীনা, পুরীতে একদিন রাতে ঘুমের ঘোরে তোমায় দেখেছিলুম। সুন্দর শাড়ী পরে তুমি যেন আমার পাশে এসে বসেছিলে।"

"সে তো প্রতিমা।" লীনা উত্তর দিল।

অমল বলল, "ঘুম ভাঙ্গলে অবশ্যি তাই দেখেছিলুম। কেন ওরকম দেখলুম লীনা?"

"হয়তো আমার কথা তুই ভাবতিস্। তাই প্রতিমার দেহেই তুই

আমার মুখ দেখতে পেয়েছিলি। তোর মনে যে ভাব জেগে উঠেছিল স্বপ্নে তারই ছবি তুই দেখেছিলি।"

"কিন্তু তুমি কেন সাদা থান্ পর লীনা ?"

লীনা ভেবে উত্তর দিল, "ওটা যার যার অভিরুচি। তবে সাদা জিনিস হচ্ছে স্বচ্ছতা—জ্ঞানের প্রতীক। আমার তাই সাদা জিনিস বড় ভাল লাগে।"

"তাই বুঝি সরস্বতীর সব কিছুই সাদা ?"

সরলভাবেই অমল প্রশ্নটি করে বসল। কিন্তু লীনা প্রশ্নটাকে অত সরলভাবে নিতে পারল না। কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করে এক সময় সে বলল, "সরস্বতী শব্দের অর্থ জ্যোতির্ময়। তিনি নারীও নন, পুরুষও নন—একটা দিব্য জ্যোতি মাত্র। তাঁর আসন থেকে আরম্ভ করে দেহের ভূষনাদি সব কিছুই শুভ্র। এমন কি তাঁকে সাদা ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করলে তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হন। তাঁর দেহের বর্ণ শুভ্র। সেইজন্য তাঁর নাম শুভ্রা বা শ্বেতা। তাঁর শুভ্র বসন আকাশ ও বুদ্ধির প্রতীক। সরস্বতী নামেরও একটা স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। 'সর' অর্থে গতি বা শক্তি। সুতরাং এটা বুঝতে পারা যায় তিনি অসীম জ্ঞান, বুদ্ধি ও সরলতার প্রতীক এক জ্যোতির্ময় মহাশক্তি।"

কিন্তু আমরাতো তাঁকে বিদ্যার দেবী বলেই পূজা করি ; শক্তি রূপেতো পূজা করি না ?" অমল তার সংশয় প্রকাশ করে।

লীনাও তার সংশয় দূর করবার জন্য বলে, "হ্যাঁ, যদিও নারদীয় ও সূর্য পুরাণে তাঁকে শিবের কন্যারূপে দেখান হয়েছে, অন্য পুরাণে তিনিই আবার ব্রহ্মার কন্যা। এই ব্রহ্মার মুখ থেকেই বেদের সৃষ্টি হয়। একেই বলে ব্রহ্মবাণী। আর, পরে জীবের মুখ থেকে যে বাণী নির্গত হয় তাকে বলে বাক্। সেইজন্য ব্রহ্মার কন্যা অর্থে সরস্বতীকেই বাক্‌দেবী বলে পূজা করি। আবার তিনি শক্তিরূপেও পূজা পেয়ে থাকেন। কাত্যায়ণী তন্ত্রে আছে, চণ্ডীপূজার সময়

দেবীকে তিন রূপে ধ্যান করতে হয়। প্রথমে মহাকালী, তারপর মহালক্ষ্মী ও সর্বশেষে তাঁকে সরস্বতীরূপে ধ্যান করতে হয়। তাহলেই বুঝতে পাচ্ছিস্ তিনি মহাশক্তিরই একটা অংশ? আবার সৃষ্টি কর্তৃরূপেও তাকে আমরা দেখতে পাই।

অমল বিস্ময় প্রকাশ করে। যা, কিছু সে শুনছে, সবই যেন তার কাছে আজ নূতন। তাই সে বিস্ময় দমন করে পুনরায় জানতে চায়, "সে আবার কি রকম? তিনি সৃষ্টিকর্তৃ হলেন কিরূপে?"

লীনা মধুময় কণ্ঠে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, "ব্রহ্মাণ্ডের আদি সৃষ্টি হল মহাজাগতিক শব্দ। দেবী সরস্বতীর হাতের বীণা হল সেই মহাজাগতিক সর্বপ্রকার নাদের বা শব্দের প্রতীক। দেবীর বাহন হংস হংস। 'হং' শব্দের অর্থ হল প্রশ্বাস, আর, 'স' শব্দের অর্থ নিঃশ্বাস। এই হল জীবের প্রাণবায়ু। বিকল্পে, 'হং' শব্দে পুরুষ ও 'স' শব্দে বুঝায় প্রকৃতি। হংসের দু'টি ডানা হল নিগম ও আগম। প্রাণব ও ওম্ মন্ত্রের প্রতীক হল চঞ্চু ও পদদ্বয়--শিব ও শক্তি। এই সকলের সমন্বয়কেই বলে পরমহংস। অর্থাৎ, এদের সমন্বয় করে যে জীবের কল্পনা করা যায় তিনি হলেন মহাজ্ঞানী, সকল আধ্যাত্মিক শক্তির আধার, অবিদ্যারূপী অজ্ঞানতার মহাপঙ্ক থেকে উদ্ভূত এক পরম পুরুষপ্রকৃতি। যখন এই হংস রূপকে মনের মধ্যে নিস্প্রপঞ্চ দিব্যজ্ঞানরূপে কল্পনা করা যায়, তখনই জীবের আত্মার উপলব্ধি ঘটে, অর্থাৎ, আত্মানম প্রদর্শয়েৎ। আর তখনই হংসের পক্ষীরূপ অন্তর্হিত হয়ে সো'হম্ আত্মার পরিস্ফুটন হয়।"

এই পর্যন্ত বলে লীনা অমলের দিকে অর্থপুর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে নীরব থাকতে দেখে হেসে বলল, "বুঝতে পারলিনাতো? আরো পরিস্কার করে বলছি—নারকেলের উপরকার কঠিন ও অপরিস্কার বহিরাবরণের মধ্যেই লুকান থাকে এক সুমিষ্ট কোমল শাঁস। যে নারকেল চেনেনা, সে এর রহস্যও জানেনা। আবার যে চেনে তাকে কষ্ট করে বাইরের কঠিন আবরণটাকে সরিয়ে ফেলে

তবে ওর ভেতরকার সারাংশটুকুর সন্ধান করে নিতে হয় এবং তখনই তার চরম প্রাপ্তি ঘটে। জীবাত্মাও ঠিক তাই। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই আত্মা ঘুমন্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সাধনার দ্বারা এই আত্মাকে জাগাতে হয়। জীব যখন এই পরম আত্মাকে বুঝতে বা সম্যক উপলব্ধি করতে পারে তখনই সে মোক্ষত্ব লাভ করে।"

"তাহলেতো সকলেই সাধনার দ্বারা এই পরম শক্তি লাভ করতে পারে। তবে কেন করে না?"

লীনা হেসে উত্তর দেয়, "সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা কি অতই সোজা রে? সাধনা করতে গেলে প্রথমে মন স্থির করতে হয়। মনকে বশে আনতে পারলেই বার আনা কাজ এগিয়ে যায়। মনকে বশে আনবার নানারকম প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি আছে। যেমন, প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের কতকগুলো আসন ও মুদ্রা বা সঙ্কেত আছে। প্রথমে জোড়াসন করে বসে হাত দু'টো দু'হাঁটুর উপর প্রসারিত করে মুদ্রার সাহায্যে চোখ দু'টোকে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুর প্রতি একভাবে স্থির রাখতে হয়। কিন্তু দৃষ্টি বড় চঞ্চল—কখনই স্থির থাকতে চায় না। সেইজন্য সাধক ভ্রু-যুগলের মধ্যবর্তী কোন স্থানে কপালের ঠিক মধ্যস্থলে দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করে। এই বিন্দুটির নাম প্রজ্ঞাচক্র। দৃষ্টি যখন এই প্রজ্ঞাচক্র ভেদ করতে সমর্থ হয়, তখন তার গতি হয় মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে। একেই বলে ব্রহ্মরন্ধ্র—সর্ব ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের স্থান। কিন্তু রোগীকে যখন উত্তেজক ওষুধ দেওয়া হয় আর সেই ওষুধের তেজক্রিয়তা যদি গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়, তখন চিকিৎসক সেটা বুঝতে পেরে রোগীকে ধাতে আনবার জন্য অন্য কোন বিপরীতধর্মী ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। সেই রকম, প্রাণায়াম করবার সময় মনকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য সাধক যখনই পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তখনই তার চোখ দু'টি টন্‌টন্‌ করতে থাকে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে ওঠে। যার ফলে অনেক সময় সাধকের

মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন কি এতে তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। সেইজন্য উপযুক্ত গুরুর নির্দেশ নিয়ে এই সব কাজে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পথ সোজা নয়, খুবই কঠিন। সেইজন্য দেখতে পাওয়া যায়, প্রতি তিনশো বছরে মাত্র দু'টি সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।"

"তাহলে তুমি বলছ ভগবানকে পেতে হলে মনস্থির করার একান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়াম ছাড়া আর কি কোন পথ নেই?"

"আছে। তন্ত্রমতে সাধনাই প্রকৃত পথ।"

"সে আবার কি?"

"হ্যাঁরে! সব তোকে বলব—তোকে যে আমার চাই। দেখছিস না—চারদিকে পাপ, শুধু পাপ! পাপের রাজ্যতো বেশীদিন টেঁকেনা! একদিন ভরা ডুবি হবেই। তাই, তৈরী হয়ে নে। তোকেইতো দেখাতে হবে ন্যায়ের পথ—পাপাশ্রয়ী জনগণের মুক্তির পথ! আর, তা' করতে হলে আগে তোকেই মুক্ত হতে হবে! তবেই না তুই শোনাতে পারবি মুক্তির বাণী, তবেই না লোকে তোর কথা শুনবে, তোর বাণী মাথা পেতে নেবে!···ভয় পাচ্ছিস না তো?"

লীনার কথায় অমলের সুপ্ত আত্মা যেন নড়ে উঠল। দৃঢ়স্বরে সে বলল, "না, ভয় আমি পাইনি। কিন্তু আমি কি পারব? আমি যে সংসারী—আমি যে বিয়ে করেছি!"

লীনা তার কথায় কৌতুক বোধ করতে লাগল। নিমেষে সে সরে এল অমলের আরো কাছে। কিসের এক স্পন্দন জেগে উঠল অমলের সারা দেহে। এমন স্নিগ্ধ চাঁদিনী রাত! আর, নিরালায় লোকচক্ষুর অন্তরালে মুখোমুখী বসে দুটি প্রাণী—স্বামী আর স্ত্রী! কি মধুর সম্পর্ক! কিছুক্ষণের জন্য মনে হল তাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থিব ব্যবধান যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, পারিপার্শ্বিক সব কিছুই যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। এক স্বপ্নময় রাজ্যের মোহময় অনুভূতি যেন তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু এই কল্পজাল অধিকক্ষণ স্থায়ী হবার পূর্বেই লীনার কণ্ঠস্বরে অমলের চমক ভাঙ্গল। লীনা বলল, "আমাদের বিবাহ হয়েছিল বলেই তো আজ আমরা এত ঘনিষ্ঠ, এত অনুরক্ত। বিবাহ কাকে বলে জানিস? সংসার হচ্ছে তান্ত্রিক কর্মের প্রশস্ত লীলাভূমি। এখানেই জীব একাত্ম হবার সুযোগ পায়—তাই বিবাহ। বিবাহই প্রকৃত মিলন, একের কাছে অপরের দৈহিক ও মানসিক উন্মোচন। এই উন্মোচনের ব্যাপ্তির মধ্যেই জীব ক্ষণকালের জন্য হারিয়ে ফেলে নিজের সত্ত্বাকে। এক স্বর্গীয় অনুভূতিতে একাকার হয়ে যায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। যাঁরা জ্ঞান অভিলাষী, কেন্দ্রীভুত মনকে উজ্জীবিত করে যাঁরা ভগবানের দর্শন লাভ করতে চায়, তাঁরা এই সময়ের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন। পুরুষ ও প্রকৃতির এই একাত্মবোধই শক্তিমন্ত্রের উন্মোচন ঘটায়।

অমলের মন ভ্রান্তির দোলায় দুলে ওঠে। কি যেন সে বুঝতে পেরেও বুঝতে পারেনা। তাই, সে তার সংশয় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করে, "লীনা, তুমি বলছ পুরুষ ও নারীর মিলনের ভেতর দিয়েই শক্তি সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায়? কিন্তু আমিতো জানি সাধনায় সিদ্ধি পেতে হলে আগে কাম জয় করতে হয়, প্রবৃত্তি দমন করতে হয়। তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সবই বুঝিয়ে দেব, সবই বুঝতে পারবি। তবে, ঠিক এই মুহূর্তে নয়। ওটা বোঝবার আগে তোকে আরো অনেক কিছুই জানতে হবে। একটা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে হলে যেমন অনেকগুলি পথ থাকে—কোনটা এঁকে বেঁকে ঘুরতি পথে কোনটা দুর্গম পথ পেরিয়ে; আবার কোনটা সোজাসুজিভাবে। সেই রকম, ভগবানের দেখা পেতে হলে সাধনা করতে হয় এবং এই সাধনার ধারা নানা রকম। বৈদিক মতেও সাধনা করা যায়, আবার তান্ত্রিক মতেও সাধনা করা যায়। বৈদিক মন্ত্র ও তান্ত্রিক মন্ত্রেও পার্থক্য আছে। তার আগে, মন্ত্র জিনিসটা কি তাই জানতে হবে—"

বলে লীনা একবার অমলের দিকে তাকাল ও তাকে শোনবার জন্য খুব উৎসুক দেখে পুনরায় বলতে লাগল, "মন্ত্র –অর্থাৎ মনকে যে ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। শব্দ হল অক্ষরে সমষ্টি, যার একটি নির্দিষ্ট অর্থ হয়। আবার, মন্ত্রই হল আলোর স্ফু ., যা মনকে দোলা দেয়। সুতরাং কতকগুলি শব্দের সমষ্টিকেই মন্ত্র বলে না। সাধক যখন কোন নির্দিষ্ট ছন্দে, নির্দিষ্ট ঝঙ্কারে বা নাদে মনে প্রাণে কোন কিছু উচ্চারণ করে, তাকেই বলে মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রেরই একজন 'ইষ্টদেবতা' থাকে যাঁকে উদ্দেশ্য করে সেই মন্ত্র গঠিত হয়। এই ইষ্টদেবতাকে মূর্তি পরিগ্রহ করালে তাকে বলে 'যন্ত্র'। মন্ত্রকে অনুবাদ করে অপর কোন ভাষায় উচ্চারণ করলে আর তা' মন্ত্র থাকেনা।"

"কেন?"

"কারণ, সেই নির্দিষ্ট ঝঙ্কার ও ছন্দের সেই মোহিনী শক্তি অপর ভাষায় অনুবাদ করা বাক্যের মধ্যে অনুভব করা যায় না। আর, সাধক তাই মন প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকতে পারেনা। সাধক, মন্ত্র এবং সাধনা—এই তিনের মিলনই হল মন্ত্রসিদ্ধির সোপান। মন্ত্রের বাণী হচ্ছে রূপ, ঝঙ্কার ও ছন্দ হচ্ছে রস ও সাধনা হচ্ছে প্রাণ। প্রথমেই বলেছি, প্রত্যেক মন্ত্রেরই একজন ইষ্টদেবতা থাকে। সাধক যখন তার একাত্ম সাধনার দ্বারা মন্ত্রকে জাগাতে সমর্থ হয় অর্থাৎ, মন্ত্রের দাহিকাশক্তি যখন সাধকের সকল ইন্দ্রিয়কে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই সাধক তার ইষ্টদেবতার দর্শন পায়। একেই বলে মন্ত্র চৈতন্য। সুতরাং মন্ত্রই হল দেবতা—চিৎশক্তি। আর এই মন্ত্রচেতনাকেই বলে মন্ত্রসিদ্ধি।"

লীনা এই সময় একবার অমলের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কথা সব বুঝতে পারছিস তো? কোন সংশয় থাকলে ভাল করে বুঝে নিবি।"

"না, সব বুঝতে পারছি।" বলে ক্ষণকাল কি চিন্তা করে সে

পুনরায় বললো, "হ্যাঁ, তুমি কি যেন বলছিলে? বৈদিক মন্ত্রে ও তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রভেদের কথা? সেটা কি রকম?"

লীনা মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সে কথাও বলছি। বৈদিক শাস্ত্র হল একটা মহীরুহ এবং তন্ত্রশাস্ত্র হল সেই মহীরুহের প্রত্যক্ষ ফল। বৈদিক শাস্ত্রমতে দেবপূজায় ও বেদাধ্যায়নে নারী ও শূদ্রের অধিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র মতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল জাতি এমন কি নীচ জাতীয় চণ্ডালেরও সে অধিকার আছে। শরীর রক্ষার্থে যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন হয়, সেইরকম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে মানসিক ব্যায়ামের দরকার। এই মানসিক ব্যায়ামই হল সাধনা, পূজাপদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ। বেদান্ত মতে দেখতে পাই একাত্মভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে ঈশ্বরকে ডাকাই রীতি। ব্রহ্মাই বেদান্ত মতে একমাত্র ঈশ্বর। বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে পাণ্ডিত্য বাড়ে। কিন্তু তান্ত্রিকমতে সাধন ক্রিয়ার দ্বারা পুজায় মনের অভিব্যক্তি পুর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই রীতি বেদান্তের ন্যায় পুঁথিগত নয়—ব্যবহারিক। কাজেই এতে কাজ তরান্বিত ও ফলপ্রসু হয়।'

"তান্ত্রিক মতেতো গায়ে ভস্ম মাখতে হয়?"

"সকলেই কি ভস্ম মাখে? তা' মাখে না। শুধু গায়ে ভস্ম মাখলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাহলেতো গাঁয়ের সব কুকুরই ব্রহ্মজ্ঞানী! ছাই দেখলেই তো তারা তার উপর শুয়ে পড়ে। এই জ্ঞান পেতে হলে চাই ভগবানে মনঃসংযোগ, পূজা-পদ্ধতি। আবার এই পূজারও কতকগুলি ধাপ আছে। পূজা মানেই হ'ল এর মাধ্যমে পূজারী ও দেবতার মিলন প্রচেষ্টা। যোগদ্বারা পুজারী আত্মা ও পরমাত্মার উপলব্ধি ঘটায়। ধ্যান হল, একাত্মভাবে ইষ্টদেবতার নামে আত্মনিবেশ করা। সমাধি দ্বারা সাধকের মন সম্পূর্ণভাবে ইষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলিত হয়। হোমে সাধক নিজের বৃত্তি ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে।

যাঁরা বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে, তারা সংসারকে দুঃখময় বলে

মনে করে। তারা মনে করে সাধনায় ভগবানকে লাভ করতে হলে সংসারে জড়িত থেকে তা' কখনই সম্ভব হয় না—মায়া, মোহ, মমতা সকল বন্ধন ছিন্ন করে সংসার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু শক্তি বা তান্ত্রিক মতে যারা দীক্ষিত, তারা এই সংসারে থেকেই শক্তির আরাধনাকে প্রশস্ত পথ বলে মনে করে। সংসার ও নরক—এ দু'টো তাদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কিন্তু বৈদিক মতে সংসারের দুঃখকষ্ট ভোগকেই তারা নরকযন্ত্রণা বলে মনে করে। সাধনার পথে তারা নিরুপোদ্রব পথ ধরেই অগ্রসর হয়, সেই জন্যই সিদ্ধিও তাদের অযথা বিলম্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তান্ত্রিক মতে সৎগুরুর নির্দেশে কঠিন অথচ সোজা পথটাকেই তারা বেছে নেয়; আরো বুঝিয়ে বলছি—কোন একটা জায়গায় যেতে হয়তো দুটো পথ আছে—একটা সরল সুন্দর পথ, কিন্তু সেই পথ ধরে সব রকম অসুবিধা কাটিয়ে ঘুরতি পথে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যায়। এতে সময় বেশী নেয়। আর একটি পথে সোজাসুজি গিয়ে নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছানো যায়। কিন্তু এ পথে আছে কাঁটার ঝোপঝাড়, আছে আরো নানারকম অসুবিধা অর্থাৎ, সংসারের নানা রকম বাধাবিপত্তি। তান্ত্রিক মতে এই সোজা ও কণ্টকময় পথটাই প্রশস্ত। এতে সময়ও কম লাগে। সেই জন্যই সিদ্ধিও তাদের তরান্বিত হয়। কুব্জিকা তন্ত্রে আছে—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদিক, শ্রুতি ও পৌরাণিক মতেই ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হতো। কিন্তু কলিযুগে তান্ত্রিক মতই প্রশস্ততর পথ। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথাও মনে পড়ে গেল। সেটাও তোর জেনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।"

লীনার কথায় অমল তৎপর হয়, "আবার কি?"

"আমি বলছি গায়ত্রী মন্ত্রের কথা।" লীনা উত্তর দেয়।

"হ্যাঁ, ওটাও জানবার ইচ্ছা আমার কম নয়। তুমি বল। গায়ত্রীর উপদেশ শুনেছি খুব কার্যকরী।" অমল বলল।

লীনা অমলের অজ্ঞতা দূর করবার জন্য বলে, "গায়ত্রী শুধু উপদেশাবলী নয়রে, তার চেয়েও অন্য কিছু। উপদেশ পৃথিবীর মানুষকে শুধু সৎশিক্ষা দেয় এবং তা' গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে শ্রোতার মনোবিকারের উপর। মানুষের জীবনে যেমন উত্থান, পতন, জন্ম, মৃত্যু আছে, উপদেশের বাণীগুলিরও সেইরূপ ক্ষেত্রকাল আছে, ভ্রান্তি বিস্মৃতি আছে। কিন্তু মন্ত্র জাগিয়ে তোলে মনে এক স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা—মহাশক্তির বিকাশ। মন্ত্রের বিনাশ নেই। পূর্বেই বলেছি, মন্ত্র হল ভগবান—শাশ্বত, সদা জাগ্রত ও অবিনশ্বর। কাজেই গায়ত্রীমন্ত্র শুধুমাত্র শব্দ যোজনা নয়। এই মন্ত্র গভীর মনোনিবেশ সহকারে জপ করতে হয়। মূলাধার থেকে ষট্‌চক্র ভেদ করে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দোলায়িত করে এই মন্ত্র সাধককে উজ্জীবিত করে তোলে। বুঝেছিস্?"

"হ্যাঁ, বলে যাও।"

লীনা বলে, "কোন কিছু ধর্মানুষ্ঠান বা ভগবৎচিন্তায় আত্মনিয়োগ করবার পূর্বে সাধকের আত্মাকে শুদ্ধি করে নিতে হয়। আত্মশুদ্ধি না হলে কোন কাজই সফল হয় না। গায়ত্রীমন্ত্র জপের দ্বারাই এই আত্মশুদ্ধি ঘটে। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে পাঁচটি দেবতার নামোল্লেখ আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শক্তি ও সূর্য। কিন্তু তান্ত্রিক মতে নারদের অভিশাপে ব্রহ্মার নাম বাদ দিয়ে তার বদলে বিষ্ণুর অবতার গণেশের পূজার বিধি আছে। শূদ্র ছাড়া অপর তিন বর্ণকেই প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করাই বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্রে অনাস্থা প্রকাশ করে সে অতি নীচ জাতীর তুল্য গণ্য হয়, এমনকি তার হাতে জলগ্রহণ করাও পাপ।

গায়ত্রী মন্ত্র দিনে তিনবার জপ করতে হয়--সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা। দেবী গায়ত্রীর অপর নাম সন্ধ্যা। সেইজন্য তিনবেলা গায়ত্রী জপকে বলে ত্রি-সন্ধ্যা জপ। যজুর্বেদে সন্ধ্যা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য আছে তাতে তিনি বলেছেন, সকালে সন্ধ্যাজপে দেবী

গায়ত্রীর, দুপুরে সাবিত্রীর ও সন্ধ্যায় সরস্বতীর জপ করতে হয়। 'গায়ৎ' শব্দের অর্থ—যা গাওয়া হয় এবং 'ত্রী' শব্দের অর্থ দেবী। সুতরাং একত্রে 'গায়ত্রী' শব্দের অর্থ হল—দেবীবন্দনা। সব পরিষ্কার ?"

"না, একটু বোঝবার বাকী আছে।" অমল বলল।

"আবার কি ?"

"ঐ যে বললে, তন্ত্রমতেই ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ কলিযুগে প্রশস্ত ? ঐটে আরো একটু ভাল করে বলো।"

উৎফুল্ল মনে লীনা উত্তর দেয়, "বেশ, তোর যখন ঐ দিকেই আগ্রহ তবে ভাল করে শোন্। মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে, যারা বদ্ধিমান তারাই তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশ মতে দেবতার পূজা করে থাকে। কলিযুগে এইটেই একমাত্র পথ। এই পথকে বলে আগম অর্থাৎ তন্ত্র নির্দেশিত পথ।

তন্ত্রশাস্ত্রের দু'টি শাখা আছে—আগম ও নিগম। শিবের মুখ থেকে যে শাস্ত্র নির্গত হয়েছিল, তাই হল আগম। এখানে শিব গুরু ও পার্বতী হল শ্রোতা। আর, পার্বতীর মুখনিঃসৃত বাণীই হল নিগম। এখানে পার্বতী গুরু আর শিব শ্রোতা। আগম আবার দু'ভাগে বিভক্ত—সদাগম ও অসদাগম।

বৈদিক মন্ত্র সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগেই ফল প্রসব করতো। কিন্তু আগমের নির্দেশগুলি অধিকতর ফল প্রসবী এবং এর মন্ত্রও খুবই সিদ্ধ। এতে বলে, আত্মসুদ্ধির পক্ষে গায়ত্রী জপই প্রধান ও প্রথম সোপান। তারপরই ইষ্টদেবতার পূজা করতে হয়। গায়ত্রী পূজায়, বৈদিক মতে, পাঁচটি দেবতার পূজা পৃথকভাবে করতে হয়। কারণ, তা' নাহলে, যাঁর পূজা করা হবেনা, সেই দেবতাই ক্রোধান্বিত হবেন। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র বলে, পূজা অর্থই হল একাত্মভাবে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র সাধনা। কিন্তু মন হল একটা। একটা মন পাঁচজন দেবতাকে কখনই সমান ভক্তিতে পূজা করতে পারেনা, আর তাতে সহসা মনস্থিরও হয় না। কাজেই

ফল পেতে দেরী হয়। কিন্তু আগম বা তন্ত্রমতে ঐ পাঁচজনের যে কোন এক দেবতাকে 'ইষ্টদেবতা' রূপে মধ্যে কল্পনা করে,চারপাশে অপর চার দেবতাকে রেখে ধ্যান করতে হয়। এতে মনস্থিরও হয় খুব আয়াসে, আর এতে পাঁচ দেবতাই সমানভাবে সন্তুষ্ট হন।"

হঠাৎ অমল তাকে বাধা দিল, "ও। তাহলে তো ঠিক হয়েছে! আমারও একজন 'ইষ্টদেবতা' আছে। কখনো কখনো রাস্তায় যেতে যেতে কোন মন্দির দেখেই আমার ইষ্টদেবতার নামে প্রণাম করেই দেখি, হয় সেটা অন্য কোন দেবতার মন্দির, নয়তো কোন পুরুষ দেবতার মন্দির! আমার উষ্টদেবতা কিন্তু নারী। তাই প্রায়ই আমি ভাবি, হয়তো এতে আমার পাপ হচ্ছে!"

খুসী হয়ে লীনা উত্তর দিল, "তাহলে তো অনেকটা এগিয়েই আছিস তুই! তবে শোন্ বলিঃ রামভক্ত হনুমান বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখেন পদ্মাসনে নারায়ণ বসে আছেন, পাশেই তাঁর লক্ষ্মী। দেব হনুমান তখন ভক্তি গদগদভাবে চোখ বুজেই বলে উঠল, 'জয় রাম'! কিন্তু কি আশ্চর্য! চোখ খুলেই হনুমান দেখতে পেল মুহূর্ত পূর্বে যেখানে বসে ছিলেন নারায়ণ আর লক্ষ্মী, এখন সেখানে বসে আছেন রাম ও সীতা। তাই বলছি, ভক্তিভাবে নিজের ইষ্টদেবতাকে ডাকলেই সব দেবতা সন্তুষ্ট হন। একি! ফালি চাঁদটা যে একেবারে ঝিমিয়ে পূব আকাশে ঢলে পড়েছে—ঐ দেখ্। আর নয়,—আবার পরে হবে!" বলেই লীনা উঠে দাঁড়াল।

অমলও এতক্ষণ বুঝতেই পারেনি যে রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু তবু তার মনে হল, আরো খানিকক্ষণ থাকলেই যেন ভাল হতো। কিন্তু সে বুঝতে পারে না এই মোহটা কিসের! লীনার মুখনির্গত জ্ঞানগর্ভ পরিবেশের প্রতি, না, তার সান্নিধ্যলাভের আকুল প্রেরণার প্রতি। যার জন্যই হ'ক, আপাততঃ তাকে উঠতেই হ'ল। আর, এর জন্য দায়ী কে? সে একবার করুণ দৃষ্টিতে চাপা বিক্ষোভে নিস্তেজ চাঁদটার দিকে কটাক্ষ করল।

অমল ধীরে ধীরে উঠে মন্থর গতিতে অন্দরের দিকে অগ্রসর হল। লীনা মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একভাবে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্যান্য দিন কিন্তু লীনা উঠেই মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তার এই ব্যতিক্রম অমলের দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু নারীর কাছে পুরুষের মানসিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠবে ভেবে সে ক্ষণিকের জন্যও পেছনে তাকাল না।

সদর দরজা পেরিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকেই অমল চমকে উঠল। কারা যেন দরজার ঠিক পাশেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অমল থমকে দাঁড়াল।

"খোকা ?"

"হ্যাঁ মা ! তুমি এখানে, এই সময়ে ?" অমল প্রশ্ন করল।

"বৌমা তোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিল ?"

"হ্যাঁ মা।"

"প্রায়ই তোর সঙ্গে এই রকম কথা হয় বুঝি।"

অমল চুপ করে রইল। মায়ের এই কথায় সে কি উত্তর দেবে ভেবেই পেলনা।

"কই, তুই তো আমায় কোনদিন বলিস নি ?"

"তোমায় বলবার মত কোন কথাতো এখনো হয়নি মা !" অমলের কণ্ঠস্বর সঙ্কোচ মাখান।

"হ্যাঁ দাদাবাবু, দিদিমণি বেশ স্পষ্ট করে কথা কইলেন বুঝি ?"

"কেরে ? দয়াল বুঝি ?"

"হ্যাঁ দাদাবাবু ! দিদিমণিকে এবার ঘরে নিয়ে এসোনা গো ?" দয়াল আব্দার করে।

"সত্যি খোকা ! বৌমাকে এবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের ঘর সংসার বুঝে নিতে বল্‌না। বলেছিস্ কিছু ?" মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করেন।

অমল মুহূর্তকাল নীরব থেকে উত্তর দিল, "মা, তুমি জাননা

তোমার ঘরে কে এসেছে! ও তোমার সাধারণ মেয়ে নয়—সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মহামায়া!"

"কি বললে দাদাবাবু!" দয়াল বিস্ময় প্রকাশ করে।

মালতিদেবী প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার জন্য ছেলেকে কোমলস্বরে বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুয়ে পড়গে। কাল সকালে সব শুনবো।—নে, চল্‌নারে বেটা—" মালতিদেবী অযথাই দয়ালকে তাড়না করে। অমলের মুখে কথাটা শুনে তারও মনে ভাব এসেছে। কিসের .ভাব তা সেই বলতে পারে। সবাই ভাবে পাগল।

দয়াল মায়ের তাগাদা খেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে চলল। তার ভয়ানক আকাঙ্খা হয়েছিল জানবার জন্য দাদাবাবু কথাটা বলল কি। যাক্, পরে জেনে নিতে হবে মনে করেই সে এখনকার মত মায়ের অসময়োচিত তাগিদটার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকল।

আট

হৈমবতীদেবী আরো একটু জোর দিয়ে বললেন, "ঐ! সই আমাকে বললে, প্রায়ই নাকি রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে তখন বৌটার সঙ্গে অমলের দেখা হয় এবং দু'জনায় সারারাত ধরে গল্প করে। সে কত ঢং, হাসিঠাট্টা!" হৈমবতীদেবীর ঘরে আলোচনা চলছিল—মা ও মেয়েতে। প্রতিমা সংযত, কিন্তু তার মাকে মনে হল বেশ একটু উত্তেজিত।

"তবে যে এতদিন জানতাম বৌদি কথা কইতে পারে না, বোবা?" প্রতিমা জানতে চায়।

একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে হৈমবতীদেবী বললেন, "ও সব ভিরকুট্টি। রাখতো! নইলে জলজ্যান্ত স্বামী বেঁচে থাকতে থান্ পরে বসে থাকে! হুঁ!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রতিমা আরো জানতে চাইল, "আচ্ছা, অমলদা' নিজেই যান্ বৌদির কাছে, না, বৌদিই তাকে ডেকে নিয়ে যান্?"

"অতসব কি করে জানবো! একটু পরেই তো আসছে। এলেই জিজ্ঞাসা করিস।"

হৈমবতীদেবী আজ দুপুরবেলা তাঁর সই মালতিদেবীর গৃহে গিয়েছিলেন। পুরী থেকে ফেরবার পর আজ দু'দিন হল সইয়ের কোন খবর না পেয়ে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন দেখা করতে। সেখান থেকেই অমলের আসবার খবরটা নিয়ে এসেছেন তিনি।

"অমলদার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, না, মাসিমাই বললেন ও কথা?"

"নারে, না,। অমল নিজেই বললে সন্ধ্যার আগেই সে আসবে। আমায় কথা দিয়েছে।"

একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে প্রতিমা বলল,

"তুমি নিজে কেন বলতে গেলে? ও কথা না তোলাই ভাল ছিল। তারও তো একটা কর্তব্য ছিল আমাদের খবরটা নেওয়া।"

প্রতিমা কথা কয়টি বললে বটে, কিন্তু অমল তার কথা উত্থাপন না করার দরুণ যদি হৈমবতীদেবী বিনা প্রশ্নে সেখান থেকে ফিরে আসতেন, সেটাই কি তখন প্রতিমার মনঃপূত হত? আসলে ওটা প্রতিমার মনের কথা নয়; মায়ের কাছে ও কথা ফেলার অর্থ ই হল নিজের মনের দূর্বলতাকে একটা মিথ্যার আবরণে ঢেকে দেবার প্রয়াস। কিন্তু এ প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসু হয় না, বরঞ্চ, মিথ্যার পরমায়ুই এতে বেড়ে যায়।

"সে কিবে! আমি যেতেই দেখতে পেয়ে তোর সম্বন্ধে কত কথা জিজ্ঞাসা করলে। তোদের সেই ছোটবেলা থেকেই তো ওবাড়ী এ-বাড়ী জানা পরিচয় ছিল। ইদানীং সব বড় হয়ে তো আসা যাওয়াটা একটু কমে গেছে। দেখিস, ও ঠিক আসবে। এলে আবার ঝগড়া করিসনে যেন।" হৈমবতীদেবীও কম্‌তি যান না।

"আমার বয়ে গেছে!" প্রতিমা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বস্তুত, মালতিদেবী ও হৈমবতীদেবীর মধ্যে পুরী যাবার পূর্বে যে গোপন পরামর্শ হয়েছিল, সে কথা মালতিদেবীও যেমন ছেলেকে জানতে দেননি হৈমবতীদেবীও সে কথা প্রতিমার কাছে গোপন রেখেছিলেন। তারা গোপন রাখলেও যে এদের কাছে গোপন ছিল, এমন তো নাও হতে পারে! কাজেই অমল ও প্রতিমার মধ্যে এই যে নূতন করে ঘনিষ্টতা গড়ে উঠেছে, এটা ভাবজগতের কোন্ পর্যায়ে পড়ে তা বুঝে ওঠা খুবই কঠিন। একমাত্র মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারাই এ শুধু উপলব্ধি করা সম্ভব।

প্রতিমার অভিমান ভরা অভিব্যক্তিতে হৈমবতীর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন না এই যাত্রার শেষ কোথায়। তাই তিনি সস্নেহে মেয়েকে বললেন, "তা বাছা, আমি ওদিকটা দেখিগে। দেখিস, সে যেন এসে আবার ফিরে না যায়। তার কিন্তু আসবার

সময় হয়ে গেছে।" মায়ের এ কথায় ওকি এটা কিসের ইঙ্গিত তা প্রতিমার কাছে গোপন থাকছে? তাই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দেবার জন্যই প্রতিমা কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে মন্তব্য করে, "তুমি যাওতো! তার আর খেয়ে কাজ নেই!

প্রতিমার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ এল। হৈমবতী চকিতে উঠে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিলেন। অমল ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "মাসিমা—"

"এস বাবা!" বলে তিনি প্রতিমার ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন; অমল তাঁর অনুসরণ করল।

"এই দেখ্ পতু, কে এসেছে। এসনা বাবা!" বলে তিনি তাকে নিয়ে প্রতিমার ঘরে ঢুকলেন। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনেই প্রতিমা আগে ভাগে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছিল।

অমলকে দেখে প্রতিমা উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু কোন কথা কইল না।

অমল হেসে অবস্থাটা সেরে নিল, "খুব রাগ করেছো তো? দাঁড়াও সব ঠিক করে দিচ্ছি।

"তাহলে তোমরা কথা কও, সেই ফাঁকে আমি জলখাবারটা তৈরী করে ফেলি।" বলে তিনি বেরিয়ে যেতে উদ্যতা হলেন।

"সেকি মাসিমা! ওসব পরে হবে'খন। ততক্ষণ একটু গল্প করি।"

"আমিই বরঞ্চ চা-টা করে আনছি।" বলে প্রতিমা নড়ে উঠতেই হৈমবতী হেসে বললেন, "থাক্ হয়েছে, তোকে আর যেতে হবে না। বস বাবা—" বলে তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেলেন।

অমল প্রতিমার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও পরে হেসে ফেলল।

কৃত্রিম ক্রোধে প্রতিমা জিজ্ঞেস করে, "হাসছেন যে বড়?

অমলও কাটান দেয়, "হাসি এলো কেন তবে?"

"মানে ?"

"মানে – মানে, রাগলে মেয়েদের খুব সুন্দর দেখায়।"

"যান্ হয়েছে !"

উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে তাকায়। পরে উভয়েই হেসে ওঠে।

অমল বলল, "সত্যি আমার আগেই আসা উচিত ছিল।"

"তবে এলেন না কেন ?"

"একটা অজুহাতের অপেক্ষায় ছিলুম।"

"কি অজুহাত পেলেন শেষকালে ?"

"মাসিমা আজ গিয়েছিলেন যে। অজুহাতও জুটে গেল।" বলে অমল প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল।

প্রতিমা সে হাসিতে যোগ না দিয়ে অবস্থাটা আয়ত্তে এনে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে উত্তর দিল, "বৌদি যে বড় আসতে দিলেন ?"

অমল কথাটা শুনে চুপ করে গেল। কি উত্তর দেবে সহসা ঠিক করতে পারল না। বস্তুত, তার এবং লীনার সম্বন্ধে সব কিছু জেনে শুনেও হয়তো প্রতিমার এই রকম একটা প্রশ্ন করা যে মোটেই শোভনীয় হয়নি অমল বোধ হয় সেই কথাটাই ভেবে দেখবার সময় নিচ্ছে। মেয়েদের একটা দুর্বলতা আছে, যদি তাদের পথে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, তা,সে যতই স্বীকার গ্রাহ্য হ'কনা কেন, কথার ফাঁকে সুযোগ পেলেই তার সম্বন্ধে একটা টিপ্পনী কাটা, যার ফলে হয়তো একটা সুন্দর পরিবেশ সহজেই ঘোলাটে রূপ ধারণ করতে পারে। তবে প্রতিমা হয়তো সরল রস সৃষ্টির জন্যই ওকথা জিজ্ঞাসা করেছে, আর, অমলও বোধহয় প্রতিমার নারীসুলভ বিবেচনার দৈন্যতা দেখে বিষয়টার গতি স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে।

"বসুন, দাঁড়িয়ে কি কথা কওয়া যায় ? বৌদির নিশ্চয়ই বারণ নেই এতে ?"

অমল নিকটস্থ চেয়ারে বসে পরে গম্ভীরভাবে প্রতিমার কথার উত্তর দিল, "তোমার বৌদিকে কখনো দেখেছ ?"

"না দেখালে আর কি করে দেখি বলুন।"

"দেখাব ; সুযোগ হলেই তোমায় দেখাব এবং দেখে বুঝবে তিনি এ জগতের জীব নন্ !···যাক, তুমিও বস।"

মুচ্ কি হেসে প্রতিমা অপর একটি চেয়ারে বসে পড়ল।

অমল বলল, "পুরী কেমন লাগল তোমার ?"

"ভাল না।"

"কেন ?"

"নিশ্চয়ই সে রকম কোন আকর্ষণীয় জিনিস নেই সেখানে, যা মানুষের মনকে ধরে রাখতে পারে বেশ কিছুদিন।" প্রতিমা হাসতে থাকে।

"সে কি !"

"নইলে পালিয়ে এলেন কেন ?"

কিছু একটা অনুমান করেই যেন অমল হেসে উত্তর দেয়, 'ও, এই কথা। আচ্ছা এবার যদি কোথাও যাই, বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাবে। কেমন ? তাইতো ?"

"আপনি বড় বোকা।"

"কেন বলত ?"

"আপনি কিছু বোঝেন না !"

প্রতিমার কথার তাৎপর্য অনুধাবন করা অমলের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ইঙ্গিত বড়ই সূক্ষ্ম।

হঠাৎ কি একটা ভেবে প্রতিমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এক ঝলক সে অমলের দিকে তাকিয়ে থেকে দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে ঝটিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বলে গেল, "দাঁড়ান, এখুনি আসছি।"

কি হল ! প্রতিমা উঠে গেল কেন ! প্রতিমার সব কিছুই আজ যেন হেঁয়ালীপূর্ণ। যেভাবে উঠে গেল, হয় তো কিছু উদ্দেশ্য আছে।

একা একা বসেও থাকা যায় না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। টেবিলের উপর একখানা বই রয়েছে ; সেইখানাই টেনে নিয়ে

খুলে বসল অমল। 'পরিণীতা'—শরৎবাবুর লেখা। বইখানা তার আগেই পড়া আছে। কিন্তু এ বই কে পড়ে! প্রতিমা কি!

সময় কাটাবার জন্য বইখানা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দু'একপাতা উল্টাতেই প্রতিমা এসে হাজির হল। কিন্তু এ আবার কি! একখানা ঝলমলে সিল্কের শাড়ী পরে এসে সে অমলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

অমল কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তবু প্রতিমা কিছু বলেনা, কেবল হাসে।

"হঠাৎ শাড়ী পাল্টে এলে?"

"কেমন দেখাচ্ছে বলুন?"

"মেয়েদের সাজলে গুজলে কি খারাপ দেখায়? ভালই লাগে। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ মতলব হল কেন?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"পুরীতে একদিন আপনি বলেছিলেন শাড়ী পরলে আপনার ভাল লাগে।" প্রতিমা উত্তর দেয়।

"তাই বুঝি তুমি শাড়ী পাল্টে এলে? সত্যি প্রতিমা, প্রত্যেক মানুষেরই একটা মানসিক ক্ষুধা থাকে। কিন্তু—"

—"সব ক্ষেত্রেই ভগবান তা' মেটাবার সুযোগ দেন না।" মাঝপথে প্রতিমা শেষটুকু বলে দিল।

অমলের মন উদাস হয়ে যায়। হয়তো প্রতিমা সরলভাবেই কথাটি বলেছে। কিন্তু সেতো জানে, তার জীবনে এই কথাটাই কঠিন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। তার এইভেবে সঙ্কোচ বোধহল, প্রতিমাও কি তবে তার মনের দৈন্যতা ধরে ফেলেছে! তাই বুঝি সে সেটুকু পুরণ করবার জন্যই এইভাবে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

অমলকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রতিমা বলল, "কি, কথা বলছেন না যে? রাগ করলেন?"

"না না না। রাগ করব কেন। তুমি তো সত্যি কথাই বলেছ

প্রতিমা। সাময়িক অভাব একটা আমার সত্যি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চলার পথে প্রয়োজনানুগ বিকল্প ভাবধারায় সে অভাব আমি পূরণ করে নিয়েছি। এখন আর কোন অসুবিধা হয়না।··তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন প্রতিমা, বস।"

প্রতিমা বসল। তার যেন বেশ মনে হল, তার ব্যবহারে অমল মনে ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু সে তো তাকে আঘাত দেবার জন্য কিছু করেনি! তবে কেন তিনি ব্যথা পাবেন! তাই সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? উত্তর দেবেন?"

"নিশ্চয়ই দেবো! তোমার কথার উত্তর দেবনা? তুমি কেন অমন সঙ্কুচিত হচ্ছ? সত্যি আমি কিছু মনে করিনি। সুন্দর শাড়ী পরে সামনে এলে সত্যি আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু বাহ্যিক অলঙ্কারের সত্যিই কি তোমার কোন প্রয়োজন হয় প্রতিমা?"

"আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।"

"বড় বোকা তুমি।"

"কেন বলুন তো?"

"তুমি কিচ্ছু বোঝ না।"

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময়ে কি মনে করে উভয়েই হেসে ওঠে।

অবস্থাটা একটু আয়ত্বে এলে প্রতিমা হঠাৎ প্রশ্ন করে, "বৌদির কাছে একদিন নিয়ে যাবেন অমলদা'?"

"নিশ্চয়ই যাবো। তবে, নিয়ে যাবার আগে তার একটা অনুমতি নিতে হবে।"

"কেন?"

"তোমার বৌদি তো' কারো সঙ্গে কথাই কয় না। হয়তো তুমি গেলে, তোমাকে চিনতেই পারল না, আর তুমিও মনে ব্যথা পাবে। তার চেয়ে বরং—"

—"কিন্তু তিনি যদি আপত্তি করেন?"

"না, তা' সে করবে না।"

"কি করে জানলেন ?" প্রতিমা তার সন্দেহ প্রকাশ করে।

অমল হেসে উত্তর দেয়, "আমি তা' জানি। তোমাদের সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা আছে তা' সে জানে প্রতিমা।"

"ঐটেইতো বড় প্রতিবন্ধক।"

"কেন ?"

"মেয়েদের আপনি জানেন না! এক জায়গায় তারা ভয়ানক স্বার্থপর—কোন মধ্যপন্থার বালাই তাদের নেই।"

বলেই প্রতিমার মনে হল ভাবপ্রবণতাবশতঃ সে অনেকটা বলে ফেলেছে। সামনাসামনি এতখানি বলা অন্ততঃ মেয়েদের দিক থেকে অশোভন বটে। হয় তো অমলদা' কি ভাবছে! লজ্জায় তার গাল দু'টো লাল হয়ে উঠল।

এই সময় হৈমবতীদেবী কক্ষে প্রবিষ্ট হলেন। অন্ততঃ এই জটিল পরিস্থিতি থেকে তারা উভয়েই এই সময় রক্ষা পেয়ে গেল।

হৈমবতীর হাতে এক প্লেট লুচি ও তরকারী। তিনি নিকটস্থ ছোট্ট টেবিলের উপর প্লেট টি রেখে সামনে টেনে দিয়ে বললেন, "যা তো, জলের গ্লাসটা রেখে এসেছি নিয়ে আয়! নাও বাবা ঘুরে বস।"

"তাতো বুঝলুম। কিন্তু এত খাবার একা খাব কি করে ?"

"বেশ, দু'জনেই বসে বসে খাও, আমি চা টা নিয়ে আসছি।" বলে হৈমবতীদেবী বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিমা জলের গ্লাস নিয়ে ফিরে এসে বলল, "এই নিন, হাতটা ধুয়ে নিন্।" সে গ্লাসটি এগিয়ে দিল।

"তুমিও ধুয়ে নাও।"

"কেন ?"

"মায়ের আদেশ।"

"আহা, তাই আবার হয় নাকি ?"

অমল প্রতিবাদ করে, "কেন ? হবেনা কেন ?"

দুষ্টুমিভরা চোখে প্রতিমা বলে, "সে তো পরে।" বলেই সলজ্জে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হৈমবতী চা নিয়ে এলেন।

"একি বাবা, বসে আছ ? খেয়ে নাও। হৈমবতী বললেন।

"এই নিচ্ছি।" বলে একবার দরজার দিকে তাকিয়ে অমল খেতে সুরু করল।

অমলের জলযোগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা ঘরে ঢুকে খালি প্লেট্‌টার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "একি ! সব খেয়ে নিয়েছেন ? আমার জন্য একটুও রাখেননি ? বারে !"

"ওমা ! কি দুষ্টু দেখ !" মেয়ের দিকে কটাক্ষ করে মা হেসে বললেন।

"কেন ? আমায় যে খেতে বললেন। আমি কি নিজে চেয়েছিলুম ?" প্রতিমা মায়ের কথার প্রতিবাদ করে।

"তোরা তবে ঝগড়া কর্‌।" বলে হৈমবতী খাবারের প্লেট্‌ ও জলের গ্লাসটি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অমল চায়ের কাপটি তুলে নিয়ে প্রতিমার দিকে একটু চেয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

অভিমানের সুরে প্রতিমা বলল, "যতক্ষণ কাছে ততক্ষণ খুব আদর। আর, যেই একটু চোখের আড়াল হয়েছি অমনি ভুলে গেলেন ?"

"এ্যাঁ ! কি বললে কথাটা ?" অমল চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল।

কৃত্রিম অভিমানে প্রতিমা হেসে বলল, "কিছু না।"

"নানা, কিছুনা কেন ! সত্যি, কথাটা ভারি সুন্দর শোনাল।"

অমল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"ভাল হবেনা বলছি!"

"কেন, কি করলুম?"

"জানিনে যান্—" বলে প্রতিমা ঘুরে দাঁড়াল।

পরমুহূর্তেই সে ঘুরে আবার অমলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আবার কবে আসবেন?"

"এলেই তো ঝগড়া করবে?"

"আহা, বলুন না?" প্রতিমাব কণ্ঠস্বরে আব্দারের সুর বেজে উঠল।

"যদি বলি রোজই আসব? অমল পাল্টা প্রশ্ন করে।

"না, সেটাও করবেন না।"

"কেন?"

"আপনি বুঝবেন না, বোঝানও যায় না।" প্রতিমা চুপ করল।

অমল যখন প্রতিমাদের বাড়ী থেকে ফিরে এল তখন রাত আটটা। বাড়ীর দোর গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল কাজল, রমেন, পতাই ও সত্যেনের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে পতাই অভিযোগ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাল্লো অমল! তোমার খবর কিহে? বিয়ে করে আর বাড়ীর বারই হওনা! ব্যাপার কি?"

রমেন তার কথায় সায় দিয়ে বলল, "সত্যি ভাই; আজ আমরা সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলুম, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।"

"বেশতো, ভেতরে চল।"

বাগানের দিকে তাকিয়ে কাজল একটু কাছে সরে এসে অমলকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ ভাই, বৌদির খবর কি?"

"ওই তো, ওখানে বসে আছে।" অমল মন্দিরের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল।

সকলে দাঁড়িয়ে একবার মন্দিরের দিকে তাকাল।

"যাবো একবার সকলে ?" সত্যেনের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ মাখান।

"কি লাভ ! কথা তো কইবে না।" দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে অমল বলল।

"নাই বা বলল—যেতে দোষ কি। দেখা তো হবে ?" সত্যেন বলল।

কাজল বললে, 'দেখেও পুণ্যি। ঘোষ পাড়ার রতনের বাচ্চা মেয়েটা মরো মরো হয়েছিল। রতনের বৌ বাচ্চাটাকে কোলে করে এনে বৌদির কোলে ফেলে দিয়েছিল। বৌদি মেয়েটাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—নিয়ে যা, ভাল হয়ে যাবে। সেই-দিনই মেয়েটার রোগ সেরে গিয়েছিল। সেই থেকে ঘোষ পাড়ায় বৌদিকে সকলে সাক্ষাৎ ভগবতী বলে মনে করে।"

সত্যেন বলে, "শ্যাম পণ্ডিতের ব্যাপারটাও বল।"

পতাই বলে, "রাত অনেক হয়ে গেছে ; আজ আর নয়। কাল সকালে সকলে এসে জুট্‌ছি। তোকে নিয়ে যাব এক জায়গায়।"

"বেশ তাই হবে।" বলে অমল ঘুরে দাঁড়াল।

* * *

পরের দিন সকাল ন'টা।

অমলের কক্ষ।

সরযূ ঝাঁটা দিয়ে ঘর ঝাড় দিচ্ছে। এক বাণ্ডিল রজনী গন্ধা ঝাড় নিয়ে দয়াল ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল, "র-র-র! ধুলো উড়োস্‌ নে। দেখ্‌ছিস্‌ না হাতে ফুলের বাণ্ডিল ?"

সরযূ উত্তর দেয়, "ওঃ! রাজা কীত্তিচন্দর এলোরে !"

উত্তেজনা কথঞ্চিৎ দমন করে দয়াল জানায়, "দেখ্‌ সরযূ! ভ্যান রাগ হবার চেষ্টা হচ্ছে।"

"আরে সাবাস্‌! মরে যাই আর কি।" সরযূ টিপ্পনি কাটে।

দয়াল এবার অধিকতর ক্রোধ প্রকাশ করে বলে, "দেখবি ক্ষমতাটা দেখিয়ে দেব একবার ?" সে যৎ সামান্য এগিয়ে যায়।

সরযূও তাল ঠুকে বলে, "কি করবি রে ড্যাকরা ?"

দয়ালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হয়েছে। সে বলে, "কি ! মায়ের ভক্ত বলে এ্যাট্টুকু মান্নি নেই ! দিদিমণি কে জানিস্ ? ওই দাদাবাবুর কাছে শুধোবি।"

"ওঃ ! কি মায়ের ভক্তটা এলোরে, মুখপোড়া !" সরযূ মুখের এক বিশেষ ভঙ্গিমা করে।

"দেখ্ সরযূ, এখনো বল্‌ছি ক্ষ্যান্ত দে, নইলে, এমন জাপ্‌টে ধরবো যে লতার মতো ভূঁয়ে লেপটে পড়বি, হ্যাঁ।"

বোমা বিস্ফোরণের মত অকস্মাৎ সরযূ তেড়ে ফুঁড়ে উঠে হাতের ঝাঁটা গাছটি দয়ালের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাপড়ের আঁচল একবার খুলে পুনরায় ওটা কোমরে জড়াতে জড়াতে বলে ওঠে, "কি ! আমায় জাপ্‌টে ধরবি ? আয় দেখি একবার—"

এত বড় দেমাক্ ! পুরুষ মানুষ দয়াল সহ্য করবে কেন ? তাই, সেও তার হাতের ফুলের বাণ্ডিলটা সরযূর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে রুখে দাঁড়াল। তাচ্ছিল্যের সুরে সে বলে, "আরে থাম্ থাম্ ; এখুনি একবার ইচ্ছে করলে—এই কি বলে—"

এই সময় হৈমবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'সই কোথায় গেলে গো !'

দয়াল থতমত খেয়ে তাড়াতাড়িতে ভুল ক'রে পায়ের কাছের ঝাঁটা গাছটিই তুলে নিয়ে ফুলদানীতে ঢোকাতে লাগল। সরযূও ফুলের বাণ্ডিলটা কুড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে ঝাঁট্ দিতে সুরু করল। তাদের এই কাজের অবসরেই হৈমবতীদেবী ঘরে ঢুকলেন।

তাদের তদবস্থায় দেখে সংসারাভিজ্ঞা চতুরা হৈমবতীদেবী একবার উভয়ের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠলেন, "ও, খুব রাসলীলা চলছে যে !···তা মা কোথায় ?"

"ও ঘরে আছে, ডেকে দিচ্ছি।" বলে সরযূ চলে যাবার পূর্বে

হাতের ফুলের বাণ্ডিলটার উপর নজর পড়তেই ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে লজ্জায় জিভ্ কেটে বেরিয়ে যায় সে।

"না আমিই যাচ্ছি, চলো, দেখি।" বলে হৈমবতীদেবী বেরিয়ে গেলেন। দয়ালও তাঁর অনুসরণ করে। পরক্ষণেই কথা বলতে বলতে ঘরে ঢোকে অমল, কাজল, পতাই ও সত্যেন।

সত্যেন বলতে থাকে,—"তাই আমরা ঠিক করেছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে, ব্যাপারটার একটা অর্থবোধ্য মীমাংশায় আসা।"

"বেশ তো বস না।" অমল খাটের উপর উঠে বসল।

বস্তে বস্তে পতাইয়ের নজর পড়ল হঠাৎ ফুলদানীটার উপর। সে বলে ওটে, "সে কি হে! ওটা কি?"

কাজল উঠে কাছে গিয়ে দেখে বলে, "তাই তো! ঝাঁটা অর্থাৎ সম্মার্জনী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে!"

"এ্যাঁ! ঝ্যাঁটা! ফুলদানীতে ঝ্যাঁটা!" সত্যেনের আশ্চর্য বোধ হয়।

অমলের মন কি এক ভাবনায় ভরপুর হয়ে ওঠে। ফুলদানীতে ঝাঁটার অধিষ্ঠান! কোন অমঙ্গলের চিহ্ন নয়তো! সে চেঁচিয়ে ডাকে—"দয়ালদা!"

তার যে ডাক পড়তে পারে বিবেচনাকরে দয়াল এতক্ষণ নিকটেই অবস্থান করছিল। তাই সে প্রবেশ করতেই অমল তাকে জিজ্ঞেস করল, "দয়ালদা', ফুলদানীতে ঝাঁটা কেন? তুমি জানো কে রেখেছে?"

দয়াল যথেষ্ট আশ্চর্য্যের ভাব দেখায়, বলে, "ফুলদানীতে ঝাঁটা জানি না তো? সরযূকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।" বলে সে ফুলদানী থেকে ওটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দয়াল বেরিয়ে যাবার আগে সত্যেন তাকে নির্দেশ দিয়ে দেয় আসবার সময় এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসবার জন্য।

নয়

পূর্ণিমার রাত।

মন্দিরের শ্বেতপাথরের বারান্দায় বসে আছে অমল ও লীন। রাত প্রায় দু'টো।

দু'জনেরই হাবভাবে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে কি এক মানসিক অন্তর্দ্বন্দ দুজনের মনকেই তোলপাড় করে তুলেছে।

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে লীনাই প্রথমে কথা বলল, "আমারও কি সে ইচ্ছা মনে উঁকি দেয়না! কিন্তু বড় স্বার্থের খাতিরে ছোট স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বুঝিয়ে বলিস্, সময় উত্তীর্ণ হলেই আমি নিজেই তাঁর পায়ে আশ্রয় নেব। এখনো যে আমার কাজ বাকী আছে। তোর জন্যই তো আরো দেরী হচ্ছে!"

"আমার জন্য!"

"হ্যাঁ! যেটুকু মনস্থির করে দিচ্ছি, বিপথে গিয়ে আবার আমার কাজ বাড়িয়ে তুলছিস্। আরে, আগে কাজটা শেষ করে নে! ও-তো পড়েই রয়েছে, যাবে আর কোথায়!

"আরো পরিষ্কার করে বলো লীনা।" অমলের মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

"বুঝতে পারলি না? সেদিন কোথায় গিয়েছিলি, পরশু দিন?"

একটু চিন্তা করে অমল বলল, "ও! প্রতিমার ওখানে? কেন? ওখানে গেলে কি হয়েছে?"

"হয়নি কিছু। আমার কাছেও কি সব সময় তোকে আসতে বলি? সময় হলে যাবি বই কি। ও যে তোকে ভালবাসে।"

"ভালবাসে! সে কি! ওতো জানে আমি বিবাহিত!"

"তাতে কি হয়েছে। কেউ বিয়ে করলে কি আর তাকে ভালবাসতে নেই? ভালবাসা হচ্ছে মন-রাজ্যের গণ্ডি, আর বিয়ে

হচ্ছে সামাজিক গণ্ডি। সত্যিকারের ভালবাসা মনকে পবিত্র করে তোলে, স্থূল আকর্ষণের প্রতি তা' প্রভাবান্বিত হয় না। আবার, যে বিয়েতে পরস্পরের মধ্যে মনের মিল হয় না, সে বিয়ে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত— সে মিলনে শুধু পাপই বেড়ে যায়।

"তা'হলে কি তুমি বলতে চাও আমাদের বিয়েতে আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে পারিনি বা আমরা একে অপরের প্রতি আসক্ত নই?" অমলের কণ্ঠে অভিমানের সুর বেজে উঠল।

লীনা তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য হেসে বলে, "আরে তা' কেন? আমি বলছি, যে ভালবাসে তার কথা; আমাদের কথা হতে যাবে কেন?"

"কিন্তু সেই বা আমায় ভালবাসতে যাবে কেন সবকিছু জেনে শুনেও?"

"ভালবাসায় পাপ নেই, পাত্রাপাত্র বিচার নেই, যদি সে ভালবাসা স্বার্থমুক্ত হয় বা প্রতিদান প্রত্যাশী না হয়!

"বুঝলুম। কিন্তু এর শেষ পরিণতি?"

"পূর্ণত্বের মধ্যেই এর শেষ পরিণতি নিহিত থাকে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে অমল প্রশ্ন করল, "কিছু মনে না কর তো একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করব।"

লীনা হেঁসে উত্তর দিল, "বেশ তো, কর্না।"

"আচ্ছা, আমি যে প্রতিমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম তুমি তা' কি করে জানলে?"

"সহজাত প্রবৃত্তি।" লীনা উত্তর দিল।

"সে কিরকম?"

"এই ধর্না—দূরদেশে কোন প্রিয়জন থাকলে হঠাৎ তার কোন অবস্থান্তর হলে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা এতদূরে থেকেও লোকে তার আভাষ অনুভব করে। সবক্ষেত্রেই বা সব সময়েই তা' হয় না। তবে রাতে ঘুমন্ত অবস্থাতেই এর অনুভূতি ঘটে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।"

বাধা দিয়ে অমল প্রশ্ন করে, "কেন? দিনে বা জাগ্রত অবস্থায় হয় না কেন?"

"এই সেরেছিস্। তবেই তো অনেক কিছু ভেঙ্গে বলতে হয়!"

"বেশ তো, বল না।" অমল শোন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হল।

লীনা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর অমলের দিকে চেয়ে বলল, "সবকিছু জানবার পূর্বে মন কি তাই জানতে হবে। অন্তঃকরণরূপ পদ্মের মধ্যে থেকে এই মন দশটি ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করে। এই দশটি ইন্দ্রিয় হল—শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ঘ্রাণ, লোভ, ঘৃণা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও কাম। এইসব ইন্দ্রিয়ের যে কোনটির কার্যের ফল মনের উপর প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য এইসব ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে মনের দুয়ার যার ভেতর দিয়ে সব রকম অনুভূতি অন্তঃকরণে গিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ, মন হল একটা ক্যামেরা, ইন্দ্রিয় হল ক্যামেরার মুখ বা লেন্স্, আর অন্তঃকরণ হল সেই ক্যামেরার প্রতিফলক বা ফিল্ম। যে যে ইন্দ্রিয় যে যে জিনিস দেখবে বা অনুভব করবে, মনের মাধ্যমে সেই সেই জিনিস বা অনুভূতি অন্তঃকরণে গিয়ে প্রতিফলিত হবে। যদি কোন ইন্দ্রিয়ই কার্যকরী না হয়, তাহলে অন্তঃকরণও নিষ্ক্রীয় থাকে।"

"সব ইন্দ্রিয় কার্যকরী না হলে তো মানুষ মরে যায়?" অমল জিজ্ঞাসা করল।

"তা' কেনরে? ঘুমোলে বা জ্ঞান হারালেই তো সব ইন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়। তাতে কি মানুষ মরে যায়?"

"কিন্তু ঘুমোলে তো শ্বাস-প্রশ্বাস বয়?" অমল প্রশ্ন করে।

"তাতে কি হয়েছে। নাক দিয়ে তো সব কিছুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে। ঘুমোলে নাকের সামনে কোন সুগন্ধি জিনিস ধরলে তার কি কোন অনুভূতি আসে?" লীনা বুঝিয়ে দেয়।

কিন্তু অমল পরিষ্কার বুঝতে পারে না। তাই সে পুনরায় জানতে

চায়, "সব ইন্দ্রিয়ই যদি বন্ধ থাকে, তবে আমরা স্বপ্ন দেখি কেমন করে ?"

লীনা হেসে জবাব দেয়, "তুই দেখছি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঠিক প্রশ্নগুলিই তুলে ধরছিস্! বেশ, তবে বলি শোন্—বলে সে কি ভাবল। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বলতে সুরু করল, "মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, জ্ঞান হারায় বা মূর্চ্ছা যায়, তখন সকল ইন্দ্রিয়ই অকেজো হয়ে পড়ে—কোন কিছু অনুভূতির শক্তি তাদের তখন থাকে না। তখন শুধু মন জেগে থাকে। কিন্তু মনের দুয়ার যে সকল ইন্দ্রিয়, তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোন কিছুই আর তখন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় না - যার জন্য জীব কোন কিছু দেখতে শুনতে বা বুঝতে পারে না স্পষ্ট করে। কিন্তু মন জেগে থাকার দরুণ পূর্ব জন্মের বা বিগত দিনের দেখা কোন জিনিস, জায়গা বা দেব-দেবীর মূর্তি আবছাভাবে অন্তঃকরণের উপর কাজ করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে এই সকল জিনিস তত স্পষ্ট হয় না বা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কারণ চিত্ত এই সকল বিগত স্মৃতিকে সুস্পষ্টভাবে মনে আনতে পারে না। আর সেইজন্যই ঘুম ভেঙ্গে গেলেও ঐ সকল আবছা স্মৃতি ঠিকমত মনে উদয় হয় না।"

"তুমি আবার যে নতুন কথা বলছ ! চিত্ত আবার কোথা থেকে এল ? ওর আবার কি কাজ ?"

"শুধু চিত্ত কেন ? আরো অনেক কিছুই আছে। অন্তঃকরণ চতুর্মুখী—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। মনের কাজ হল কোন কিছু অন্তঃকরণের উপর তুলে ধরা ; বুদ্ধির কাজ সেই সকলের গুণ বিচার করা ; অহঙ্কারের কাজ হল সবজান্তা ভাব আর চিত্তের কাজই হল স্মৃতিশক্তি জাগরুক করে হৃদয়ঙ্গম করবার সুযোগ করে দেওয়া। যাক্, কোন্ প্রশ্ন থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

"তাতে কি হয়েছে ? কত জ্ঞান হল বলত ? আমি শুধু ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই লীনা, তোমার এসব জ্ঞান কোত্থেকে এলো !"

"—আর আমিও তো তোকে সেই জ্ঞান লাভের পথেই ঠেলে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু মন তোর এখনও বড় চঞ্চল! আসল কাজ ক্রমশঃই দেরী হয়ে যাচ্ছে।" লীনা তার সন্দেহ প্রকাশ করে।

অমল যেন হঠাৎ পাগল হয়ে উঠল। যে করেই হোক তাকে এ জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। লীনা মেয়েছেলে। সে যখন পেরেছে, আর, সেতো পুরুষ মানুষ। সে কেন তবে পারবে না—নিশ্চয়ই পারবে।

সে উদ্‌গ্রীবভাবে লীনাকে বলল, "লীনা, তুমি আমায় সাহায্য কর, আমায় তৈরী করে নাও। বল, আমায় কি করতে হবে?"

তার আগ্রহ দেখে মনে মনে খুব খুসী হলেও লীনা মুখে সে-ভাব প্রকাশ করল না। গম্ভীরভাবে সে একবার অমলের দিকে তাকাল। কী সে চাহুনী! যেন অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত তাতে ধরা পড়ে।

অমলও তার দিকে তাকাল। কি এক বিদ্যুৎ স্পন্দন তার সর্বাঙ্গে খেলে গেল। পতঙ্গ যেমন কাঁচপোকার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়, অমলও যেন সেইভাবে লীনার প্রতি আকৃষ্ট হল। মনে হল তার সর্বশক্তি যেন ধীরে ধীরে কী এক যাদুবলে লীনার দেহে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার মনোবলও যেন নিস্তেজ হয়ে এল।

একটি মুহূর্ত! পরক্ষণেই লীনার কোমল কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙ্গল, "কিরে পারবি? রাস্তা বড়ই কঠিন।"

"পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।"

"মাঝপথে পিছিয়ে যাবি নাতো? ভেবে দেখ্।"

"না কখনোই না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।"

লীনার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। তার এতদিনকার আশা আজ সফল হয়েছে। আনন্দাতিশয্যে সে অমলকে উৎসাহিত করবার জন্য বলল, "কোন ভয় নেই। পথ কঠিন হলেও পথের শেষে আছে অনাবিল আনন্দ—অফুরন্ত সম্পদ যার জন্য মুনিঋষিরা জন্মজন্মান্তর তপস্যা করে আসছে।"

"কিন্তু মুনি ঋষিরাও যে জিনিস তপস্যা করে পায় না, আমি কি এত সহজেই তা' পাব ? তুমি কি বলছ লীনা ?"

"ঠিকই বলছি। তোর যদি মনের জোর থাকে আর অন্তরে ভক্তি থাকে তবে অসম্ভবও সম্ভব হবে। আর আমি তোকে রাস্তা বলে দেব। তোর জন্য আমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি। এতদিন তবে আমি কি করলুম ! তোরাই অভিযোগ করিস—আমি কথা বলিনা কেন, থান্ কাপড় পরি কেন। মনকে কেন্দ্রীভূত করতে হলে বাহ্যিক বিলাস ব্যসন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হয়, যাতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া মনকে চঞ্চল করে তুলতে না পারে। তাই আমি থান্ পরি। আর বাক্ সংযম করতে পারলে মানসিক শক্তিও যেমন বৃদ্ধি পায়, মনের বলও তেমনি বেড়ে যায়। সংসারে পাঁচজনের মধ্যে থাকতে গেলে বাক্ সংযম করা সম্ভব নয়—চাই একটা নিরিবিলি আস্তানা, একটা স্বাচ্ছন্দ পরিবেশ। তাই আমি এই মন্দিরটিকেই বেছে নিয়েছি।'

কথার মাঝে বাধা দিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল, "কিছু মনে না করতো একটা অবান্তর কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।"

"বেশতো, কি বলবি বল্।"

সঙ্কুচিত ভাবে অমল বলল, "এই কিছুক্ষণ আগে তুমি যখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে, তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার সব শক্তিই হারিয়ে ফেলছি—চারদিক যেন আমার কাছে একাকার হয়ে যাচ্ছিল—কী এক বিদ্যুৎ স্পন্দনে যেন আমার দেহ মোহাভীভূত হয়ে পড়ছিল। কেন অমন হল ?"

হেসে লীনা উত্তর দেয়, "ওটা হল সম্মোহিনী শক্তি—একের কাছে অপরের বশ্যতা স্বীকার।"

"তুমি কি সম্মোহন বিদ্যা জান ?"

"এটা ঠিক বিদ্যা নয়। এটা একটা প্রক্রিয়ার ফল। মন যখন কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তার ক্ষমতা অসীম। তখন সে অপরের সাধারণ

মনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে নিজের ইচ্ছামত তাকে পরিচালিত করতে পারে। দর্শনেন্দ্রীয় মনের একটি দুয়ার। সেই দর্শনেন্দ্রীয়দ্বারা সাধারণতঃ কোন কেন্দ্রীভূত মন অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে সেই মনকে সে নিস্তেজ করে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়ত্ব করে ফেলে। তখন সেই মনের আর নিজস্ব কোন অস্তিত্বই থাকে না। একেই বলে সম্মোহিনী শক্তি।"

"মনকে কি করে কেন্দ্রীভূত করতে হয়?"

"সেতো আগেও তোকে অনেকবার বলেছি। যৌগিক ক্রিয়া, প্রাণায়াম, সাধনা ও একাত্মচিত্ত দ্বারা মনকে বশে আনতে পারা যায়। আর, তার জন্য চাই স্থান ও উপযুক্ত পরিবেশ। একবার এই কাজে সফল হলে তখন সেটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়; তখন আর মনস্থির করতে বেশী সময় লাগে না। আর, এই শক্তিমান মনের প্রভাবে যে কোন দুর্বল মনকে নিমেষে বশীভূত করা যায়। যাক্, যে কথা বলছিলুম তাই বলি। তোকে শক্তি সাধনা করতে হবে।"

"শক্তি সাধনা!"

"হ্যাঁ, শক্তি সাধনা। কলিযুগে সেই পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার এইটিই সোজা পথ।"

"শক্তি সাধনা মানেই তো সেই মরা মানুষের উপর বসে জপ করতে হবে?"

লীনা একটু হাসল।

তার হাসিতে লজ্জিত হয়ে অমল মুখ নীচু করতেই লীনা বলল, "সব ক্ষেত্রেই কি তার দরকার হয়? শবাসন ছাড়াও তো শক্তি সাধনা করা যায়। আর, সেতো পরের কথা। যখন কথাটা উঠল, তখন একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই শবেরই ব্যাপার নিয়ে। তোরও জেনে রাখা ভাল, ভবিষ্যতে কাজ দেবে।"

"কি, বলো।"

লীনা বলতে লাগল, "পুরাণে লেখা আছে—কোন এক সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নির্জনে এক জঙ্গলের ধারে নদীতীরে বসে তিনজনে ধ্যান করছিলেন। তখন মহামায়া তাঁদের একাগ্রচিত্ততা পরীক্ষা করবার জন্য গলিত শবরূপে ভাসতে ভাসতে এক এক করে তিনজনের ধারেই গিয়ে হাজির হলেন। যখন তিনি ব্রহ্মার কাছে গেলেন, দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে ব্রহ্মা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পরে তিনি বিষ্ণুর কাছে গিয়ে হাজির হতে তিনিও ঘৃণায় ঘুরে বসলেন। অতঃপর তিনি শিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শিব একবার চোখ খুলে তাঁকে দেখে নিলেন। পরক্ষণেই মহেশ্বর সেই শবটাকে দু'হাতে ঝাপটে ধরে জল থেকে তুলে ফেললেন। তিনি সেই শবটাকে উপুড় করে ফেলে হাত পা পিঠের দিকে মুড়ে তার উপর ভাল করে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। মহামায়া তার ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইপ্সিত বর দিলেন। তাই তিনি মহাদেব। কাজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শক্তিসাধনায় শবাসন ফলকে তরান্বিত করে।"

"পুরাণ, উপনিষদ্ আর বেদে তফাৎ কি?" অমল জিজ্ঞাসা করে।

"এই দেখ আবার কি প্রশ্ন। তোর কি এখনই সব কিছু জানতে হবে? একটু একটু করে সব কিছুই জানতে পারবি। মোটামুটি ভাবে জেনে রাখ্—বেদ হল অমোঘ—শাশ্বত—সত্য। প্রকৃতির স্বরূপ নির্ভুলভাবে বেদে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যা' দশ ইন্দ্রিয় সরল ও সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তাই বিশদ্ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে এই বেদে। ব্রহ্মার মুখ থেকেই বেদের সৃষ্টি। উপনিষদ্ হল ভাব-গ্রাহিক। বেদের প্রতিটি জিনিসকে উপদেশ ও ভাবের দ্বারা বা অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধির বিচারে উপলব্ধি করানই উপনিষদের মর্ম। আর এতেই ঈশ্বরের নিরূপণ আছে।

উপনিষদ আঠারো ভাগে বিভক্ত—ঈশোপনিষদ, কেনোপনিষদ, কঠোপনিষদ, তৈত্তিরিয়োপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, তিতিস্রয়োপ-

নিষদ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, মার্কণ্ডকোপনিষদ, ঐতরোপনিষদ, কৌশাতকী উপনিষদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ, কৃষ্ণো-পনিষদ। আরো পাঁচটি ছোট উপনিষদ আছে। কিন্তু সাধারণ লোক বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা বলেই আর একটু সরলভাবে গল্পাকারে বেদের মর্মকে প্রকাশ করা হয়েছে পুরাণের মাধ্যমে।

ভগবানের মুখনিঃসৃত শ্রুতির বিদ্যার সংখ্যা হল আঠারটা। তা'হল চারটি বেদ—ঋগ্, সাম্, যজু ও অথর্ব বেদ—ঋগ্বেদে দেবতাদের তুষ্ট করবার জন্য নানারকম স্তুতিগান আছে; এ হল জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ; সামবেদ মন্ত্র ছন্দযোগে গানের নির্দেশ দেয়; যজুর্বেদে আছে পূজা ক্রিয়াদির নানারকম নির্দেশ ও অথর্ববেদে বশীকরণ, উচাটন স্তম্ভন এইসব নানারকম নীচ কাজের পদ্ধতি দেওয়া আছে। এইজন্য অনেকে অথর্ববেদকে বেদ বলে মানে না। কেউ আবার তন্ত্রশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলেন। আছে চারটি উপবেদ—আয়ু, গন্ধর্ব, দণ্ডনীতি ও ধনুর্বেদ। ছ'টি বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা থেকে বৈদিক সুক্ত উচ্চারণ করে স্বর-সংযোগে গান করবার শিক্ষা লাভহয়। কল্পহ'ল বেদের সূত্রগ্রন্থ। ব্যাকরণের মাধ্যমে বৈদিক সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরুক্ত হল, বৈদিক শব্দের ও বাক্যের অর্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ। ছন্দ সাত রকম—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতি, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতি; এদের সাহায্যেই বেদের মর্ম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মাধ্যমেই আমরা সূর্যাদি গ্রহগণের রহস্য জানতে পারি। বেদান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে লগধ বলেছেন—জ্যোতিষ বিদ্যা না জানলে জগতের আসল জ্ঞান উপলব্ধি করা যায় না। তৈত্তীরিও উপনিষদে আছে—আত্মা সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিল। আকাশের নূতন উৎপত্তি হয় না—কেননা, আকাশ ব্যতীত প্রকৃতি পরমাণু কোথায় থাকতে পারে? আকাশের পরে বায়ু, তারপরে অগ্নি

তারপর জল, জলের পর পৃথিবীর জন্ম হয়। পরে এই পৃথিবী থেকে ওষুধি, তার থেকে অন্ন, অন্ন থেকে বীর্য, আর, বীর্য থেকে শরীর। এই শরীরই হল পুরুষ বা মানুষ। শুনতে ভাল লাগছে তো?"

"নিশ্চয়ই। তুমি বলে যাও।" অমল উত্তর দেয়।

"তারপর শোন্—" লীনা বলতে থাকে, "সৃষ্টির সময় পরামাত্মা পরম সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে একত্রিত করেন—স্থূলগুলির নাম দেন মহত্তত্ত্ব, মহতত্ত্বের চেয়েও যা স্থূল তা হল অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে পাঁচ রকম সূক্ষ্মভূত—শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। এদের বলে জ্ঞানেন্দ্রিয়। আর, বাক্, হস্ত, পদ, উপস্থ ও মলদ্বার। এদের বলে কর্মেন্দ্রিয়। এরপর একাদশ মন অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে উৎপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে বিবর্তনবাদের ধারা অনুযায়ী পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত, অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে নানা রকম স্থূলাবস্থার মধ্য দিয়ে যে স্থূলভূত উৎপন্ন হয় তাকে তখন আমরা দেখতে পাই। সাংখ্যদর্শনে এই কথা বলে। এইভাবেই স্থূলভূত থেকে গাছপালা, ওষধ, অন্ন, বীর্য ও শেষে মানুষের সৃষ্টি হয় ও ক্রমে তাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। আদিতে মৈথুনি সৃষ্টি ছিল না—"

—"কি বললে? বুঝলাম না।" অমল প্রশ্ন করে।

লীনা তাকে বুঝিয়ে বলে, "মৈথুনী সৃষ্টি মানে, মায়ের গর্ভে জন্ম। তখন স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব ছিলনা। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এঁদের অস্তিত্বই শুধু তখন অনুমান করা গিয়েছিল। এদের শক্তির দ্বারাই বিশেষ করে শিবের দেহ থেকেই বারোটি পুরুষের সৃষ্টি হয়। এদের বলে দ্বাদশ আদি পুরুষ।

পরে পরমাত্মা স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে জীব সংযোগ করে দেন এবং তারপর থেকেই মৈথুনী সৃষ্টি চলতে থাকে—"

বাধা দিয়ে অমল প্রশ্ন করে, "এযে দেখছি তুমি মানুষের আদি সৃষ্টির কথা বলছ। বলো, ভালো লাগছে।"

খুশী হয়ে লীনা বলে চলে, "যখন কথায় কথায় কথা এসে গেছে

তখন আরো শোন -বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে জীব-শরীর পঞ্চকোষ যুক্ত। প্রথম 'অন্নাশয় কোষ' ; এ ত্বক থেকে অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয়, 'প্রাণময়' কোষ এতে প্রাণ প্রধান—যা' ভেতরে থেকে বাইরে যায় এবং 'আপন' যা বাইরের থেকে ভেতরে আসে ; সমান' যা নাভীতে বর্তমান থেকে সারা শরীরে রস সঞ্চারিত করে ; 'উদান' দ্বারা কণ্ঠের অন্ন, জল, সবকিছু আকৃষ্ট হয় ও বলও পরাক্রম বৃদ্ধি পায় ; 'ধ্যান'-এর দ্বারাই জীব বা মানুষ সমস্ত শারীরীক কর্মের চেষ্টা করে ; দান, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও দৈহিক সব রকম কাজ কর্ম এই পর্য্যায়ে পড়ে। তৃতীয়, 'মনোময় কোষ'এ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আছে, অর্থাৎ, যাদের দ্বারা জীব পাঁচ রকম কাজ সম্পন্ন করে ; এরা হল—অহঙ্কার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (গুহ্য) ও উপস্থ। চতুর্থ, 'বিজ্ঞানময় কোষ' ; এতেও আছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—বুদ্ধি, চিত্ত এবং শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র ও জিহ্বা, ঘ্রাণ। পঞ্চম, 'আনন্দময় কোষ' ; কোষ থেকেই মানুষ সব রকম প্রীতি, প্রশন্নতা ও আনন্দের অনুপ্রেরণা পায়। তাহলেই এই পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে নানারকম কাজকর্মের মাধ্যমে জীবনের পথে চলবার সবকিছু উপায়ের কথা শুনলি। এবার আমরা আমাদের পুরানো কথায় আসি। কি বলছিলুম যেন? ও হ্যাঁ, এর পর আছে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র। পুরাণ আছে আঠারোটি। যেমন—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবৎ, নারদীয়, মার্কাণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ বরাহ, স্কন্দ, বামন, কুর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

উপপুরাণও আঠারোটি, যেমন—সনৎ কুমার, নরসিংহ, নারদ, দুর্বাসা, নন্দ, কপিল, বামন, উযমস্, মালা, বরুণ, কালিকা, মহেশ্বর, শাম্ব, দেবী, পরাশর, মারীচ, ভার্গব।"

কথার ফাঁকে অমল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, পুরাণের বয়স কত?—"

—"অর্থাৎ তুই জানতে চাস পুরাণ কবে লেখা হয়েছিল। তাইনা?"

"হ্যাঁ।"

"শোন্ তবে—আমাদের ভারতীয় হিন্দু সভ্যতাকে হেয় করে দেখাবার জন্য প্রাশ্চাত্যের মনিষীরা ও বৈজ্ঞানিকরা বহুকাল ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। সত্যিকারের হিসাব দিলে আমাদের দেশের সভ্যতার আয়ুষ্কালই সবচেয়ে পুরানো বলে মনে হবে। তাই ও-দেশের পণ্ডিতরা বলেন পুরাণ লেখা হয়েছিল খৃষ্টজন্মের চারশো বছর পরে। কিন্তু আমাদের হিসাব মত পুরাণের জন্মকাল খৃষ্টজন্মের এগারোশো বছর আগে, অর্থাৎ ওদের মতের আরো পনেরোশো বছর আগে। শেষ অবধি ওদের দেশের মনীষীরাও আমাদের হিসাবই মেনে নিয়েছেন, এর প্রমাণও আছে। কাজেই পুরাণই হ'ল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও আদি গ্রন্থসংযোজন। হ্যাঁ, তারপর শোন্, পুরাণের কথাতো হল। এ ছাড়াও আরো আছে ছ'টি দর্শনশাস্ত্র—বেদান্ত, যোগ, সন্ধ্যা, মীমাংসা, বিশেষ ও ন্যায়। বেদান্তে ব্রহ্মার স্বরূপ জানতে পারা যায়। বুঝতে পাচ্ছিস তো? জ্ঞানের শেষ নেই—শুধু চাই শেখবার আগ্রহ, আর চাই ভক্তি। কি ভাবছিস?

তার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল, 'বুঝলাম সবই ···আচ্ছা, আমাকে যদি শক্তি সাধনাই করতে হয়, তবে কার পূজা করব?"

"তোর যাকে মন চায়।"

"তুমিই বলে দাওনা?"

মুচ্‌কি হেসে লীনা বলল, "আমার অপেক্ষায় কি তুই রয়েছিস্? আগে থেকেই তো তুই ঠিক করে রেখেছিস্। মনে নেই? সেই সেদিন বলেছিলি? তিনিই তো মহাশক্তিরূপিনী মহামায়া—মহাবিদ্যা।"

"মহামায়া কি সত্যই আছেন? তিনি কি যথার্থই মাতৃরূপিনী?" অমল প্রশ্ন করে।

অমলের এই প্রশ্নে লীনা একবার তার দিকে তাকায়। পরে

সে বলতে থাকে, "মহামায়া কে? তিনি কি সত্যই আছেন? আছেন কি নেই, তিনি সত্য, না, অসত্য, মায়ের সম্বন্ধে এইসব বিচার করা কি ঠিক? আমাদের উদ্দেশ্য মাকে পাওয়া, আমরা শুধু তাঁর স্নেহ চাই। তাঁর স্বরূপ বিচারে আমাদের কি দরকার? যখন আমাদের গর্ভধারিনী মায়ের কাছে আমরা মা ব'লে দাঁড়াই, তখন তাঁর যাই কেন প্রকৃতি থাক্‌না, তিনি কি আমাদের কোলে তুলে নেন্‌ না? আদর করেন না? জানিস তো, ভক্তিতে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর? মহামায়াই সত্য, মহামায়াই জীবের মা। তাই চণ্ডীতে আছে—'মহামায়াই জীব-জগৎ আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখিনা, দেখি মা: জলে জল দেখিনা, দেখি রসময়ী মা; বায়ু, বায়ু নয়, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্য, চন্দ্রসূর্য নয়, মাতৃচক্ষু বা মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুত নয়, মায়ের কটাক্ষ বা মা, নির্মল আকাশ, আকাশ নয়, প্রশান্ত উদার মাতৃবক্ষ; মেঘ মালা হ'ল মায়ের কেশজাল; এই পরিদৃশ্যমান জগৎই মায়ের প্রকট মূর্তি! জগৎ দেখে যার মাকে মনে না পড়ে, সে কেমন করে জগৎ-অতীতা, ভাব-অতীতা মাকে ধরবে, মাকে পাবে!—আমিও তো তাই বলি যদি মহামায়াকে পেতে চাস, তবে ভাবে ভাবে এগিয়ে যা, ভাবকে মা বল্‌, ভাবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দে, ভাবের পায়ে প্রণাম কর। ভাব ছাড়া এ জগৎ অন্য কিছু নয়। স্বার্থ্যান্বেষী মানুষ জানেনা সে কে, কার ইঙ্গিতে তার প্রতিটি কাজ পরিচালিত হচ্ছে। সাধর্ম সকল কাজেব অনুপ্রেরণার উৎসই ঐ মা। তাই চণ্ডীতে আবো বলেছে—'ধর্মের অনুষ্ঠান করে যার প্রকৃতি ধর্মরূপে আত্ম প্রকাশ করে, সে কি জানে ঐ প্রকৃতি কে?' ঐ প্রকৃতিই মহামায়া মা। শুধু ধার্মিক নয়, অধার্মিক, পাপাশয় ব্যক্তিও যে সব মহাপাপ করে, ভোগবিলাসের জন্য কোন পাপ কাজ করতেই যার বাধেনা, সেকি জানে কার ইঙ্গিতে সে ঐসব কাজ করে বেড়ায়? তিনিই মহামায়া মা। 'মা-ই হিংসাদ্বেষ-নিষ্ঠুরতা রূপে, আলস্যরূপে, দয়া-মায়া রূপে, অধ্যবসায়রূপে, বিষয়-সম্ভোগ রূপে, সন্ন্যাসরূপে,

প্রতিপালন রূপে কিম্বা উপাসনারূপে, সব ঐ মায়েরই আত্মপ্রকাশ।' স্বয়ং মহেশ্বরও তো তাঁরই তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।"

"সেকি! কালীতো শিবের স্ত্রী! তবে কেন শিব তার তপস্যা করলেন?" অমলের কেমন যেন খট্‌কা লাগল।

লীনা গম্ভীরভাবে বলল, "কে বলল কালী শিবের স্ত্রী ছিলেন?"

লীনার এই প্রশ্নে অমল হক্‌চকিয়ে গেল। এ আবার কি কথা! সকলেই তো তাই জানে। তার প্রশ্নের মর্ম বুঝতে না পেরে অমল বোকার মত তার দিকে চেয়ে থাকে।

লীনা তার সংশয় দূর করবার জন্য ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "একটু বোঝবার চেষ্টা কর্। আগেই বলেছি, মহামায়া শিবের তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর দিলেন মহাপ্রকৃতি মহামায়াকেই তিনি স্ত্রীরূপে পাবেন। তাঁর এই বর দেবারও একটা উদ্দেশ্য ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত পাপাচারী দক্ষের ধ্বংসের জন্যই তিনি তার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই কন্যার নাম হল সতী। বিবাহযোগ্যা হলে নারদের পরামর্শে রাজা দক্ষ শিবের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। কিন্তু শিব জানলেন না তিনি কাকে বিয়ে করলেন। তিনি সতীকে সাধারণভাবে দক্ষের কন্যা বলেই ভেবেছিলেন। উভয়ের বিয়ের পর সতীর স্বামীর প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে শিব খুব তুষ্ট হয়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই শিবের দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে ও তাঁর সঙ্গ-সাথীদের কথা জানতে পেরে দক্ষ লজ্জায় মরে গেলেন এবং তাঁকে আর জামাই বলেই স্বীকার করতে চাইলেন না।"

"তুমি শিবের কোন্ আচার ব্যবহারের কথা বলছ?" অমল প্রশ্ন করে।

লীনা বলে, "এই ধর্—রুজী রোজগারের দিকে নজর নেই নেশা ভাং করে গায়ে ছাই মেখে গলায় সাপ জড়িয়ে সারাদিন ভূত

প্রেত-দানা-দত্যিদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। দক্ষ হলেন গিয়ে রাজা! আর তার জামাই কিনা—ছি ছি!"

"কিন্তু শিবের স্ত্রী, সতী, স্বামীকে তাঁর এই কুসংসর্গের জন্য তাঁকে কিছু বলতেন না?"

"মোটেই না। বরঞ্চ স্বামীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তাঁর দেখাদেখি অতবড় রাজার মেয়ে হয়েও সতী বসন ভূষণ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন করতে লাগলেন।"

"আচ্ছা, তারপর কি হল বলো।" অমলের আর তর্ সইছে না।

লীনা পুনরায় বলতে লাগল, "তারপর রাজা দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি পৃথিবীর সব বড় বড় রাজা, মহারাজা ও সাধুসন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু নিজের অসম্মান হবে মনে করে তিনি জামাই শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না।

এদিকে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনে সতীর ইচ্ছা হল দক্ষালয়ে যাবার জন্য। আর অনেকদিন সে বাবা-মাকে দেখেনি, কাজেই ইচ্ছা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এই সময় বাধা দিয়ে অমল বলল, "কিন্তু যেখানে স্বামীর নেমন্তন্ন হয়নি, সাধ্বী স্ত্রী হয়ে সতীরই বা এ ইচ্ছা হল কেন সেখানে যাবার জন্য?"

হেসে লীনা উত্তর দিল, "তাই হবে না কি? মহাশক্তিশালী দক্ষের কন্যারূপে তিনি তাঁর ঘরে এসেছিলেন কেন? ভুলে গেলি সব?"

লজ্জিত হয়ে অমল জবাব দিল, "হ্যাঁ। তারপর বলো।"

লীনা বলতে লাগল, "নেমন্তন্ন করেনি বলে স্বভাবতই দক্ষের উপরে শিবও চটে গিয়েছিলেন। কাজেই সতীর কোন কথাই তিনি শুনলেন না। সতী তখন নানাভাবে শিবকে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু শিব কোন কথাই কানে তুললেন না। তাঁর আরো একটা ভয় ছিল, দক্ষালয়ে গেলে সতীর কোন ক্ষতি হতে পারে।

সতী তাঁর মনের এই ভ্রম নিরসনের জন্য এ কথাও স্বামীকে বলল, যে দেবাদিদেব মহাদেব যার স্বামী, এই বিশ্ব সংসারে এমন কি কেউ আছে যে তার ক্ষতি করতে পারে ? শিব কিন্তু তবুও বোধ মানলেন না। তখন সতী তাঁর এই স্বামীত্বের বড়াইকে খর্ব করবার জন্য এবং সে যে কে এবং কেউ যে তার কোন অনিষ্ট করতে পাবে না, তাই বোঝাবার জন্য কট্‌মট্‌ করে একবার স্বামীর দিকে তাকাল। উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। দেখতে দেখতে সতীর দেহে পরিবর্তন দেখা দিল। তার দেহের রং ঘোব কালোবর্ণে পরিণত হল ; চক্ষু তারকা দু'টি বিরাট গোলাকার হয়ে ঘুরতে লাগল ; মুখখানি তার এক বিরাট গহ্বরে পরিণত হল। সেই ভয়াল মূর্তি তখন বড় বড় দাঁত বার করে বিকটভাবে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে শিবের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তিনি তখন সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কে তুমি ! কি চাও ?'

শিবের এই প্রশ্নে সেই ভয়াল মূর্তি চক্ষু রক্তবর্ণ করে পুনরায় বিকটভাবে হেসে উঠল। এই ভীষণদর্শনা মূর্তিকে সহ্য করতে না পেরে শিব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুরে ঘরের উত্তর কোণে ছুটে পালাতেই সম্মুখে দেখলেন দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা বিবস্ত্রা এক নারীমূর্তি। তার চারটি বাহু, গলায় মুণ্ডমালা।

এবারো শিব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে তুমি ? কি চাও ?'

মূর্তি তখন বিকট কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি তোমার স্ত্রী সতী —দক্ষিণাকালী।'

শিব সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সতী ! তবে তোমার এই ভীষণারূপ কেন ?'

কালী উত্তর দিল, 'এই আমার আসল রূপ। আমিই মহাশক্তি মহামায়া। তোমার তপস্যায় প্রীত হয়ে দক্ষের ধ্বংস কামনায় তোমার স্ত্রীরূপে এসেছি।' বলেই কালী আবার বিকটভাবে হেসে উঠল।

মহাভয়ে শিব যেই ডানদিকে ঘুরলেন অমনি এক ভীষণ দৃশ্য

তিনি শিউরে উঠলেন! তিনি দেখলেন এক উলঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গী খড়্গদ্বারা নিজের মস্তকচ্ছেদ করে হাতের চেটোর উপর মুণ্ডটি ধরে আছে, আর কাটা গলা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের স্রোত সেই মুণ্ডের মুখে গিয়ে পড়ছে। কী ভীষণ!

তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। ভয়ে দিশেহারা হয়ে তিনি গৃহের দশদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। প্রত্যেক কোণেই তিনি আলাদা আলাদা ভয়ঙ্করী রূপ দেখে আতঙ্কে কালীর দিকে ঘুরে করজোড়ে বললেন, 'আমায় রক্ষা করো! বলো, বলো তুমি কি চাও!'

তখন কালীর মুখমণ্ডল পদ্মের ন্যায় হাস্যকোমল হয়ে উঠল। সে মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত জ্যোতি। একটি হাত তুলে সে বলল, 'শোন, আমি মহাপ্রকৃতি—ভাষা ও মনের ঊর্ধ্বে। আমিই সৃষ্টিকারী, আবার আমিই ধ্বংসকারী। কাল ফুরালেই আমার আবির্ভাব ; তাই আমি মহাকাল। আবার সৃষ্টিকারী বলে আমিই আদ্যাকালী। আমিই উন্মুক্ত উদ্‌ভ্রান্ত মূল প্রকৃতি। তাই আমি বিবস্ত্রা, এলোকেশা—সৃষ্টিকারিণী প্রসবিনীরূপা ; উন্মুক্ত বক্ষ্যা—স্তনদাতৃ, সন্তানপালিনী ; মুণ্ডমালিনী—লয়মান জীব-জগতের প্রতীক। পঞ্চাশটি ব্রহ্মাণ্ড আমি লয় করে দিয়ে এসেছি। তারই প্রতীক আমার গলার এই পঞ্চাশটি মুণ্ডের মালা। তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য আমি তোমায় এই সকল রূপ দেখাচ্ছি না। আমার স্বরূপ তোমায় জানানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য—যাতে তুমি নির্ভয়ে আমায় দক্ষালয়ে যেতে দাও।'

'তবে এই সকল রূপ এরা কারা?' শিব প্রশ্ন করেন।

মূর্তি বলল, 'আমার সহস্র রূপ আছে। এদের বলে বিভূতি। এক একটি বিভূতি এক একটি মহাবিদ্যা। এই দশটিই তাদের মধ্যে প্রধান। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমি মহাকালী। যিনি তোমার মাথার ওপর, তিনি কালরূপী মহাবিদ্যা তারা—মহাকাল।

তোমার ডানদিকে ছিন্নমস্তা, বামদিকে ভুবনেশ্বরী। তোমার পেছনে শত্রুনাশিনী বগলামুখী, দক্ষিণে ভৈরবী, দক্ষিণ-পুর্ব কোণে ভীষণদর্শনা বিধবারূপী মহাবিদ্যা ধূমাবতী। দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছেন ত্রিপুরা সুন্দরী কমলা, উত্তর-পশ্চিমে মাতঙ্গী আরউত্তর-পুর্ব কোণে ষোড়শী।'

শিব আরো জানতে চাইলেন, 'এদের কার কি ক্ষমতা ?'

কালী উত্তর দিল, 'ভক্তি সাধনায় এঁদের পূজা করলে এঁরা চতুষ্কামনা পূর্ণ করেন। মারন, উচাটন, ক্ষোভন, মোহন, দ্রাবণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ—এই সব গুণ আয়ত্ব করা যায়, যদি এঁরা প্রীত হন।'

শুনে শিব বুঝতে পারলেন তিনি কি ভুল করেছেন সতীর দক্ষালয়ে যাবার অনুরোধ উপেক্ষা করে। তাই তিনি অনুতপ্ত হয়ে করজোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

লজ্জিতভাবে কালী জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ! তুমি আমার স্বামী। পতিই স্ত্রীর দেবতা। তুমি আর আমায় লজ্জা দিওনা। আজ থেকে তোমার মুখ দিয়ে যে আগমশাস্ত্র নির্গত হবে, সেই হবে জগতের ত্রাণ শাস্ত্র। আগম আর বেদ আমার দুই বাহু।' বলে কালী পুনরায় সতীর রূপ পরিগ্রহ করল।

এই পর্যন্ত বলে লীনা অমলের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল অমল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে যেন পলক নেই, যেন কি এক মোহাচ্ছন্নতায় তার মন ভরে আছে।

"কি? কি হল?"

সচকিতে একবার নড়ে উঠেই অমল জড়িতস্বরে বলে উঠল, "পেয়েছি, আমি পেযেছি—মা মা—" সে আচ্ছন্নভাবে লীনার সম্মুখে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

স্থিরভাবে একবার তার দিকে চেয়ে দেখে লীনা ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তার মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল এক স্বর্গীয় দীপ্তি—তৃপ্তির আভাষ।

একটি মূহূর্ত!

অমল ধড়মড় করে উঠে সোজা হয়ে বসল।

লীনার দিকে তাকিয়ে সে মোহময়ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখলুম লীনা?" তার কণ্ঠস্বরে একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব।

"ঠিকই দেখেছিস। ওই তো পথ! পথের সন্ধান যখন পেয়েছিস, তখন ঠিকভাবে আঁকড়ে থাক্—সব পাবি।"

"তুমি বলছ লীনা?"

"হ্যাঁ। যখন মায়ের আসল রূপ তুই দেখেছিস্ তখন তোর আর ভাবনা কি? সকলেই কি পায়রে? এই পাওয়াই তো সকল পাওয়া—এর জন্যই তো জগৎ পাগল!"

"তুমি কি করে বুঝতে পারলে আমি পেয়েছি?"

মাথা নেড়ে লীনা উত্তর দেয়, "সে কি আমি বুঝতে পারিনি! আমার মুখে গল্প শুনতে শুনতে তোর ভাবাবেশ হয়েছিল। আমি তা' লক্ষ্য করেছি। তুই তখন শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলি। তাই হয়—মহাশক্তির সাধনা করতে গেলে সাধককে নিজেকে শিবতুল্য বা ঈশ্বরী বলে গণ্য করতে হয়। দেখিসনি? কালীপুজা বা কোন দেবতার পূজার সময় পুরোহিত নিজের মাথায় বেলপাতা বা ফুল চাপিয়ে দেয়?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু কেন করে জানতুম না।" অমল বলল।

"ওই তার কারণ। দেবতা তোর মধ্যেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। বিস্মৃতির আবরণে তুই তা' বুঝতে পাচ্ছিস্ না। তাঁকে জাগিয়ে তোল্, জাগিয়ে তোল্।"

অমল চমকে ওঠে। এখনো যেন তার চোখের সামনে ভাসছে সুন্দরী সতী মায়ের সেই ভীষণদর্শনা রূপগুলো। কী ভয়াল সে দৃশ্য! অস্ফুষ্টস্বরে যেন তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল, "কি আশ্চর্য দেহের পরিবর্তন!"

লীনা যেন তার মনের কথা বুঝতে পারল। তাই সে বলল, "ওইখানেই তো ঈশ্বর আর জীবে তফাৎ। মায়াদ্বারা যে প্রভাবান্বিত হয়, সেই জীব। আর, মায়া যাঁর দ্বারা প্রভাবিত বা বশীভূত হয়

তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে, যা' জীবের থাকে না। ঈশ্বরের আটটি সিদ্ধি আছে। যেমন—অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশীত্ব, বশীত্ব এবং কামাবশায়িত্ব।"

কিছু বুঝতে না পারলেও ঐ সকল তত্ত্বের রহস্য জানবার জন্য অমল উন্মুখ হয়ে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল।

লীনাও তার মনোভাব বুঝতে পেরে বিশদ্‌ভাবে তাকে বুঝিয়ে বলল, "এই আটটি সিদ্ধির অর্থ বুঝতে পারলেই বুঝতে আর তোর কোন কষ্ট হবে না, কি করে সতী দশমহাবিদ্যার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। অনিমা শক্তি প্রভাবে ঈশ্বর যে কোন সময় ইচ্ছামত যে কোন রূপ পরিগ্রহণ করতে পারেন। লঘিমা দ্বারা তিনি অতি সূক্ষ্মতম দেহধারণে সমর্থ। মহিমায় তাঁকে মহাশক্তিমান করে তোলে। প্রাপ্তিতে তিনি সর্বগুণাকর। প্রাকাম্য শক্তির প্রভাবে ঈশ্বর সকল দৃশ্যমান ও শ্রুতমান বস্তুর উপর ভোগের অধিকারী হন। সর্বজীবের উপর কর্তৃত্ব বা বিভূতি দেখিয়ে তাকে বশীভূত করা যায় যে শক্তির প্রভাবে, তাকে বলে ঈশীত্ব। বশীত্ব গুণের দ্বারা সত্ব, রজ ও তম গুণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, আর কামাবশায়িত্ব দ্বারা যে কোন শক্তির অধিকারী হওয়া যায়। সতী ঈশ্বরী—মহাপ্রকৃতি। তাই তাঁর পক্ষে দশ মহাবিদ্যার রূপ পরিগ্রহণ করা অসম্ভব হয়নি। সতী শুধু শিবকেই তাঁর বিভূতি দেখিয়ে আতঙ্কিত করেন নি। গিরিরাজ হিমালয়কেও তিনি তাঁর বিভূতি দেখিয়েছিলেন।"

অমল বিহ্বলাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "সে কখন ?"

লীনা বলতে লাগল, "সতীর দেহত্যাগের পর শিব শোকে বিহ্বল হয়ে উন্মাদের মত তাঁর প্রাণহীন দেহ কাঁধে করে ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের পরামর্শে শিবকে নিরস্ত করবার জন্য বাণ দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের বাহান্নটা জায়গায় সতীর দেহের অংশ পড়েছিল ; আর সেই সেই জায়গাগুলো 'বাহান্ন-পীঠ' নামে পরিচিত হয়েছে।

অমল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বলে, "কোথায় কোথায় আছে এই বাহান্ন পীঠ? তুমি আমায় বল, আমি ঘুরে ঘুরে দেখবো এই বাহান্ন পীঠ।"

"হেসে লীনা উত্তর দেয়, "অতই কি সোজারে! কতকগুলি পীঠ অবশ্য নাগালের মধ্যে—ভারতের নানা সমতল ভূমিতে। আবার কতকগুলি আছে দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে, যাওয়ার কোন রাস্তাই হয়তো নেই সেখানে।"

"তবুও তুমি বল। চেষ্টা করে তো দেখবো, কিছু তো দেখা হবে? এত বড় প্রেমময় যে ঠাকুর, প্রেমের জন্য যিনি মৃতা স্ত্রীর দেহ কাঁধে নিয়ে নানা দেশে, পাহাড় পর্বতে পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছেন, আর সেইসব পুণ্যভূমিগুলো দেখবো না? তিনি প্রেমের ঠাকুর, তিনি প্রাণময়, তিনি ভারতের নারী পুরুষ সকলের প্রাণের দেবতা।"

অমলের কথা কেড়ে নিয়ে লীনা বলে, "তার আর একটা রূপতো আবার দেখিসনি! তিনিই সংহাররূপী মহাকাল, তিনিই রুদ্র! দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে গিয়ে যখন সতী পৌঁছালো তখন তার বেশভূষা দেখে রাজা দক্ষ ক্রোধান্ধ হয়ে শিবের নিন্দা সুরু করে দিলেন। সতী স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সেখানেই দেহত্যাগ করলেন। খবর পৌঁছে গেল শিবের কাণে। আর যায় কোথা! শিব ত্রিশূল উঁচিয়ে নন্দী, ভৃঙ্গি ও আরো সব ভূত প্রেতদের নিয়ে চড়াও হলেন দক্ষালয়ে। তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে, দক্ষ ভয়ে আমন্ত্রিত রথী মহারথীদের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু শিবের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কার আছে! তিনি ত্রিশূল দিয়ে সকলকে ধরাশায়ী করে দক্ষের মুণ্ড ধরে টেনে আনলেন এবং তাকে বিনাশ করবার জন্য যেই ত্রিশূল তুলেছেন অমনি দক্ষের স্ত্রী শিবের সামনে নতজানু হয়ে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করলেন। মহাপ্রাণ শিব তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু যে মুখে দক্ষ তাঁর নিন্দা করেছিলেন সেই মুখকে শিব ছাগমুণ্ডে

পরিণত করলেন। কারো মতে, নন্দীর অভিশাপেই তার ছাগমুণ্ড হয়েছিল। তার পরেই ডান হাতে মহাত্রিশূল ও বাঁ কাঁধে সতীর দেহ তুলে নিয়ে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ প্রলয় নাচনে মেতে এগিয়ে চললেন তার মহা জগৎ-পরিক্রমায়—"

বাধা দিয়ে অমল বলে, "না না, তুমি আমাকে বাহান্ন পীঠের নাম বলে দাও, আমার আর সবুর সইছে না—বল।"

"বেশ বলছি। জানিস্‌তো, প্রত্যেক পীঠেই মায়ের মন্দিরের ধারে কাছেই থাকে শিবের মন্দির। শিবকে বলে ভৈরব আর মায়ের নাম ভৈরবী। প্রত্যেক পীঠেই ভৈরব আর ভৈরবীর আলাদা আলাদা নাম। শোন্ তবে—"

লীনা যেভাবে বাহান্ন পীঠের নামগুলি অমলকে বলল, হুবহু সেইভাবেই নীচে তা' তুলে দেওয়া হল। প্রথমে জায়গার নাম, পরে দেবীর কোন্ অংশ সেখানে পড়েছিল, পরে ভৈরবীর নাম ও সর্বশেষে ভৈরবের নাম ; যেমন—হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র। মায়ের নাম কোট্টবী ও ভৈরবের নাম ভীম লোচন। শর্করায় তিন চক্ষু, মোহিষমর্দিনী, ক্রোধীশ। সুগন্ধায় নাসিকা, সুনন্দা, ত্রম্বক। জ্বালামুখে জিহ্বা, অম্বিকা, উন্মত্ত। ভৈরব পর্বতে ওষ্ঠ, অবন্তি, নম্রকর্ণ। প্রভাষে অধর, চন্দ্রভাগা, বক্রতুণ্ড। জনস্থানে চিবুক, ভ্রামরী, বিরূপাক্ষ। গোদাবরী তীরে রামখণ্ড, বিশ্বমাতৃকা, বিশ্বেশ। গণ্ডকীতে ডান গণ্ড, গণ্ডকীচণ্ডী, চক্রপানী। অনলে উর্দ্ধদন্তপানি, নারায়নী, শংক্রুর। পঞ্চসাগরে অধোদন্ত, বারাহী, মহারুদ্র। করতোয়ায় বামকর্ণ, অপর্ণা, বামেশ। শ্রীপর্বতে ডানকর্ণ, সুন্দরী, সুন্দরানন্দ। কেশজালে কেশ, উমা, ভূতেশ। কিরিট কোণারে কিরিট, ভুবনেশী, সিদ্ধরূপ। শ্রীহট্টে গ্রীবা, মহালক্ষ্মী, সর্বানন্দ। কাশ্মিরে কণ্ঠ, মহামায়া, ত্রিসন্ধ্যা। রত্নাবলীতে ডানস্কন্ধ, শিবা, কুমার। মিথিলায় বামস্কন্ধ, মহাদেবী, মহোদর। চট্টগ্রামে ডানহাত, ভবানী, চন্দ্রশেখর। মানস সরোবরে অর্ধ ডান হাত, দ্রাক্ষায়নী, হর। উজ্জয়িনীতে কফোনী,

মঙ্গলচণ্ডী, কপিলাম্বর। মনিবেদে মণিবন্ধ, সাবিত্রী, স্থানু। প্রয়াগে দুহাতের আঙ্গুল, দশ মহাবিদ্যা, দশ। বাহুলায় বামবাহু, বাহুলা চণ্ডীকা, ভীরুক। মনিবন্ধে বাম মনিবন্ধ, গায়ত্রী, সর্বানন্দ। জলন্ধরে স্তন, ত্রীপুরমালিনী, ভীষণ। রামগিরিতে স্তন, শিবানী, চণ্ড। বৈদ্যনাথে হৃদয়, জয়দূর্গা, বৈদ্যনাথ। উৎকলে নাভি, বিজয়া, জয়। কাঞ্চীতে কাঁকালি, বেদগর্ভা, রুরু। কালমাধবে অর্ধনিতম্ব, কালী, অসিতাঙ্গ। নর্মদায় অর্ধনিতম্ব, শোনাক্ষী ভদ্রসেন। কামরূপে মহামুদ্রা, কামাখ্যা,রাবানন্দ। নেপালে ডানজঙ্ঘা, মহামায়া, কপালী। জয়ন্তায় বামজঙ্ঘা, জয়ন্তি, ক্রমদীশ্বর। ত্রিপুরায় দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরা সুন্দরী, ক্ষীর সাগরে দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ,যুগাদ্য,ক্ষীরখণ্ডক। কালীঘাটে দক্ষিণ পদের চার অঙ্গুলী, কালিকা, নকুলেশ। কুরুক্ষেত্রে দক্ষিণ পদের গুলফ, বিমলা, সীম্বত্ত। বিভাষেতে বামগুলফ, ভীমরূপা, কপালী। তিরোতায় বামপদ, অমরী, অমর। হিমালয়ে শূন্যশিঁর, শিব। বগুড়া সেরপুরে ভবানী, ভবানন্দ। বক্রেশ্বরে তিনটি পীঠের অনুমান করা হয়। পুরীতে বিমলাদেবী পীঠ। সীতাকুণ্ডে সতী, চন্দ্রনাথ।

লীনা অমলকে এবার বলে। "শুনলি তো?"

"হ্যাঁ শুনলুম।"

"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম? ও হ্যাঁ, গিরিরাজকে সতীর বিভূতী দেখানো। মহামায়া যখন দেখলেন শিব সতীর অবশিষ্ট মুণ্ডটি কোলে নিয়ে হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শিখরে বসে আমৃত্যুধ্যানে নিমগ্ন হয়েছেন, তখন তাঁকে বাঁচাবার জন্য তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে পার্বতী নামে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।

পার্বতী বড় হয়ে শিবকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গিরিরাজ কুপিত হয়ে তাকে ভৎসনা করেন। তখন পার্বতী গিরিরাজকে তাঁর আসল পরিচয় দিতেই গিরিরাজ নতজানু হয়ে তার স্বরূপ দেখতে চান।

পার্বতী তখন মহেশ্বরের রূপ ধারণ করলেন। মহাজ্যোতির্ময় এক বিরাট পুরুষ। মস্তকে তাঁর বিরাট জটা, কপালে চন্দ্র, বামহস্তে ত্রিশূল ও ডানহস্তে তিনি আশীর্বাদ করছেন। এই ভীষণ রূপ দেখে গিরিরাজ আতঙ্কে পার্বতীকে অন্য রূপ দেখাতে অনুরোধ করলেন।

পার্বতী তখন বিষ্ণুরূপ ধারণ করলেন। রাজপোষাকে ভূষিত বিষ্ণুর মাথায় সোনার মুকুট, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন তিনি। তাঁর গলায় সুন্দর মালা ঝুলছে, গা থেকে ভুর্ ভুর্ করে সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। গিরিরাজ হতবাক্ হয়ে এই বিরাট মূর্তিকে চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন। তিনি আরো দেখলেন, বিষ্ণুর দেহের চারদিকে শত শত হাত ঝুলছে, শত শত পা ও চক্ষুবিশিষ্ট শত শত মুখ দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর বিস্মিত ভাব দেখে এর পরেও পার্বতী তাঁকে আরো কয়েকটি রূপ দেখালেন।"

এই সময় তাকে বাধা দিয়ে অমল প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। নিজেদের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দেবতারা নানারকম বীভৎস রূপ ধরেন কেন?"

লীনা উত্তর দেয়, "প্রয়োজন বোধেই তাঁরা ঐসব বিভূতি দেখিয়ে থাকেন। তার কিছুটা আভাষ তো তুই পেলি। আবার কেউ কেউ অপরের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নানা রকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে দেন। আধুনিক কালে মানুষের মঙ্গলের জন্যও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বা মহাযোগী অনেক বিভূতি দেখিয়েছেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষ্যাপা—এঁদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস্?"

অমল উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তা' শুনেছি। আচ্ছা, একটা কথা—না থাক্, পরে জিজ্ঞাসা করব। তুমি বল।"

"সেই ভাল—পরেই জিজ্ঞাসা করবি। হ্যাঁ—তারপর বলি শোন্। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাধাকে কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করবার জন্য

জটিলা ও তার মেয়ে কুটিলাকে বনের মধ্যে কালীরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। তারা দু'জনেই এসে দেখে অবাক হয়েছিল যে, রাধা একাগ্রচিত্তে সেই কালীর সামনে বসে অতি ভক্তিভরে তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তাদের মন থেকে রাধার উপর তাদের সকল সন্দেহ দূর হয়েছিল।"

অমল প্রশ্ন করল, "কিন্তু কৃষ্ণ যখন স্বয়ং ভগবান, তখন তিনি রাধাকে এই পাপ প্রশ্রয় দিলেন কেন?"

আশ্চর্য হয়ে লীনা উত্তর দিল, "পাপ প্রশ্রয় কেন! রাধাতো কোন পাপ মন নিয়ে তাঁর কাছে আসতো না; ভক্তি-প্রেমের মাধ্যমে সে তাঁর ইষ্টদেবতার পূজায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। তার সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর প্রতি রাধাকে আকৃষ্ট করে।"

"সবই তো তর্ক-সাপেক্ষ।"

"না, তা, কেন? সবই নিশ্চিত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধ—পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। তিনি ছিলেন অবতারী।"

"অবতারীর অর্থ? অবতার তো জানি। কিন্তু অবতারী তো জানি না!"

"অবতার হচ্ছে, ভগবানের শক্তির অংশ যার মধ্যে বিদ্যমান ও প্রকাশমান। এই শক্তি কারও মধ্যে অর্ধেক থাকে, কারো মধ্যে সিকি পরিমাণ থাকে। এঁরা ঐশী শক্তির বশীভূত। কিন্তু অবতারী হলেন স্বয়ং ভগবান—ঐশী শক্তিই এঁদের বশীভূত।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার ঘনিষ্ঠতা হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নাবালক। ঐ বয়সে বহু অলৌকিক গুণের ও শক্তির অধিকারী ঐ নাবালক শিশুর মনে কোন পাপই আশ্রয় করতে পারে না।"

স্নিগ্ধ হেসে অমল উত্তর দিল, "আমি জানি। জ্ঞান আহরণের জন্যই তোমায় আমি ঐ প্রশ্ন করেছিলুম।"

লীনা সন্তুষ্ট হল। সে আরো বলল, "শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাঁর বিভূতি দেখিয়েছিলেন। অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের গুরু ও আত্মীয় বধকে মহাপাপ মনে করে ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনেক বুঝালেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু বধে কোন পাপ নেই। এতে দুঃখ করবারও কিছু নেই। সবই ভগবান করাচ্ছেন, অর্জুন শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। কর্মের ফল ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে কর্তব্য হিসাবে কার্য করে যাওয়াই উচিত। কিন্তু কোন উপদেশই অর্জুনকে টলাতে পারল না। কারণ, অর্জুন রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ মাত্র—মায়ামোহের বশীভূত।

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালেন। সে এক বিরাট ভয়াল মূর্তি। আকাশচুম্বি এই মহাজ্যোতির রামধনুতে সে মূর্তি উদ্ভাসিত হল। বিরাট চক্ষুগোলক ও দন্তবিশিষ্ট মুখবিবর যেন হাঁ করে পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গ্রহনক্ষত্রাদি যেন সেই মুখবিবরে লয় হয়ে যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে অর্জুন মহাত্রাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করে করজোড়ে তাঁর স্তব করতে লাগল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আরো বলল, 'হে কৃষ্ণ! তোমায় আমি প্রথমে ভেবেছিলুম তুমি দেবতা! কিন্তু এখন দেখছি তুমি দেবেশ! ভেবেছিলুম তুমি জগৎময় ব্যাপ্ত! কিন্তু এখন দেখছি জগৎই তোমার মধ্যে নিহিত! আমি তোমায় প্রণাম করছি, আমার উপর সদয় হও!'

অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর স্বাভাবিক রূপ ধারণ করলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন বোধেই অর্জুনকে তাঁর বিভূতি দেখিয়েছিলেন। আবার, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের তাগিদেও তিনি গরুড়কে নারায়ণ-রূপ দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মহাপ্রাণ রাবণও তার ইচ্ছানুযায়ী শ্রীরামচন্দ্রের দেহে নারায়ণের রূপ দর্শন করেছিলেন। এখন বুঝতে পারলি তো সব?"

দ্বিধাগ্রস্ত মনে অমল উত্তর দিল, "একটু জিজ্ঞাস্য থেকে যাচ্ছে যে?"

"কি, বল্‌না!"

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যখন সবকিছু, তাঁর ইচ্ছাতেই যখন সব কিছু হচ্ছে, তখন, অপরাধ করলে আমাদের পাপ হয় কেন? তিনিই তো আমাদের দিয়ে সব কিছু করাচ্ছেন? বিভূতি দেখাবারই বা প্রয়োজন হয় কেন?"

লীনা অমলের কথা শুনে হেসে ফেলল। সে ঠাট্টাচ্ছলে উত্তর দিল, "তুই ইচ্ছে করে জেনেশুনে অপরাধ করে বেড়াবি, আর দোষ হবে ভগবানের! মনের অগোচর পাপ নেই। না জেনে কোন অপরাধ করলে পাপ হয় না! এ সম্বন্ধে অনেক গল্পই তো তুই জানিস।"

"সে তো বুঝলুম। ধরো, আমি যদি অজান্তে আগুনে পা দিই, তাহলে কি আমার পা পুড়বে না?"

"নিশ্চয়ই পুড়বে। সেটা তো তোর অসতর্কতার ফল। ভগবান তো সে কথা বলছেন না। তিনি বলেন যে, তাঁর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে ফলাফলের বিচার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে আগুনে হাত দিলেও হাত পুড়বে না। কিন্তু মনের ততটা বিশ্বাস নিয়ে তুই কি পারিস আগুনে হাত দিতে?"

"না…তা অবশ্য—"

"না, তাই। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ভগবানের সৃষ্ট প্রাণিগণ যে নশ্বর দেহ অবলম্বন করে পৃথিবীতে জন্মালেন্ তা' হল অধিভূত। যিনি এই সব প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি হলেন অধিদৈবত বা হিরণ্যগর্ভ, আর, যিনি জীবদেহে সমস্ত কর্ম প্রবর্তন করেন ও ফলভোক্তা, তিনি হলেন অধিযজ্ঞ বা ভগবান স্বয়ং। সুতরাং এই জ্ঞান যার মনে উদয় হয়, সেই তার সব কাজের ফল ভগবান বা অধিযজ্ঞের উপর ছেড়ে দিয়ে সব কিছু করে যায়।"

তখন আবার অমল প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, ধরে নিলুম তাঁর উপর কাজের সব ভার অর্থাৎ ফল তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম

করলে তার ফল শুভ হয়। তিনি গীতাতেও ঐ কথা বলেছেন—ত্যাগেই আসল সিদ্ধি, ত্যাগই ধর্ম—ভোগে নয়। কিন্তু চণ্ডীতে ভক্ত ভোগের জন্য তার আকুল আকাঙ্খা জানাচ্ছে, যেমন—ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি ......, অর্থাৎ সুন্দরী স্ত্রী দাও। আবার বলছে—যশো দেহি, অর্থাৎ আমাকে ঐশ্বর্য দাও। পরক্ষণেই আবার বলছে—দ্বিষো যহি, অর্থাৎ, মা আমার শত্রু দিগকে দমন কর। এগুলো কি গীতায় বর্ণিত ত্যাগ ধর্মের বিরোধী নয়? একই ধর্মে দু'রকম ব্যাখ্যা থাকবে কেন?"

অমলের উক্তি শুনে এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁর অজ্ঞতা দেখে লীনা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। পরে ধীরে ধীরে সে তাকে বুঝিয়ে বলল, "তুই ভক্তের মুখ নিঃসৃত ঐ সকল আবেদনের অর্থ ঠিক বুঝতে পারিসনি। 'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্যানুসারিণীম'; এর অর্থ হলো—মা, আমার পত্নীকে আমার মনোরম ও অভিপ্রায়ানুসারিণী সহধর্মিণী কর, অর্থাৎ আমার সকল ধর্মানুষ্ঠানে সাহায্যকারিণী কর। কিছু না কিছু সদিচ্ছা, একটু না একটু দেবী প্রকৃতি মানুষ মাত্রেরই আছে। আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দেবী-প্রকৃতিরূপিণী ভার্যা যাতে মনোরমা হয় তাই এখানে প্রার্থনা করা হচ্ছে। মায়ের কাছে কোন জিনিস চাইতে বাধা নেই, তা যাই হ'কনা কেন। এতে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন প্রতিবন্ধক হয়না। যশো-দেহির অর্থ হল কীর্তিমান হয়ে যাতে মাকে পাওয়া যায় সেই বর দাও। আর, দ্বিষো যহি মানে ভক্ত প্রার্থণা করছে—'মা আমার শত্রুদিগকে হনন অর্থাৎ বিনাশ কর।' এই শত্রু কারা? এরা হ'ল সাধনার বিরোধী শত্রুসমূহ, অর্থাৎ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা, অহঙ্কার এই সব। এদের বলে ষড় রিপু।

এ ব্যাখ্যা ছাড়াও আরও একটা কথা বোঝবার আছে। মানুষ বড় চালাক। তাই, সে যখন দেখে, মাকে পাওয়া খুব সহজ কথা নয়, তখন প্রকারান্তরে সে তার ইচ্ছাকে জয় করবার চেষ্টা করে।

সে জানে—'যা দেবী সর্বভূতেষু, নারী রূপেন বা ধনরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমোঃ। এটাও 'চণ্ডী'রই শ্লোক। সুতরাং ভক্তি থাকলে পার্থিব পদার্থের প্রতি গভীর আসক্তিতেও মাকে পাওয়া যায়, কারণ, সর্বভূতেই তিনি বর্তমান। তাই, নারী, ধনদৌলত এইসব পাওয়াও মাকেই পাওয়া, অবশ্য মায়ের ভক্তের কাছে।"

একটু থেমে লীনা জিজ্ঞাসা করল, "—হ্যাঁ তখন মাঝপথে আমায় কি যেন জিজ্ঞাসা করবি ভাবছিলি?"

"ও, হ্যাঁ।···বলছিলাম— বামাক্ষ্যাপা তো কালীরূপ ধ্যান করেই সিদ্ধ হয়েছিলেন!"

"নিশ্চয়ই!" লীনা হাসতে থাকে।

"তুমি কি তাহলে বলতে চাও বামাক্ষ্যাপা শুধু 'মা মা' বলে' ডেকেই মায়ের দেখা পেয়েছিলেন? কোন তপ ধ্যান করতে হয়নি?"

লীনা উত্তর দেয় "একাত্মভাবে মনে প্রাণে ডাকাটাই তো তপ ধ্যান। ওটাকি সকলে পারে? রামকৃষ্ণদেবও মাকে শুধু মা মা বলে ডেকেই পেয়েছিলেন। নির্দিষ্টভাবে কোন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁকে পান নি—মনের ভক্তিই ছিল তাঁর একমাত্র পাথেয়। রামপ্রসাদও তাই- সঙ্গীতের মাধ্যমে মাকে ডেকেই তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই মায়ের সঙ্গে সাধারণভাবে কথা কইতেন। মায়ের কাছে আব্দার জানাতেন, আবার অভিমান করে কখনো মুখ বোজা করে বসে থাকতেন। বামাক্ষ্যাপা তো মায়ের উপর রাগ করে একদিন তাঁর দেহে প্রস্রাবই করে দিলেন।"

"ওমা! সেকি! ও আবার কি রকম ভক্তি! মা রাগ করেন নি? ইচ্ছে করলেতো মা ভীষণরূপ ধরে তাকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন।"

"হ্যাঁ, তা পারতো। তবে তার ভীষণরূপকে ভক্ত গ্রাহ্য ক'রলে তো? সে তো আর যে সে ভক্ত নয় যে, তার ভয় হবে! 'মায়ের

স্নেহে বিমুগ্ধ সন্তানই মায়ের চণ্ডিকামূর্তি দেখতে ভালোবাসে। কি ব্যবহারিক জগতে, কি সাধন রাজ্যে সব ক্ষেত্রেই মায়ের মঙ্গলময় হাতের পরশ অনুভব করে সে কৃতার্থ হয়। আনন্দময়ী চিন্ময়ীর বক্ষে নিরানন্দ বা ধ্বংস কোথায়। মায়ের সরল, ভয়হীন ছোট্ট ছেলেটি কি তাঁর ক্রোধমূর্তি দেখে ভয় পায়, না, সঙ্কুচিত হয়? সে আরো গভীর আবেগে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুইও তো ছোটবেলায় মায়ের কোলে মলমূত্র ত্যাগ করেছিস্। মা'কি কখনো রাগ করতেন?" লীনা উত্তর দিল।

কিছুক্ষণ কি ভাববার পর অমল জানতে চাইল, "মাকে তাহলে কি ভাবে ডাকতে হয়?"

"যেভাবে তোর মন চায়। ত্যাগেও মাকে পেতে পারিস, আবার ভোগেও মাকে পেতে পারিস। ভক্তিদ্বারা মনকে যে ভাবেই তৈরী করবি, সেই ভাবেই কাজ পাবি।"

"ঠিক বুঝতে পারলুম না। ভোগেও মাকে পাওয়া যায়?" বিস্মিতভাবে অমল জিজ্ঞাসা করে।

লীনা উত্তর দিল, "মনের তিনটি গুণ—সত্ব, রজ, তম। গুণও যেমন তিনটি, মনের গতিও তেমনই তিনটি—সাত্বিক, রাজসিক ও ও তামসিক। সাত্বিক মন সংসারে অনাসক্ত, ক্ষমাশীল ও দানশীল। কোন অসৎ কাজেই সে-মন সাড়া দেয় না। রাজসিক মন ভোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত। বিলাস, ব্যসন, যশ ও বৈভবের আকাঙ্ক্ষাই তার মধ্যে প্রবল। আর তামসিক মনের গতি সর্বদা নিম্নমুখী। সুতরাং দান ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে যেমন ভগবানকে লাভ করা যায়, তেমনি ভোগ, ব্যসন এমন কি পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেও ভগবানকে লাভ করা যায়।"

অমল বলল, "প্রথমটা না হয় বুঝতে পারলুম, কারণ, ঐটাই স্বাভাবিক গতি। কিন্তু আর দু'টি পথ ঠিক বুঝতে পারছি না, আর একটু খুলে বল।"

"আরো খুলে বলব? বেশ শোন্।—আগেই তোকে বলেছি শিবের মুখ থেকেই আগম শাস্ত্র নির্গত হয়েছিল। এই আগম দু'রকম —সদাগম ও অসদাগম। পঞ্চতত্ত্বে দেবতার পূজা করাই অসদাগম।"

"পঞ্চতত্ত্বটা কি?" অমল প্রশ্ন করে।

"পঞ্চতত্ত্বে পূজা মানে মদ, মাংস, নারী, মৎস ও তণ্ডুল দ্বারা যে পূজা নিষ্পন্ন হয়। আগম সংহিতায় শিব নিজমুখেই এই পঞ্চতত্ত্বে পূজার পদ্ধতির নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—কলিযুগে মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম ভুলে গিয়ে রাজসিক ও তামসিকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এইসব নিষিদ্ধ জিনিসের দ্বারা যারা আমার পূজা করে, তারা, ভূত, পিশাচ ও প্রেতে পরিণত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলেছেন পঞ্চতত্ত্বে পূজাও আবার বিধেয়।"

"কি রকম?"

"আগেই বলেছি মানুষ বড় চালাক। সুন্দর নরম দীর্ঘ পথে লক্ষ্যস্থলে পৌছানর চেয়ে সে কঠিন কণ্টকময় সোজা পথটিকেই বেছে নেয়। তাতে ফল তরান্বিত হয়। বৈদ্যনাথধামেও শিব আছেন, আবার, তারকেশ্বরেও শিব আছেন। উভয়স্থানেই ভক্তরা আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভের আশায় মন্দিরের সামনে 'হর্তা' দেয়। কিন্তু বৈদ্যনাথে যে কাজ এক বা দু'মাসে সম্পন্ন হয়, তারকেশ্বরে সে কাজ সাতদিনে এমন কি একদিনেও সম্পন্ন হয়।"

"তার কারণ?" কৌতুহলে অমল জানতে চায়।

"তার কারণ—বৈদ্যনাথে 'হর্তা' দিয়ে ভক্তরা দু'বেলা পূজার নৈবেদ্য ফলমূলাহার করতে পারে। কিন্তু তারকেশ্বরে একবার 'পড়লে' যতক্ষণ বা যতদিন ফল না পাবে ততদিন নির্জলা উপবাস করতে হয়। কাজেই ফলও ত্বরান্বিত হয়। সেই জন্য জপ, তপ, ধ্যানের মাধ্যমে দেবতার দর্শন পাওয়া খুবই সময় সাপেক্ষ। কারণ সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করে মনকে কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। ধীরে ধীরে এ কাজ অগ্রসর হয়। শত্রুকে সামনে পেলে যেমন.

তাকে বিনাস করে লক্ষ্যস্থলে পৌছান যায়, কিন্তু শত্রু যদি আড়ালে থাকে তবে তাকে বিনাস করা খুবই কষ্টকর। অথচ তাকে বিনাস না করলে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগানোও যায় না! সেই রকম—লোভ, মোহ, কাম এদের জয় করতে না পারলে কেউ দেবতার নিকটবর্তী হতে পারেনা। কাজেই ষড় রিপুকে দমন করতে হলে তাদের প্রভাবের মধ্যে গিয়েই তাদের ধ্বংস করতে হবে। তাই পঞ্চতত্ত্বে পূজাও বিধেয়। তখন নিজ ভোগ স্তম্ভন করে এই সব নিষিদ্ধ জিনিসগুলির প্রতি কোন স্পৃহা না রেখে, নারীকে ভৈরবী বা শক্তিরূপে গ্রহণ করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সব কিছু অর্পণ করতে পারলেই অসদাগম সদাগমে পরিণত হয় এবং সাধক দোষ মুক্ত হয়।"

অমল প্রতিবাদ করে বলে, "কিন্তু মদ্যপানে আসক্ত হয়ে এবং নারী সম্ভোগের মাধ্যমে ভোগ স্তম্ভন হয় কিভাবে?"

"মদের ব্যবহার তো শুধু মনকে বাইরের চাঞ্চল্য থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে আনবার জন্য, যাতে পারিপার্শ্বিক কোন কিছুর দ্বারা সে প্রভাবান্বিত না হয়। সেই জন্য অনভ্যস্ত হলেও এই সময় মদ খেয়ে কেউ মাতলামি করে না। কারণ, নেশা করবার জন্যই তো সে মদ খায় না। সেই জন্যই একে বলে 'কারণ বারি'।"

"আর ভৈরবী?"

লীনা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, "সব বলছি। সাধক যখন নারীকে শক্তি বা ভৈরবীরূপে গ্রহণ করে তখন সেই নারী সাধারণতঃই তার স্ত্রী হবে। স্ত্রী সম্ভোগে দোষ নেই। তবে এই সম্ভোগও বিশেষ ধরণের। সম্ভোগ আচার নানা রকমের। পশ্বাচার, দানবাচার নরাচার আর দেবাচার। সদাগমে দেবাচার প্রশস্ত। অন্য আচার অসদাগম।"

"দেবাচারের ব্যাখ্যা কি?"

লীনা এই সময় একবার অমলের দিকে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে তাকে ব্যাখ্যা করে বলে, "সম্ভোগের সময় উভয়ের মন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। তখন উভয়েই বীর্য স্তম্ভন করে দেবতা

উদ্দেশ্যে তাদের সেই কেন্দ্রীভূত মনকে প্ররোচিত করে। তখন সেই বীর্য নিম্নাভীমুখী না হয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলে। মূলধার থেকে কুলকুণ্ডলিনী উর্ধমুখী হয়ে ষট্চক্র ভেদ করে সহস্রারে অর্থাৎ মস্তিষ্কে গিয়ে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। একেই বলে শিব প্রাপ্তি —পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন। ব্যস! সাধকের সাধনা এইখানেই সিদ্ধিলাভ করে। তবে একদিনেই কি হয়, অভ্যাসের দ্বারা সফল হতে হয়।"

অমল জানতে চায়, "ষট্‌চক্র কি?"

লীনা উত্তর দেয়, আমাদের এই দেহে ছ'টি মণিস্থান আছে। এক একটি মণিস্থানে এক একজন দেবতার আসন কল্পনা করা হয়। মলদ্বারের ঠিক উপরেই হল মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধীস্থান, নাভিতে মণিপুর, বক্ষে অসাহত, কণ্ঠে বিশুধাক্ষ্যা, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে প্রজ্ঞাচক্র বা আজ্ঞাচক্র আর ব্রহ্মতালুতে সহস্রার। সহস্রারে শিবের অধিষ্ঠান।"

একটু চুপ করে থেকে লীনা পুনরায় বলতে লাগল, "একটু একটু করে তো তোকে সবই বললুম। আর দেরী করিসনে, সময় বয়ে যায়। মা যে তোর হাতে পূজা পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন! এই তো শুভক্ষণ! এই সময় তাঁকে একবার বাঁধতে পারলে আর পালাতে পারবেন না।"

এই কথা শুনে অমল যেন কি রকম হয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে একবার লীনার দিকে চাইল। সে চাহুনিতে যেন অসহায়তার ভাব ফুটে উঠল। আকুলভাবে সে বলে উঠল, "লীনা, আমায় তুমি পথ দেখিয়ে দাও—আমায় তুমি উদ্বুদ্ধ করে তোলো—মনে শক্তি এনে দাও!"

লীনা বুঝতে পারল, ক্ষেত্র প্রস্তুত; আর দেরী করা ঠিক নয়। সে একবার সোজা হয়ে বসে অমলের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে এক স্নিগ্ধ মোহময় জ্যোতি ফুটে উঠল। সে জ্যোতিতে উত্তাপ নেই,

কাঠিন্য নেই—আছে এক স্বর্গীয় স্নিগ্ধ অনুভূতি, যা' মন প্রাণকে মাতিয়ে তোলে। গম্ভীর অথচ শান্ত মেজাজে সে আদেশের সুরে বলল, "মুখ তোল্—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ্ !"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অমল আদেশ পালন করে লীনার মুখের দিকে তাকাল। কী সে দৃষ্টি! মনে হল তার চোখ থেকে একটা তীব্র আলোর পরশ যেন অমলের দেহে সঞ্চালিত হচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যেই সে আবিষ্ট হয়ে পড়ল। বিহ্বলভাবে সে বলে উঠল, "লীনা। লীনা! তোমার চোখ থেকে একটা দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে যেন আমার দেহে প্রবেশ করছে! আমার মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—প্রাণ আমার ভরে উঠেছে কিসের এক চাঞ্চল্যে! একি হল! আমি যে আর ঠিক থাকতে পারছি না—আমায় পথের নিশানা দাও লীনা!"

লীনা এই সময় চক্ষু মুদ্রিত করল।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর সে পুনরায় চোখ মেলে তাকাল। তবে তার চাহুনিতে আর পূর্বের সে তেজ নেই। তাকে দেখেও মনে হল, সে যেন যথেষ্ট নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই হয়। সম্মোহিনী শক্তি প্রভাবে কেউ কারো উপর প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করলে সাময়িকভাবে সে কিছুটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল, "যা, ঘরে যা"।

"যাবো?"

"হ্যাঁ।"

লীনা তার হাতখানি তুলে ধরতেই করজোড়ে অমল মস্তক অবনত করল।

পরক্ষণেই সে উঠে গেল। লীনা তার গমনপথের দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল।

দশ

প্রতিদিনকার মত সেই দিন সকালেও মালতিদেবী জলখাবারের থালাটি হাতে করে অমলের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন সে বিছানার উপর বসে হাত দু'টো কোলের উপর রেখে চোখ বুঁজে রয়েছে।

একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে মালতিদেবী খাবারের থালা ও জলের গ্লাসটি টেবিলের উপর রেখে নিকটে এসে ডাকলেন, 'হ্যাঁরে! জলখাবারটা খেয়ে নে! বসে বসে কি মাথামুণ্ডু সব ভাবছিস? নে, উঠে আয়।"

মায়ের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙ্গে অমল চোখ খুলে তাকাল।

মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি অত ভাবিস বলত?"

"কৈ? নাতো?" বলেই অমল মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মা, পরম শক্তিরূপিণী মহামায়া তো সব জায়গায় সব সময়েই আছেন? তাই নয়?"

"হ্যাঁ, তাতো আছেনই। কেন? সে কথা কেন?" মালতিদেবি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

"এই ঘরেও আছেন?"

"আছেন বৈকি।"

"আমরা তাঁকে দেখতে পারি?"

"মনে ভক্তি থাকলেই পাবি। কিন্তু এখন ঐসব কথা কেন তোর মনে আসছে?"

মালতিদেবীর একথার কোন উত্তর না দিয়ে অমল চুপ করে রইল।

বস্তুতঃ, অমলের এই প্রকার প্রশ্নে মালতিদেবীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাঁর দূরাদৃষ্টের কথা ভেবে মন তাঁর হাহাকার করে

উঠল। বড় সাধ করে একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি সুন্দর বউ ঘরে এনেছিলেন। মনে ভেবেছিলেন সাধ মিটিয়ে স্বামী পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে তিনি ঘর করবেন। কিন্তু ভগবান তাঁর সে সাধে বাদ সেধেছেন। অন্য কিছু নয়--এই ভগবানে আত্মসমর্পণ করে বৌমা তার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে সংসার ছেড়ে মন্দিরবাসিনী হয়েছে। আবার আজ ছেলের মুখে সেই ভগবানের সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রশ্ন! যাঁর নামে পৃথিবীর নর-নারী পাগল, আজ সেই মধুর নাম শুনে মালতি-দেবীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। মায়ের স্নেহ, যে স্নেহের সঙ্গে মনের অপর কোন বৃত্তির বা অপর কোন নারীপুরুষের স্নেহের তুলনাই হয় না। কোন বৃত্তি বা কোন স্নেহই বাস্তব রূপ ধরে দেহের বাইরে কখনো আত্ম প্রকাশ করে না। কিন্তু ছেলে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বক্ষণেই মায়ের স্নেহ এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে সেই স্নেহ বাস্তব রূপ ধরে দুধের আকারে মায়ের স্তনে জমা হয় যাতে ভূমিষ্ঠ হবার পর জীবন ধারণের জন্য নবজাতকের কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়। অথচ অন্য কোন সময় কোন অবস্থাতেই মায়ের স্তনে দুধের যোগান আসে না। এমনও শোনা গেছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন জাতকের মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং তার পিতা তার মায়ের স্থান পূর্ণ ক'রে সেই শিশুকে বুকে তুলে নেয়। তখন পিতার মনেও তদ্রূপ মাতৃস্নেহের প্রাবল্য দেখা দেয়। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন পর সেই পিতার দেহের কোন বিশেষ অংশে স্তনের সঞ্চার হয়ে তাতে মাতৃস্তনের অনুরূপ দুধের যোগান ঘটে। এখানেও সেই মাতৃস্নেহরূপ বৃত্তিরই বিকাশের নজির দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং মাকে সেই বিশ্বপ্রকৃতিরূপা মহামায়ার সঙ্গে তুলনা করাও বোধহয় অসমীচীন নয়। তাই সন্তানের মুখে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি শুনে মালতিদেবীর মন উদাস হয়ে পড়ে। হয়তো সময় বিশেষে এই 'অসামঞ্জস্যপুর্ণ' উক্তিই মনে তাঁর গভীর আনন্দ সৃষ্টি করত। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

মুখে কোন কিছু প্রকাশ না করে মালতিদেবী পুনরায় ছেলেকে

তাগাদা দিলেন, "নে, খাবারটা খেয়ে নে—আমি ততক্ষণে চা-টা করে নিয়ে আসি।"

"খাচ্ছি, তুমি যাও না।"

"মালতিদেবী দ্বিরুক্তির না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে তিনি দরজার কপাট দু'খানা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

মা চলে গেলে অমল একবার ঘরের চারদিক দেখে নিল। পরক্ষণেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলে সংরক্ষিত খাবারের থালাটির উপর।

হঠাৎ অমলের ভাবান্তর উপস্থিত হল।

সে ঝটিতে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল। তার বিহ্বল দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ালের ঝুলায়মান কালীর ফটোটির উপর এক সময় নিবদ্ধ হল। একটি মুহূর্ত সেইদিকে তাকিয়ে থেকে পরক্ষণেই সে জলখাবারের থালাটির দিকে ফিরে তাকাল এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্য থেকে সে একটি সন্দেশ তুলে নিয়ে ত্বরিৎপদে কালীর ফটোটির নীচে এসে দাঁড়িয়ে আব্দারের সুরে বলল, "নে মা, খা।"

মা কিন্তু তার কথায় কোন ভাব প্রকাশ না করে একভাবে তার দিকে তাকিয়েই রইলেন।

অমল কিন্তু মায়ের এই প্রকার নীরবতায় নিরুৎসাহিত না হয়ে পুনরায় তাঁকে খাবার জন্য বায়না ধরল, "নে মা, খা'।" চিরপরিচিত কথা। আজ পর্যন্ত যারাই মাকে খাওয়াতে পেরেছে বা যারাই খাওয়াবার চেষ্টা করেছে, সকলের মুখেই ছিল ঐ একই আকুতি 'মা খা'। মনে হয় মায়ের কাছে আব্দারের ঐ একটাই সুর। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

কিন্তু অত সহজেই তো আর মা খান না! তাঁকে খাওয়াতে হলে আরো গভীরভাবে বলতে হয়। হয়তো অমলের ততখানি আগ্রহ নিয়ে বলা হচ্ছে না মনে করেই মা এখনও নিরুত্তর। আর একটু নিবিড়ভাবে ডাকতে পারলেই বোধহয় তিনি শুনতে পাবেন। অমল

এই সোজা কথাটি বুঝতে পেরেই এবার অতিশয় বিনীতভাবে তাঁকে ডেকে বলল, "শুনতে পাচ্ছিস না মা? সন্দেশটা খেয়ে নে না?"

ঠিক এই সময় চায়ের কাপ হাতে করে মালতিদেবী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে অমলকে তদবস্থায় দেখলেন। অমল তখনও বলে চলেছে,"—খাবি নে তো? তুই না খেলে কিন্তু আমিও খাবনা।"

"অমল?"

অমল ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা। হাতে তার চায়ের পেয়ালা।

মালতিদেবী প্রশ্ন করলেন, "কি হচ্ছে বাবা!"

কি বলবে ভেবে না পেয়ে অমল উত্তর দিল, "দেখনা মা, এই মা আমার হাত থেকে কিছুতেই সন্দেশটা খেতে চাইছে না।"

"ওইভাবে কি আর মা খেতে পারেন? উনি হচ্ছেন জগন্মাতা। কিন্তু তোর নিজের মা উপোস থাকতে কি জগতের মা খান রে? তোর নিজের মাকে খাওয়ালেই ওঁর খাওয়া হয়।"

"ও! তাই বুঝি? বেশ, তুমি খাও মা!" অমল মালতিদেবীর দিকে এগিয়ে এল। মালতিদেবী তাঁর এই উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লেগেছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "বেশ তো, নিশ্চয়ই খাবো। ছেলে না খেলে কি মা খেতে পারে? তুমি আগে খেয়ে পরে আমায় খাইয়ে দাও।"

অমল যেন পথের নিশানা পেল। তাড়াতাড়ি সে টেবিলের কাছে গিয়ে গোগ্রাসে খাবারগুলি খেয়ে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মায়ের মুখের কাছে ধরে বলল, "মা খাও!"

মালতিদেবী দ্বিরুক্তর না করে ছেলের হাত থেকে সন্দেশটি মুখে তুলে নিলেন।

মহানন্দে অমল বলে উঠল, "মা, তুমি রোজ এমনি করে খাবে?"

"তুই খাইয়ে দিলেই খাব।" বলতে বলতে মালতিদেবীর ছ'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তাঁর ছ'গণ্ড বেয়ে।

অমল মায়ের চোখে জল দেখে বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করল, "মা, তোমার চোখে জল কেন?"

"কৈ? নাতো বাবা।" বলে তিনি বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছে ফেললেন। পরন্তু, তাঁর এই চোখের জলে কিসের ইঙ্গিত! একি শুধু আনন্দাশ্রু? না, কোন কিছু বিপদাশঙ্কা করেই তাঁর এই চোখের জল! কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আর আজ কে দেবে!

মালতিদেবী এবার ছেলেকে আদর করে বললেন, "এবার তো আমি খেয়েছি বাবা! তুমি এবার চা-টা খেয়ে নাও, আমি বসে বসে দেখি। নইলে মায়ের মনে তো কষ্ট হবে বাবা! এই নাও চা'।" তিনি পেয়ালাটি এগিয়ে দিলেন।

অমলও অতি আগ্রহে মায়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটি তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিল।

চা খাওয়া শেষ হলে অমল নিজের মনেই একবার বলল, "জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী! মা, তাহলে তোমাকে পূজা করলেই তো আমার মহামায়াকে পূজা করা হবে। তাই নয় কি?"

"সে তো একশোবার। কিন্তু তার উপরেও যে আছে বাবা—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমন্তপ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পরশুরাম পিতা জগদগ্নি ঋষির আদেশে কুড়ুল দিয়ে মায়ের মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। সেইজন্যই তাঁর নাম পরশুরাম। পরশু মানেই কুড়ুল।"

"জানি মা! আর সেই পাপের জন্যই পরশুরামের হাত থেকে সে কুড়ুল কখনও আলাদা হয়নি। ভগবানের অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে কেন যে তিনি এ ভুল করেছিলেন, বুঝতে পারিনা মা।"

"তাই হয় বাবা। মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করলেও ভগবানকে মানুষের নিয়মই মেনে চলতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কি জানতেন না

যে তাঁর ব্যাধের হাতেই মৃত্যু হবে ? জেনেশুনেও তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কেনই বা গাছে উঠে পা ঝুলিয়ে থাকবেন ! আর তাঁর সেই রাঙ্গা টুকটুকে পা দুখানি দেখে কেনই বা ব্যাধ কোন পাখি মনে করে ভুল করে তাঁকে তীর ছুঁড়ে মারবে, এযে হতেই হবে।" মালতি দেবী ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

"তাই বলে মাতৃহত্যা !" অমল তার মনের সংশয় প্রকাশ করে।

মালতিদেবী তাকে পুনরায় বললেন, "পরশুরাম তো নিজের বিচার বলে এ কাজ করেননি ; তাহলে এটা তাঁর মহাপাপই হতো। পিতার আদেশেই তিনি এ কাজ করেছিলেন--পাপপুণ্যের বিচার তখন তিনি ভেবে দেখেননি,। সব পুত্রেরই পিতার প্রতি পরম ভক্তি থাকাই বিধেয়। কারণ পিতার স্থান যে সকলের উপরে বাবা ! দেব দ্বিজে ভক্তি রেখে তুমিও সুখে সংসার করছ দেখতে পেলেই তাঁর আনন্দ হবে। তাতেই যে সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয় বাবা ! তোমার কর্তব্য যেন তুমি কখনও বিস্মৃত হয়োনা। আমি তোমায় এই আশীর্বাদই করছি।" বলে মালতিদেবী চোখ মুদ্‌লেন।

ধীরে ধীরে কুণ্ঠিতভাবে অমল ডাকল "মা !"

"কি বাবা !" মালতিদেবী মুখ তুললেন।

অমল বলল, "আমাদের শাস্ত্রেই আছে শৈশবের প্রারম্ভেই ছেলেরা গুরুগৃহে গিয়ে শাস্ত্রাদি পাঠের জন্য জীবনের একটা বড় অংশ সেখানে কাটিয়ে দিত। তার পরের অধ্যায় গার্হস্থ জীবন এবং শেষাবস্থায় বানপ্রস্থ অবলম্বন। আধুনিক যুগে আর গুরুগৃহে অবস্থান না করে পিতৃগৃহে থেকেই ছেলেরা পাঠ্যজীবন কাটিয়ে দেয়। বিয়ের পরও দেখা গেছে অনেকে লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত। সুতরাং আমারও তো এখনও জ্ঞানস্পৃহা সম্পূর্ণ হয়নি মা। আমি তোমাদের কাছে আর কিছুদিন সময় চাইছি। বল আমার ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করবে ?"

মালতিদেবী মনে মনে আশঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কি

বলতে চাইছিস তুই ? আমি তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না— একটু পরিষ্কার করে বল্ ?”

মায়ের কথার উত্তরে অমল সঙ্কুচিতভাবে বলল, “মা, আমার মন বলছে, আমি একবার জগন্মাতাকে প্রাণ খুলে ডাকবো। কিন্তু তাতে তো তোমার আশীর্বাদ দরকার হবে মা !”

মালতিদেবী নিমেষে বুঝতে পারলেন তাঁর কপাল পুড়েছে। কিছুদিন থেকেই তিনি ছেলের হাবভাবে কিছু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু সেই পরিবর্তন যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, তা তিনি তখন অনুমান করতে পারেননি। কিন্তু এখন ছেলের এই কথায় তাঁর চোখের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। এক্ষেত্রে ছেলেকে উপদেশ দিয়ে এপথ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। কারণ, এই পথে মন একবার সাড়া দিলে জগতের কোন শক্তিই তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। আর এইটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে, যারাই এ পথের অভিযাত্রী হয়, তারাই অধিকতর মাতৃভক্ত হয়। এতে মনে হয় গর্ভধারিণী মাকে নিবিড়ভাবে পেলেই বোধহয় জগন্নামাতার হদিস পাওয়া যায়।

মালতিদেবীর আরো মনে পড়ল নদীয়ার নিমাইয়ের কথা। তিনিও মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁরও যখন ‘ডাক’ পড়েছিল, তিনিও তখন মা শচীর নিকট এইভাবেই প্রথমে তাঁর অনুমতি ভিক্ষা করেছিলেন। মোহের বশবর্তী হয়ে শচীমাতা ছেলের সে অনুরোধে কান দেন নি। উপরন্তু ছেলের মনকে বাঁধবার জন্য তিনি অচিরে ছেলের বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু এত করেও কি তিনি সেই ছেলেকে বাঁধতে পেরেছিলেন ! এ যে কখনও হয় না—এ এক আলাদা উপলব্ধি, আলাদা আকর্ষণ ! তাই এক গভীর রাতে বিষ্ণুপ্রিয়া যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সুযোগে নিমাই গোপনে কিসের এক অজানা আকর্ষণে সব কিছু ছেড়ে রাতের অন্ধকারে মিশে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও ঠিক সেই

পরিস্থিতির আশঙ্কা করেই মালতিদেবী বুঝলেন ছেলেকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাই হৃদয়কে কঠিন করে একবার শেষ চেষ্টা হিসেবে তিনি ছেলের কথার উত্তরে বললেন, "তা বাবা, আমি আশীর্বাদ করলে ঘরে বসেও কি ওকাজ হয়না ?"

"বাইরে থেকেই তো ঘরে আনতে হবে মা ! আমার মন বলছে আমার বেশী দেরী হবে না। আমি আবার তোমার কোলেই ফিরে আসবো।"

"কিন্তু কর্তার বা বৌমার'ও তো একটা মতমত আছে ?"

অমল আব্দারের সুরে বলল, "তুমিই সব ঠিক করে নিও ! বল, নেবে ?"

সুন্দর ব্যবস্থা ! যাকে বোঝান সব চেয়ে কঠিন কাজ, তাকে দিয়েই অপরকে বোঝাবার চেষ্টা। অভিনব যুক্তি !

কিন্তু মালতিদেবী মনে মনে ভাবলেন, এখন দুর্বলতা প্রকাশের সময় নয়। একটু সময় পেলে হয়তো ছেলের মনের এই সাময়িক অবস্থার পরিবর্তনও হতে পারে। তাই তিনি বললেন "বেশ তো বাবা ! সময় হোক্, তখন আমিই তোকে সঙ্গে কবে যেখানে তোর ইচ্ছা নিয়ে যাবো। এখন ওসব কথা থাক্। তার চেয়ে বরং সইয়ের বাড়ীটা একবার ঘুরে আয়। এ ক'দিন আর তাদের খবর'ও পাইনি। আমি দয়ালকে পাঠিয়ে দিই, চায়ের কাপগুলো সরিয়ে নেবে।"

বলেই তিনি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অমল একবার দেওয়ালে মায়ের ফটোর উপর চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে এসে বিছানার উপর বসল। তার মন তখন কি এক ভাবে বিভোর। পার্থিব কোন কিছুর উপর যেন তার আর কোন আগ্রহ নেই। তার মন কি যেন চায়। কি এক উত্তেজনায় যেন তার মন দোলায়িত হয়ে উঠেছে।

কতক্ষণ যে সে এইভাবে ছিল তা সে জানে না। হঠাৎ কিসের

শব্দে তার চমক ভাঙ্গতেই সে দেখতে পেল ভৃত্য দয়াল টেবিলের উপর থেকে খাবারের থালা ও চায়ের কাপ-ডিস্‌গুলি তুলে নিচ্ছে।

যাবার আগে দয়াল অমলের দিকে কটাক্ষ করে অগ্রসর হতেই অমল ডাকল "দয়াল !"

"দাদাবাবু !" বলে দয়াল থম্‌কে দাঁড়াল।

"মা কোথায় রে ?"

"এজ্ঞে···এই তো একটু আগে বাগানের মন্দিরের দিকে গেলেন। আমাকে বললেন আপনার ঘর থেকে এগুলোকে নিয়ে যেতে। তা', মাকে কি ডেকে দেবো ?" দয়াল জিজ্ঞাসা করল।

অমল বলল, "না। ··আচ্ছা তুই যা।"

দয়াল বেরিয়ে গেল।

এদিকে মালতিদেবী দয়ালকে অমলের ঘরে পাঠিয়ে নিজে চললেন বাগানের দিকে। উদ্দেশ্য—বৌমাকে অমলের মনান্তরের কথাটা জানিয়ে যদি তার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়। হাজার হোক, স্বামী বলে কথা। হয় তো সব কথা শুনে সেও চেষ্টা করতে পারে স্বামীর মন ফেরাবার জন্য। অনেক কিছু আশা নিয়ে তিনি এসে পৌঁছালেন মন্দিরের কাছে।

পদশব্দ বুঝতে পেরে লীনাও ইতিমধ্যে মন্দির থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

"এই যে বৌমা। একি ! তোমার এমন চেহারা হয়েছে কেন ? মনে হচ্ছে যেন কতদিনের রোগী ? কি হয়েছে মা ?" সন্দেহে মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

মাথা নেড়ে লীনা জানাল তার কিছু তো হয় নি !

"বস মা। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলুম। এস, বস এইখেনে।" বলে মালতিদেবী নিজেও পাথরের উপর বসে পড়ে তার পাশে হাত দিয়ে একটু মুছে দিলেন।

একটু হেসে লীনা ধীরে ধীরে এগিয়ে মালতিদেবীর ঠিক পাশে

এসে বসল। মালতিদেবী একবার তাকে ভাল করে দেখে আস্তে আস্তে বললেন, "একটা কথা তোমায় জানাতে এলুম বৌমা। আজ কিছুদিন হল অমুর হাবভাব আমার মোটেই ভাল ঠেকছিল না। সব সময় কি এক চিন্তায় যেন ওর মন উদাস হয়ে আছে। মুখে আর মোটেই সে হাসি নেই—সর্বদাই যেন একটা মনমরা ভাব। তার উপর এই একটু আগে সে যে কথা আমায় বলেছে তাতে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।"

এইটুকু শুনে লীনা ভ্রুকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসুনেত্রে একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মালতিদেবী তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে আশান্বিতা হলেন। তিনি পুনরায় ধীরে আজ সকালের সকল ঘটনা তার গোচরীভূত করলেন। শেষে তিনি আরো বললেন, "আমার তো ব্যাপারটা মোটেই ভাল বলে মনে হচ্ছে না। এখন তোমার কাছে সে তো প্রায়ই আসে, কথা কয়। শুনেছি তুমিও তার সঙ্গে কথা কও। তাই বলছিলুম, তুমি যদি মা তাকে একটু বুঝিয়ে বল!"

লীনা এই প্রথম শাশুড়ীর কথার উত্তর দিল। সে বলল, "যে কাজ আপনি পারেন না, সে কাজ কি আমি পারব মা?"

"কেন পারবে না। আর তারও তো তোমার উপর…এই কি বলে… যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। তুমিই পারবে মা।"

"আর; তাঁর যদি ঐ দিকেই মন চায় তাতেই বা ক্ষতি কি?" লীনা উত্তর দিল।

চমকে উঠে মালতিদেবী বললেন, "সে কি কথা মা! আমার ওই একরত্তি সম্বল মা; সেও যদি সংসার ছেড়ে চলে যায় তাহলে আর আমি কিসের আশায় বেঁচে থাকবো। বড় সাধ করে তোমায় ঘরে এনেছিলুম মা। তুমিও ঘর ছেড়ে চলে এলে। ওও যদি চলে যায় তাহলে আর রইল কি!" আবেগে মালতিদেবীর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। বস্ত্রাঞ্চলে তিনি চোখ মুছলেন।

"না মা, ফিরে সে আসবেই। তাই যদি না হয়, তবে আর আমি

এই মন্দিরে পড়ে আছি কেন? ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই তো আমার এই কৃচ্ছ্রসাধন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা, ঘরে যান্।"

লীনার এই কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে মালতিদেবী বিস্ফারিত নেত্রে একবার তার দিকে তাকালেন। বৌমার মুখে আজ এ কিসের ইঙ্গিত! কিছু বুঝতে না পেরে তিনি লীনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বললে বৌমা! ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই তুমি আজ গৃহছাড়া! তুমি কি তবে ওর ব্যাপার আগেই বুঝতে পেরেছিলে?"

"আজ আর নয় মা, সময় হলে আপনি সবই জানতে পারবেন। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবার ভয়েই আমায় আজ মুখ খুলতে হল।"

"তাই যদি বললে, যখন কথাই বলেছ তখন ঘরে ফিরে চল মা। হঠাৎ শরীর তোমার বড়ই ভেঙ্গে পড়েছে। আমার কথা রাখবে না?" মালতিদেবীর শেষের কথাগুলো বড়ই করুণ।

উত্তরে লীনা বলল, "এখনও তো সময় পূর্ণ হয়নি মা! এখনও কিছুদিন বাকী আছে। শুধু শুধু ব্যস্ত হবেন না! ওঁকে ফেরাবেন না। আমি উঠি, আর নয়।" বলে লীনা উঠে মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেল।

মালতিদেবী একবার লীনার গমন পথের দিকে তাকিয়ে দেখে ধীরে ধীরে উঠে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর অজান্তেই যেন বেরিয়ে গেল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ভৃত্য দয়াল যথারীতি ফুলের সাজি ভরে নানারকম ফুল নিয়ে মন্দিরে এসে ডাকল, "দিদিমণি গো, দেখো আজ কত বড় বড় রক্ত জবা এনেছি। বাবাকে আজ ভাল করে সাজাও দিকি! তোমার হাতে ফুল বিল্বিপত্তর পেয়ে বাবার আমার খুব আনন্দ। এমন ধারা আর কে পূজা করে বল?"

লীনা মুখ তুলে স্নিগ্ধভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আমার হাতের ফুল পেয়ে বাবার খুব আনন্দ—তুমি কি করে জানলে?"

কি করে জানল বা লীনার এই প্রশ্নের উত্তরে দয়াল কি উত্তর দেবে সে সব তো পরের কথা। লীনার এই আচম্বিত প্রশ্নে প্রথমত যে বিভ্রাটটি ঘটে গেল সেটা হল দয়ালের আকস্মিক মানসিক প্রতি-ক্রিয়া। দয়াল প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে এতদিন লীনার ফুল জুগিয়ে আসছে। প্রতিদিনই সে এখানে একক বক্তা। কিন্তু আজ ঘটনার বৈচিত্র্যে সে ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তবে যে এতদিন সে জেনে এসেছে বৌরাণী তার বাক্‌শক্তি বিহীনা! তার এই প্রথম বিশ্বাস হল ভক্তিমনে ভগবানকে ডাকতে পারলে অন্ধও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। এতদিন এই মন্দিরে পড়ে থেকে কায়মনোবাক্যে ভগবানের আরাধনা করেই দিদিমণি তার ভাষা ফিরে পেয়েছে। সে উদ্বেলিত আনন্দে দিশেহার হয়ে বলে উঠল, "ওগো দিদিমণি গো! আজ তোমার ভগবানকে ডাকা সাথ্যক হয়েছে! তুমি বলছ—আমি কি করে বোঝলাম। এবার তুমিও বুঝলে তো! তুমি মানুষ নও মা, মানুষ নও—তুমি ভগবতী। দাঁড়াও, তোমায় একটা পেন্নাম করি।" বলে দয়াল সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে লীনাকে প্রণাম করল।

লীনা অপ্রস্তুত হয়ে জড়োসড়োভাবে একটু সরে দাঁড়াল। সে মনে মনে ভাবল, নিরক্ষর ভৃত্য দয়ালের শুধু ভগবানের উপরই অগাধ বিশ্বাস নেই, তার উপরও দয়ালের সম্পূর্ণ আস্থা ও সহানুভূতি রয়েছে। তাই সে সঙ্কুচিতভাবে স্নেহের সুরে বলল, "ছিঃ ভাই! মন্দিরে দাঁড়িয়ে শুধু ভগবানকেই প্রণাম করতে হয়। ওঠো।"

"তা হোক্ দিদিমণি ; তোমাকে পেন্নাম করলেই ঠাকুরকে করা হবে। কারণ ঠাকুর যে তোমায় ভালবাসেন। জানোনা?"

অজ্ঞানতাবসতই হোক আর জ্ঞানতই হোক দয়ালের এই উক্তি অনন্যোসাধারণ। একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঠাকুরের দর্শন বা কৃপা যিনি পেয়েছেন তিনিই তো চাক্ষুস ভগবান! তাঁর মধ্যেই তো আমরা ঠাকুরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি! গীতায় ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'আমি আমার চেয়েও, এমন কি গোলোকের নারায়ণের চেয়েও ভক্তকে ভালবাসি এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদে পরিপূর্ণ এবং আমি সর্ব দেবতায় পরিপূর্ণ। এই জগৎ বেদ ও দেবতা দ্বারা পরিচালিত।' সুতরাং দয়ালের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা আপনিই নত হয়ে এল। সে বলল, "আচ্ছা দয়াল ভগবানকে ডাকলেই তো পাওয়া যায়?"

"তা আর কি করে বলি। সারাদিনই তো ডাকছি, শুনছে কোথায়!"

"শব্দ করে না ডেকে চোখ বুজে ডেকো, মনে শান্তি পাবে। আচ্ছা, এখন এসো। আমি পূজা করে নি, পরে প্রসাদ নিয়ে যেয়ো।"

"আচ্ছা দিদিমণি।" বলে সে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ছুটে চলে গেল।

লীনা সেইদিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল!

তার হাসবার কারণ হয় তো এই যে দয়াল তো রোজই আসে এবং চলে যায়। কিন্তু ছুটে তো কোনদিন যায়নি সে! বোধহয় কোন একটা নূতন সংবাদ পরিবেশ করবার তাগিদেই তার এই তৎপরতা। দয়ালের এইরূপ চপলতায় লীনার মনে হল ভগবানকে সহসা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর ভক্তকে পাওয়া যেমন সহজসাধ্য ভগবানের প্রসাদ হাতে পাওয়াও তেমনি কঠিন নয়। যারা চালাক তারা এই ভক্তকে ধরেই বা দেবদেবীর প্রসাদ ভক্তিভাবে গ্রহণ করেই কাজ হাসিল করে নেয়। ভক্তই ভগবান।

কয়েকদিন পর।

এই ক'দিনেই মালতিদেবীর সংসারে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। অমল আর এখন নিজের ঘরটি ছেড়ে কোথাও বার হয় না। সবসময় চোখ বুজে থাকে, নয়তো দেওয়ালে মা কালীর ফটোটির দিকে তাকিয়ে তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করে। এই সব প্রশ্নের উত্তর

সে পায় কিনা তা' সে নিজেই বলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন করা থেকে সে যে বিরত হয় না, তা' বেশ দেখতে পাওয়া যায়। সারাজীবন ধরে মাকে ডেকেও যে তার সাড়া পায়না, শেষ জীবনেও কি সে নিরাশ হয়ে মাকে ডাকা থেকে ক্ষান্ত হয়! বরঞ্চ পাওয়ার আশা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। যা সহজে পাওয়া যায় তার দিকে মানুষের ঝোঁক কম ; যা দুর্লভ্য, যা দুঃসাধ্য মানুষের ধর্মই হল তাকে জয় করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি। যে দুঃখ কষ্টকে অগ্রাহ্য করে, পথের বাধাকে তুচ্ছ করে এগোতে পারে সেই বুদ্ধিমান, সেই ফলভোক্তা। রাতের শেষেই দিনের উদয়।

এদিকে ছেলের এই ধরণের মাতামাতি মালতিদেবী সুনজরে দেখলেন না। এই মুহূর্তে এর একটা বিহিত না করলে নয়। আবার ভয় হয়, কিছু করতে গেলে যদি উল্টোটাই ঘটে! নানা চিন্তায় তাঁর মন ক্রমশঃই ভেঙ্গে পড়ল।

অবস্থা যখন এই রকম তখন মালতিদেবী এক কাণ্ড করে বসলেন। হাজার হোক মায়ের মন। সব সময় ভাল মন্দটা বিচার করে দেখবার ধৈর্য তাঁদের থাকেনা। তাই, আজ সকালেই অমলের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে মালতিদেবী অমলের ঘর থেকে ৺কালীর ফটোটি খুলে নিজের ঘরে সরিয়ে নিয়েছেন। ভাবলেন, ঐটিকে সর্বক্ষণ চোখের সামনে না পেলেই হয় তো তার এই মনোবিকারের উপশম হবে।

যার মন যেদিকে। অমল ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারল মায়ের ফটোটি সেখান থেকে অপসারিত হয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে একফালি মৃদু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে এসে বিছনার উপর বসে এক মুহূর্ত কি ভাবল। পরক্ষণেই সে বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দু'টো বুকের উপর রেখে চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগল। এই ব্যাপারে তার মনের মধ্যে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হল কিনা, তার বাইরের ব্যবহার দেখে তা' মোটেই বোঝা

গেল না। যে সাগরের বুকে বেশী ঢেউ থাকে না তার গভীরতা খুব বেশী। প্রশান্ত মহাসাগরের, গভীরতা খুব বেশী বলেই তার উপরিভাগ শান্ত। অমলেরও এই সময়ের বাহ্যিক শান্ত ভাবগম্ভীর মূর্তি কোন বিপর্যয়ের সূচনা কিনা তা' এই মুহূর্তেই কিছু বোঝা গেল না।

ইতিমধ্যে মালতিদেবীও ঘটনার গতি কোন্ দিকে যায় পরীক্ষা করবার জন্য চুপে চুপে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই অমলকে সেইভাবে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে রে অমু? ওভাবে শুয়ে আছিস?"

বিছানার উপর উঠে বসে অমল উত্তর দিল, "কৈ, নাতো! কিছু তো হয় নি!"

ছোট্ট উত্তর। অনেক সময় এই ছোট্ট উত্তরগুলিই বিপদ ডেকে আনে। 'হ্যাঁ' বললে বোঝা যায়, 'না' বললেও বোঝা যায়; কিন্তু 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই না বললে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হয়, যে অন্ধকারে, সেই অন্ধকারেই থেকে যেতে হয়। অশান্ত মনকে বোঝ মানাতে হলে কোন একটা সঠিক উত্তর তো চাই? তাই তিনি আবার প্রশ্ন করেন, "তবে আর শুয়ে আছিস্ কেন? অত করে তোকে বললুম, যা একবার সইয়ের বাড়ীতে, খবরটা নিয়ে আয়। তা' আর তোর সময়ই হলনা। ভাবছি আজ নিজেই একবার যাব।" বলে মালতিদেবী খাটের উপর বসলেন। বোধহয় তাঁর আরো কিছু জানবার আছে। এ যেন তারই ইঙ্গিত।

মৃদু হেসে অমল বলল, "মা, ওঁদের সম্বন্ধে তোমার যতটা আগ্রহ এর কিছুটাও যদি ওঁদের মধ্যে থাক্তো, তাহলে তো তোমায় এতটা বিচলিত হতে হত না। আকর্ষণটা উভয়মুখী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় নয় কি?"

"সেকি কথা বাবা! সে তো প্রায়ই আমাদের খবর নেয়। এই তো সেদিন এসে কতক্ষণ কাটিয়ে গেল। তোর কথা কত কি জিজ্ঞাসা

করল।" বলে মালতিদেবী একটু ঢোক গিললেন। কারণ, এসব অবস্থায় বলার কায়দাটা তাঁর ঠিক রপ্ত করা নেই। তাই বুঝি অমল পাল্টা প্রশ্ন করে, "কই। আমি তো কিছুই জানতে পারলুম না? প্রতিমা আসেনি বুঝি? তাহলে ও অন্ততঃ একবার আমার কাছে আসতো। ওর মনটা কিন্তু আমাদের দিকে একটু আছে। না মা?"

মালতিদেবী খেই পেয়ে গেলেন। বর্দ্ধিত উৎসাহে এবার তিনি বললেন, "সে তো একশোবার। এখেনে এলে কি আর তোর সঙ্গে দেখা না করেই সে যেতো!" বলে মালতিদেবী ছেলের মনের দিকটা অনেকটা ধরে ফেলেছেন অনুমান করে মনে মনে আশান্বিত হলেন। কিন্তু ছেলের কথাটাই তিনি শুনেছিলেন, কথার শেষে ছেলের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটি তিনি লক্ষ্য করেন নি। ক'রলে বোধহয় তাঁর অন্যরকম ধারণা হত। তাই তিনি ছেলের মনকে প্রতিমার প্রতি আর এক ধাপ এগিয়ে দেবার জন্য তার দিকে মুখ বাড়িয়ে অতি মৃদুস্বরে বললেন, "তাহলে বলি বাবা! প্রতিমা আমায় বলেছে—অমলদা' নিজে এসে নিয়ে না গেলে আমি আর যাবোই না।...তা' বাবা, তোকেও বলি, তোরও তো উচিৎ একবার যাওয়া!"

অমল প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, "প্রতিমা ঠিক কথাই বলেছে মা। আমি গিয়ে নিয়ে এলেই তার আসা হবে। কিন্তু আমি যদি না যাই, তবে কোন দিনও তার এখানে আসা হবে না; আমার উপরেই 'তার আসাটা নির্ভর করছে। তবেই বুঝতে পাচ্ছ তার মনের টানটা চুক্তিকেন্দ্রিক।"

মালতিদেবী ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। শুধু তিনি বললেন, "তুই-বা যাবিনে কেন? ঠিকই তো বলেছে সে।"

"ওই দেখ! আমি কি আর বলছি যে সে ঠিক বলেনি? তবে, তুমি গিয়ে ও কথা শুনে এসেছিলে, না সে নিজে এখানে এসে তোমায় ও কথা বলেছিল?...ওই দেখ মা! অসতর্ক মুহূর্তে আমরা

কেমন আত্মহারা হয়ে পড়ি!' মা বোধ হয় আমার ওপর রাগ করেছেন! সময়মত তাঁর খাবার ব্যবস্থা করতে পারিনি বলেই বোধ হয়—।"

"এই তো বাবা হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকলি। একটু বস্—আমি সব ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।" বলে মালতিদেবী উঠে দাঁড়ালেন।

"খাবার এলেই মা ফিরে আসবেন তো? তাঁকে না খাইয়ে তো আমিও খেতে পারব না। কি হবে?"

ছেলের কথায় মালতিদেবী উভয় সঙ্কটে পড়লেন। এভাবে যে তাঁকে বোকা বনতে হবে তা' তিনি আগে একবারও চিন্তা করেন নি। তিনি একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি খাবার সাজিয়ে আনি—মাও খাবেন তুইও খাবি।"

"তুমি খাবে না?"

"আমায় তো রোজই দিচ্ছিস বাবা!" বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরো দু'দিন কেটে গেল।

এই দু'দিনে অমল যেন আরো বেশী তন্ময় হয়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ সময়ই সে আত্মস্থ হয়ে থাকে। যদিও বা কখনো তার মন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে। তাতে না আছে কোন পলক, না আছে কোন সজীবতা, যেন কেমন একটা উদাস ভাব—একটা অসাচ্ছন্দ পরিবেশ। মালতি-দেবীও যেন এখন কেমন হয়ে গেছেন। সব সময়েই তিনি কোন না কোন অছিলায় অমলের ঘরে একবার উঁকি মেরে যান। সব সময়েই তার মনে ভয়—এই বুঝি কিছু একটা ঘটে যায়! মানসিক অশান্তিতে শরীরও তার ভেঙ্গে পড়েছে; সব সময় একটা নিরুৎসাহভাব যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে; তাই তিনি একসময় স্বামীর কাছে অবস্থার গুরুত্বটার কথা ভেঙ্গে বললেন।

স্ত্রী মালতিদেবীর মুখে সব শুনে যোগেশবাবুর মনটাও কেমন

একটা অস্বস্তিতে পুর্ণ হয়ে গেল। বৌটার তো ঐ অবস্থা। আবার ছেলেটারও মতি ঐ পথই ধরল! .অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করে তিনি একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন।

"তাহলে এখন কি করবে? চুপ করে দেখে গেলে তো আর চলবে না! কোন ওঝা-টোঝাকে যদি দেখাতে হয়—"

গৃহিণীর কথা শুনে যোগেশবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ওঝাটোঝা কি বলছ! এ ঝাড়ফুঁকেব কাজ নয়! বুঝলে গিন্নী, ঐ একটি মাত্র ছেলে; নইলে বহু পূণ্যের জোর আমাদের, তাই ওর মতি ঐ পথ ধরেছে।"

"তোমার মুখেও ওই কথা। সন্ন্যাসীর কঠিন-জীবন ও বইতে ।।রবে কেন? ও ছাড়াও তো জ্ঞান পাবার আরো রাস্তা ছিল!" মালতিদেবী বলেন।

"যার চক্ষু যে রকম; যে যে-রকম জ্ঞানস্তরে ঘুরে বেড়ায়, সে সকলের মধ্যে সেই রকম জ্ঞানই দেখতে পায়। নূতন কোন জ্ঞানেই তার আগ্রহ থাকে না। মনের আনন্দ নিজের মনের মধ্যেই।"

গভীর অভিমানে মালতিদেবী বললেন, "তুমি আর বলো না। শেষকালে কি ছেলেটা সন্ন্যাসীই হয়ে বেরিয়ে যাবে?"

"যদি ওর সেই ইচ্ছাই হয়ে থাকে তবে কোন কিছু করেও ওকে ওপথ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। কেউ কি আজ পর্যন্ত পেরেছে? বরঞ্চ যেখানেই বাধা পেয়েছে, ফল তার উল্টোটাই হয়েছে। ··হ্যাঁ. এ ব্যাপারে বৌমার মনোভাব কি? তোমার সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?" যোগেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"না।" বলে একটি ছোট্ট উত্তর দিয়ে মালতিদেবী চুপ করে রইলেন ও পরক্ষণেই স্বামীর দিকে ফিরে তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন. "বেশ, তোমরা সব চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাক। কিন্তু আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।"

"তা' তুমি দেখতে পার। কিন্তু ফল তাতে শুভ হবে না।

তারচেয়ে বরং মনকে দৃঢ় কর—ভগবানের ইচ্ছার উপর সব ছেড়ে দাও। দেখাই যাক্না, অনাগত অদৃষ্ট আমাদের কোথায় নিয়ে যায়!"

মালতিদেবী আর সেখানে অপেক্ষা না করে কোন একটা নূতন আশার সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যোগেশবাবু একবার তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন—"বৌমাকে দেখলুম, ছেলেকেও দেখছি, ভগবান না করুন, শেষকালে গিন্নীকেও বোধহয় আমায় হারাতে হবে।'

এদিকে মালতিদেবী স্বামীর কাছ থেকে বেরিয়ে সোজা বহির্বাটিতে এসে উপস্থিত হলেন। দয়ালকে ডেকে তিনি একটা গাড়ী ডাকতে বলে মন্দিরের দিকে মুখ করে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। মনে মনে হয়তো বললেন, 'ঠাকুর! খোকাকে সুবুদ্ধি দাও।' মায়ের প্রাণ, সৎ, অসৎ বিচার করবার ক্ষমতা তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে ফেলেন।

গাড়ী এলে তিনি দয়ালকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে সোফারকে চালাতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কোথায় যেতে হবে, তা হয়তো তিনি এখুনি প্রকাশ করতে চাননা। মন উত্তেজিত থাকলে এরকমটা প্রায়ই দেখা যায়।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে নির্দেশমত গাড়ীটি এসে প্রতিমাদের বাড়ীর দোর গোড়ায় দাঁড়াতেই মালতিদেবী দয়ালকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। যাবার আগে তিনি সোফারকে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে বললেন।

এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। একটি তাঁর ফেরবার সুযোগ অপরটি হয়তো তাঁর এখানে আসার খবরটা সোফার পূর্বাহ্ণেই যাতে কাউকে প্রকাশ করতে না পারে।

এই অসময়ে তাঁদের দেখে হৈমবতীদেবী ও প্রতিমা ত্বরিৎপদে তাদের নিকটে এসে দাঁড়াতেই মালতিদেবী হৈমবতীদেবীকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রতিমার দিকে কটাক্ষ করছিলেন। প্রতিমার সেদিকে নজর নেই। আর দরকারই বা কি।

গাড়ীটি পুনরায় 'ষ্টার্ট' দিয়ে যখন যোগেশবাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হল, তখন তাতে আরোহী সংখ্যা তিনটি—মালতিদেবী, দয়াল ও প্রতিমা। অনেক ক্ষেত্রেই গুরুজনদের আদেশ না মানা সমীচীন নয় মনে করেই হ'ক বা অন্য কোন কারণেই হ'ক প্রতিমার সঙ্গে-যাওয়ার কোন বাধাই ছিল না।

বাড়ীর দোর গোড়ায় গাড়ীটি এসে পৌছাতেই মালতিদেবী প্রতিমাকে নামিয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললেন। মনে হল প্রতিমাই যেন এখানে নায়িকা। প্রতিমা তাঁর অনুসরণ করল।

অমলের ঘরের দরজার কাছে এসে মালতিদেবী ধীরে ধীরে একটি কপাট ঈষৎ ফাঁক করে প্রতিমাকে কি ঈশারা করলেন। বুঝতে প্রতিমার কোন অসুবিধা হয়না। তাই, সেও অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে দরজা ঠেলে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। মালতিদেবী অমনি কপাটটি টেনে নিলেন। ব্যাপার দেখে অনেক কিছুই জানবার ইচ্ছে থাকলেও আপাততঃ ইচ্ছেটাকে দমন করাই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ। তবে প্রতিমার কথা আলাদা। নতুবা প্রতিবাদ না করে সেই বা এমনিভাবে ঘরে ঢুকতে যাবে কেন! মেয়েটাতো সুবিধের নয়! দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। ওস্তাদের মার শেষ রাতে—কথাইতো আছে।

ঘরে ঢুকে প্রতিমা দেখতে পেল অমল বিছানার উপর উপুড় হয়ে বসে একটা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে কি সব যেন দাগ কাটছে। প্রতিমার আকস্মিক উপস্থিতি সে টের পেল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখল অমল একইভাবে একাগ্রমনে

তার কাজ করে যাচ্ছে, তখন প্রতিমা কি করবে ভাবছে, ঠিক সেই সময় অমল হঠাৎ কাগজখানি তুলে মুখের সামনে ধ'রে খুসী মনে বলে উঠল, "এবার আর তুই পালাবি কোথায়। তোকে আমি—"

তাই হয়; ভক্ত যখন তার আরাধ্যা দেবীর সন্ধান পায়, তখন তাঁকে আরো নিবিড়ভাবে পাবার জন্য তার উদ্‌ভ্রান্ত মন সচেষ্ট হয়ে ওঠে; কারণ, তার ভয় হয় হয়তো এত চেষ্টায় পাওয়া তার সেই মা বুঝি আবার পালিয়ে যাবে বা অন্য কেউ আবার তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই অমল এবার বর্ধিত উৎসাহে বলে উঠল, "এই যে এসেছ! দেখ, কেমন টানাটানা চোখ, যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। দেখ দেখ—"

একি রে বাবা! এ রকম ফ্যাসাদে যে সে পড়বে, আগে তা তো সে ভাবেনি!

প্রতিমা কয়েক পা এগিয়ে এসে কাগজটির উপর দৃষ্টি ফেলে বুঝতে পারল একটি কালীমূর্তি আঁকা হয়েছে কাগজটির উপর। আশ্চর্য হয়ে সে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "ওসব কি হচ্ছে?"

"জান লীনা, মা ভেবেছিল আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাবে। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। ওকে নিয়ে আমিই পালিয়ে যাব ওর বাড়ীতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে লীনা? সেখানে শুধু আমি থাকবো, মা থাকবে আর তুমি থাকবে? চলনা যাই?"

প্রতিমা চমকে উঠল। কিসের যেন আশঙ্কা করে তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে নির্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অমলের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তার চোখ যেন আনন্দাশ্রুতে ছলছল করছে। পুনরায় সে অনুরোধের সুরে প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করল, "বল লীনা, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মায়ের

কাছে ? বলনা চুপ করে থাকলে কেন ? এখন কি চুপ করে থাকবার সময় ! বেলা বয়ে যাচ্ছে না ? মা যে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন !"

প্রতিমা কিছু ভেবে না পেয়ে উত্তর দিল, "মায়ের কাছেই তো আপনি রয়েছেন ; তবে আবার কোন্ মায়ের কথা বলছেন ?

"এই যে, এই মা ! চিন্‌তে পাচ্ছনা এঁকে ?" বলে বিছানা থেকে নেমে সে প্রতিমার কাছে গিয়ে কাগজখানি তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

প্রতিমাও জবাব দিল, "এ মায়ের কাছে তো যাবেন বুঝলুম. কিন্তু নিজের মায়ের ব্যবস্থা কি হবে সে কথা ভেবেছেন ?"

ভাব গদগদ কণ্ঠে অমল উত্তর দিল, "আমি ভাবতে যাব কেন ; সবই তো ও ভাববে। ওযে সবার মা ! চলনা আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে !" তার কণ্ঠে শিশুসুলভ ব্যাকুলতা।

প্রতিমা প্রশ্ন করল, "সবই যদি তিনি ভাববেন তবে এটাই বা ভাবছেন না কেন ? পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কথাটা ? আর আমি আপনার সঙ্গে গেলে কি আপনার কাজ হবে ?"

"তুমি সঙ্গে থাকলেই তো আমি তার দেখা পাব। একা একা কি পথ চেনা যায়। মা যে তার ভক্তকে শুধুই ঘুরিয়ে মারে। সেকি অত সহজেই ধরা দেয় ? যাও, তুমি প্রস্তুত হয়ে এসো। আমিও প্রস্তুত হয়ে নি। অনেক কিছু গোছাতে হবে তো—অনেক কিছু গোছাতে হবে ! নতুবা অগোছালো মন নিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হবে, জানো না ?" বলতে বলতে অমল ভাবাচ্ছন্নভাবে ঘুরে টেবিলের ধারে গিয়ে উপস্থিত হল।

পরক্ষণেই সে ঘুরে প্রতিমার দিকে ফিরে বলে উঠল, "কিন্তু কোথায় তুমি আমায় নিয়ে যাবে ? আমি এক অন্ধ ! তুমিও তো তাই ! হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতেই আমাদের এগোতে হবে।"

কি একটা ভেবে প্রতিমার চোখ দু'টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কয়েক

পা এগিয়ে এসে অমলের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে সে মন্তব্য করল,"অন্ধেরাতো হাত্‌ড়িয়ে হাত্‌ড়িয়েই তাদের জিনিস খুঁজে নেয়। কিন্তু যাদের চোখ আছে, যাচাই না করেতো তারা কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয় না। আর, এই যাচাই করতে গিয়েই তো তারা জল ঘোলা করে ফেলে, পাওয়া জিনিসও তাদের চোখে তখন ঘোলাটে দেখায়। তাই যদি হয়, ধরুণ, আমি যদি আপনাকে রোজ রোজ মায়ের বাড়ী থেকে ঘুরিয়ে আনি, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে ?"

"বেশ কথা তুমি বলেছো তো ?" পথের নিশানা পেয়েছো ?"

"পেয়েছি।"

"তবে আর দেরি নয়—ঝুলে পড় !"

"বেশ, আমি কাল সকালেই এসে আপনাকে নিয়ে বেরোবো। আমি ছাড়া আর কারো সঙ্গে বা একা আপনি কোথাও যাবেন না। মায়ের কাছে আমিই আপনাকে নিয়ে যাবো। কেমন ?···এবার আমি আসি ?" প্রতিমা চুপ করল।

অমল কোন উত্তর দিল না। সে শুধু চেয়ে থাকে। চোখে তার ভাবাশ্রু।

প্রতিমাও তার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। তারও চোখে জল। দু'জনেই দু'জনের ভাবে ভাব-প্রভাবিত, দু'জনেই ভাব-বিভোর। যে দেখবে, সেও ভাবে ভাব জমিয়ে হবে ভাবে মাতাল। ভাব-সাগরের তীরে যে পাড়ি জমাবে সেই পাবে ভবতরী। উদ্দেশ্য দু'জনেরই যখন এক, তখন ভব পাড়ে তরী তাদের ভিড়বেই।

এগার

পরের দিন সকালবেলা যথারীতি প্রতিমাও এসেছিল, সঙ্গে এনেছিল অফুরন্ত আকাঙ্খার সম্ভাবনা আর রোমাঞ্চকর ভাবাবেগ। কিন্তু তার সমস্ত মনশ্চাঞ্চল্যই মুহূর্তে কিসের এক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল কাল্পনিক বালির খেলাঘর, যখন সে এসে শুনতে পেল পাখী উড়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু শূন্য পিঞ্জর।

খবরটা শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত প্রতিমার বুকের ভেতরের সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ক্ষণিকের মত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল যেন সারা পৃথিবীর জমাট অন্ধকারের সীমাহীন পরিব্যাপ্তি। অবসাঙ্গ হয়ে সে টলতে টলতে পড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে জল ভরা চোখে মালতিদেবী এগিয়ে এসে তাকে বুকে জাপটে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আজ তিনদিন হল অমল নিরুদ্দিষ্ট।

এই তিন দিন যোগেশবাবু সকল সম্ভাব্য স্থানেই ছেলের সন্ধান করেছেন। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাননি। অধিকন্তু, এই দুঃসময়ে অমলের বন্ধুরাও সাহায্য করবার জন্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলের মুখেই আজ এক অযাচিত বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। এমনটি যে হবে বা হতে পারে তা' ক্ষণিকের জন্যও কেউ ভাবতে পারেনি।

মালতিদেবী এই তিন দিন স্নানাহার ত্যাগ করেছেন বললেই হয়। সবসময়ে তাঁর মনের মধ্যে ছেলের এই অন্তর্ধানজনিত মনোবেদনা শেলের মত আঘাত করছে। থেকে থেকে মন তাঁর ডুক্‌রে উঠছে। কোন রকম প্রবোধই তাঁর এই অন্তর্দাহকে প্রশমিত করতে পারছে

না। অশান্ত মনের দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি একবার ঘর, একবার বার করছেন, কোন কিছুতেই যেন তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। তাই মনের আক্ষেপে তিনি সময়ে সময়ে ছেলের উদ্দেশ্যে 'সর্বনেশে! তোর মনে এই ছিল!' প্রভৃতি নানা রকম কটুবাক্য প্রয়োগ করে অশান্ত মনকে মিথ্যা প্রলোভন দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অতি আপনজনের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে এবং বিশেষ সময়ে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। তাই বোধহয় মনের ঝাল্ মিটাবার জন্য জগন্মাতার উদ্দেশ্যেও—'সর্বনাশী, কেলে ছুঁড়ি, রাক্ষুসী, মুণ্ডু চিবিয়ে খাই তোর—' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বুলিগুলি ভক্তদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে।

দারুণ মনোবেদনার উপর সামান্যতম প্রলেপের আশায়ও মালতি-দেবী বারে বারে তাঁর বৌমার কাছে গিয়ে ধণ্যা দিয়েছেন। তাই পুনরায় তিনি তার কাছে যেতেই লীনা প্রবোধ দিয়ে তাঁকে বলল, "যেখানে সেখানে তাকে খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে মা! তার জায়গাতেই তাকে খুঁজতে হবে। ভয় কি মা! ছেলে তোমার পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই সে তোমার কোলে ফিরে আসবে। তার চেয়ে বরং খুঁজে বার করো কোথায় সে গিয়েছে এবং তুমি নিজে গিয়ে তাকে সাহায্য করো যাতে তাড়াতাড়ি সে পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে ফিরে আসতে পারে। মায়ের কাজতো করতে হবে!"

মালতিদেবী বিস্ময়ে বৌমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ আবার কি কথা! কোথায়ই বা তাকে খুঁজতে যাব, আর কি ভাবেই বা তাকে সাহায্য করব! একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে তিনি মন্দির থেকে চলে এলেন।

কিন্তু যোগেশবাবু গৃহিণীর মুখ থেকে কথাটা শুনে সাধারণভাবে তাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। সত্যিই তো! এখন পর্যন্ত তো এ কথাটা তাঁদের মনে একবারও উদয় হয় নি! একমাত্র দেবস্থানেই শুধু তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এবং তাও আবার সাধারণ দেবস্থান

নয়—এ সেই ধরণের স্থান যেখানে মহামায়া মহাশক্তিরূপিণী কালী অধিষ্ঠিতা আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে ফেললেন।

যোগেশবাবু পূর্বাহ্নেই তাঁর মনোভাব মালতিদেবীকে জানতে দিলেন না। তিনি অমলের বন্ধুদের ডেকে নিভৃতে তাদের কিছু উপদেশ দিলেন। উৎসাহিত হয়ে তারাও তথ্যুনি প্রস্তুত হল বেরিয়ে পড়বার জন্য।

বন্ধুরা সকলে দল বেঁধে কিন্তু একই দিকে গেল না। কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ গেল উত্তরে কেউ গেল দক্ষিণে, আবার কেউ গেল তার আত্মীয় স্বজনের বাড়ী কিন্তু কেউ অমলের কোন হদিসই আনতে পারলনা। হতাশ মনে সকলেই একে একে ফিরে এল।

এরপর আরম্ভ হল দ্বিতীয় পর্যায়ের খোঁজাখুজি। এবার তাদের লক্ষ্যস্থল হল অপেক্ষাকৃত দূরের তীর্থস্থানগুলিতে।

দেখতে দেখতে এদিকে দু'মাস কেটে গেল। কিন্তু আজ পর্যন্ত যোগেশবাবু কোনদিক থেকেই কোন খবর পেলেন না। শেষকালে কি ছেলেটা চিরদিনের মত তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! এই প্রশ্নে যোগেশবাবুর মন দুর্বল হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন এ লাইনের ধারা তো তা নয়, ফাঁকীতো সে দিতে পারেনা! তাহলে সে নিজেই যে ফাঁকিতে পড়বে। তাছাড়া আর একটি আশার আলো এখনও তাকে আলো দেখাচ্ছে, সে হচ্ছে বৌমা লীনার ভাব গম্ভীর ব্যবহার। সে তো সাধারণ নয়। সে অসাধারণ। সুতরাং এ ব্যাপারে যা কিছুই হোক না কেন, ফলাফল বৌমার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি তার অশান্ত মনকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

এদিকে অমল বাড়ী থেকে বেরিয়ে নানা তীর্থস্থান ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোনখানে গিয়েই সে মনে শান্তি পেল না। অবশেষে

তার মন চাড়া দিয়ে উঠল তন্ত্র সাধনার প্রাণকেন্দ্র প্রাগ্-জ্যোতিষ পুরে যাবার জন্য।

প্রাগ্ জ্যোতিষ পুরের অনেক স্থানেই তখন বড় বড় তান্ত্রিকরা তন্ত্র সাধনা করতেন। বিশেষ করে গভীর বনের মধ্যে অনেক কাপালিক মা কালীর আরাধনা করতেন এবং মায়ের সামনে নর বলি দিতেন। ষোল বছরের নীচে ব্রাহ্মণ বংশ-জাত শিশু বলিই ছিল প্রশস্ত। কোন কোন কাপালিকের মানত থাকতো হয়তো দশটা বলির। আবার কারো হয়তো ছিল শত বলীর মানত। কাজেই বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয় যে তখনকার দিনে অচেনা জায়গায় চলাফেরা করা কত বিপজ্জনক ছিল।

আবার, এখানকার মেয়েছেলেরাও নানা রকম তুক্‌তাক্ ও বশীকরণ বিদ্যায় অভ্যস্ত ছিল। কিম্বদন্তি আছে, অপর দেশের কোন পুরুষ যদি কোন প্রকারে একবার এদের কবলে পড়তো, তবে অতি সহজেই তারা এদের বশীভূত হয়ে পড়তো, আর মেয়েরা সহজেই তাদের 'ভেড়া বানিয়ে' রাখতো, কোন দিনই আর তাদের মুক্তি হতো না। এ কথার তাৎপর্য হয়তো এই—এখানকার মেয়েরা দেখতে প্রায় অধিকাংশই সুশ্রী ছিল। তাই হয়তো বাইরের কোন পুরুষ এদের দেখেই মোহিত হয়ে পড়তো এবং বিবাহাদি করে এদের মধ্যেই চির দিনের জন্য থেকে যেত। সেই জন্যই দেশের বাইরে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের নাম শুনলেই লোকের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হত যে ওখানে গেলেই সকলে 'ভেড়া' ব'নে যাবে, আর কখনো তাদের গতি হবেনা। এই কুসংস্কারের মনোভাব লোকের মন থেকে এখন অনেকটা দূর হয়ে গেছে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বর্তমান নাম আসাম। এই রাজ্যের কামরূপ জেলার অন্তর্গত গৌহাটী সহরের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে নীলাচল পাহাড়ের উপর ৺ কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানে সতীর যোনীদেশ পতিত হয়। বাহান্ন পীঠের মধ্যে এইটি

অন্যতম প্রধান পীঠ। এখানে দেবী মহামুদ্রা কামাখ্যা ও ভৈরব উমানন্দ।

অমল ঘুরতে ঘুরতে কামাখ্যার পথে তদানীন্তন ইষ্টার্ণ রেলের শেষ ষ্টেশন আমিনগাঁয়ে এসে উপস্থিত হল। আমিনগাঁয়ের ঠিক মুখোমুখী ব্রহ্মপুত্র নদীর অপর পাড়ে নীলাচল পাহাড়। আমিনগাঁ বা তৎপূর্ববর্তী কয়েকটি ষ্টেশন থেকেও এই নীলাচল পাহাড়ের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিতা দেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দিরটি একটি ছোট্ট খেলাঘরের মত দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরটি নজরে পড়তেই অমল দু'হাত জোড় করে ভক্তিভরে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। এই সময় মনে তার এক উত্তেজনা দেখা দিল। কালবিলম্ব না করে সেখানে উপস্থিত হবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। একটি মুহূর্ত এখন তার কাছে এক ঘণ্টার মত বলে মনে হল।

রেলের ফেরীতে নদী পার হয়ে সে পাণ্ডুতে এসে নামল। এখান থেকে নীলাচল পাহাড়ের হাঁটাপথের দূরত্ব মাত্র দু'-আড়াই মাইল।

রেলের কলোনী পেরিয়ে চওড়া রাস্তা ধরে অমল এগিয়ে চলেছে। পাকা পীচ ঢালা রাস্তা। নীলাচল পাহাড়টিকে বাঁয়ে রেখে রাস্তাটি পাহাড় ঘুরে চলে গিয়েছে গৌহাটি সহরের দিকে। সহর এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল।

অমল চলেছে। তার আশে পাশে চলেছে আরো অনেক যাত্রী। তাদের সঙ্গে পেয়ে অমল আরো উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। পাল্লা দিয়ে সে চলেছে, দৃষ্টি তার উন্নত। পাকা রাস্তার দু'ধারে এবার সুরু হল পাতলা বন জঙ্গল। অমল চলেছে—মনে কত আশা। ওই তো পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে যেন কত কাছে। মনে হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যেন সেখানে পৌঁছানো যাবে।

রাস্তাটা এবার একটু উপরের দিকে উঠতে লাগল।

প্রায় এক ঘণ্টার উপর হেঁটে আসবার পর অমল এক জায়গায়

এসে একটু বিভ্রাটে পড়ল। বড় রাস্তা থেকে একটি সরু মেঠো রাস্তা বাঁদিকে নেমে যেন পাহাড়টার পেটের দিকে চলে গেছে। সে এখন কোন্‌দিকে যাবে, ঠিক করতে না পেরে পেছনের অপর এক যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তরে বলল, "বাঁদিকের ঐটাই নীলাচল পাহাড় আর তার উপরেই ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির। বাঁয়ের এই সরু মেঠো পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে।"

যাত্রীটি অমল ও অপর যাত্রীদের নিয়ে সদর রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ের সরু রাস্তায় নেমে পড়ল। যেতে যেতে সে বলতে লাগল, "এই মন্দিরে উঠবার এইটে নিয়ে তিনটি পথ আছে। বড় রাস্তাটা পাহাড়-টাকে ঘুরে কামাখ্যা ষ্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পাঁচ মাইল উত্তরে গোহাটী সহরে। এই কামাখ্যা ষ্টেশনের পাশ থেকে একটি রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা উপরে উঠে গেছে মন্দিরের কাছে। এই রাস্তাটা খুবই বিপদজনক। পাথরের উপর পাথর বসানো সিঁড়ি বেয়ে গাছের শিকড় ধরে ধরে অতি কষ্টে সোজা উপরের দিকে উঠতে হয়। অন্যমনস্কতাবশতঃ যদি একবার হাত ফসকে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। শত শত ফুট এমন কি হাজার ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন। সেইজন্য এ পথে বড় বেশী লোক যাতায়াত করে না। তবে খাড়া উঠে গেছে বলে এ পথে সময় খুব কম লাগে।

আর একটি রাস্তা নদী থেকে উঠে গেছে। এটি মেঠো রাস্তা, ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতে হয়। পাণ্ডু ষ্টেশন থেকে সোজা উত্তরমুখে নৌকা ভাড়া করে এই রাস্তার মুখে যেতে হয়। আর যে পথ ধরে অমলরা এগিয়ে চলেছে সেটি হল তৃতীয় পথ। এটিও মেঠো পথ। মাঝে মাঝে পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়। উপরে যাবার পক্ষে এইটিই নিরাপদ। তবে ঘুরে ঘুরে উঠবার জন্য একটু সময় লাগে।"

অমল আবার জিজ্ঞাসা করল, "আমিও কি আপনাদের সঙ্গেই যাব?"

"আপনি মন্দিরে যাবেন তো' ?" যাত্রীটি জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ !"

"বেশতো, আমরাও যাব। চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বলে সে চুপ করল।

তখনও অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সব সময়েই মনে হচ্ছে, ওইতো পাহাড় ! কিন্তু হেঁটে আর রাস্তা ফুরোতে চায় না। বিশেষ করে যারা ক'লকাতায় থাকে বা কখনো পাহাড় দেখেনি, তাদের কাছে এটা একটা প্রহেলিকার মতোই মনে হয়। তবে এখন পাহাড়টা একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। মনে হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর পাদদেশে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

আরো কিছুটা পথ যাবার পর এবার সকলে পাহাড়টার নীচের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। তাদের মাথার উপরেই পাহাড়, যেন তারা একটা কালো সামিয়ানার তলা দিয়ে হেঁটে চলেছে। বিভীষিকার মধ্যেও যে এত আনন্দ থাকতে পারে অমল এই প্রথম তা অনুভব করল।

পাহাড়টার কোলে পৌঁছে উপরে উঠবার মুখে একটুখানি সমতল জায়গা দেখতে পাওয়া গেল এবং তার মাঝখানে বসান রয়েছে একটা বিরাট পাথরের গণেশমূর্তি—তেল সিঁদুরে ঢাকা। যাত্রীরা সব এই মূর্তির পায়ে তেল সিঁদুর পরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে উপরে উঠে যায়। যাত্রীরা মনে করে আসল যাত্রা সুরুর প্রথমেই বিগ্রহের আশীর্বাদ পেলে সব বিপদ আপদ কেটে যাবে।

এবার সুরু হল ওঠবার পালা।

অমল অপর পুণ্যার্থীযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। পাহাড়ে ওঠা পূর্বে তার কখনো হয়নি। তাই এই যাত্রা তাকে গভীর আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দিতে লাগল। এপথ সেপথ ঘুরে কখনো মেঠো রাস্তা আবার কখনো পাথরের এলোমেলো সিঁড়ি ভেঙ্গে সোজা খাড়া ভাবে উপরে উঠে তারা

এগোতে লাগল। এরই মধ্যে অমলের গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল এবং পা দু'খানিও টন্‌ টন্‌ করতে লাগল। কিন্তু তার মনের উৎসাহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। পাহাড়ে ওঠার সে কী আনন্দ তা যারা একবার না উঠেছে তাদের বোঝানো যাবে না। এক পাহাড় থেকে দূরে চারদিকের আর সব পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি পড়লে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতির এই হল প্রতিভাসিত রূপ—মায়ের বিশ্বজনীন রূপ। অমল দুহাত তুলে তাদের মনের অভিনন্দন জানায়।

আর যেন পা চলে না। মনে হয় এই খাড়া সিঁড়ির ধাপগুলির শেষেই বুঝি তাদের যাত্রার শেষ হবে। আশার পর আশা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে।

একটি খাড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙ্গে যখন যাত্রীরা উপরে একটা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছাল তখন বেলা প্রায় বারটা বেজে গেছে।

রাস্তা শেষ হয়েছে দেখে অমল একদিকে তাকাতেই অনতিদূরে ৺কামাখ্যাদেবীর মন্দির দেখতে পেয়েই মহানন্দে সেইদিকে ছুটে চলে গেল।

সতী তীর্থ কামাখ্যা।

পুরাকাল থেকেই এই মন্দিরের প্রতি ভারত ও ভারতের বাইরের হিন্দু নরনারীর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এখানে দেবীর নাম মহামূদ্রা; সতীর যোনীদেশ এখানে পতিত হয়। প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের এক ছোট্ট সমতল জায়গায় মন্দিরটি অবস্থিত। তলা থেকে বৃত্তাকারভাবে ধাপে ধাপে মন্দিরটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গম্বুজের মত উপরের দিকে উঠে গেছে। গায়ের ধাপগুলি সরু ও সংখ্যায় অসংখ্য। মন্দিরের গায়ে নানা রকম কারুকার্য করা। কারুকার্য-গুলি এত সুন্দর ও এত মজবুতভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে হাজার হাজার বছর পর আজো তার নৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ আছে। মন্দিরটির

ব্যাস এত চওড়া ও এর চূড়া এত উচ্চ যে এর পারিপার্শ্বিক আব্‌হাওয়া যাত্রীদের মনে এক ভাবগম্ভীর শিহরণ জাগিয়ে তোলে, মনের কল্পনাকে এমন এক ভাব রাজ্যে পৌঁছে দেয় যেখানে কোন হিংসা নেই, দ্বেষ নেই; আছে শুধু অনাবিল শান্তি। যাত্রীরা যখন কঠিন সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচ থেকে এই সমতলভূমিতে এসে উপস্থিত হয় এবং হঠাৎ যখন মন্দিরটিকে তাদের কোলের কাছে দেখতে পায়, তখন পথের সমস্ত কষ্ট ভুলে গিয়ে পুণ্যার্থীযাত্রীরা 'জয় কামাখ্যা দেবীর জয়' বলে সমস্বরে আনন্দধ্বনী করে চারদিক মুখরিত করে তোলে।

মন্দিরটির পেছনে ঠিক দশ পনের ফুট এক ফালী ভূমির উপর আছে একটা ছোট্ট কুণ্ড। যাত্রীরা এতে নেমে স্নান করে।

দেবীকে দর্শন করবার জন্য যেসব যাত্রীরা এখানে এসে ভীড় করে থাকে তাদের মধ্যে বাইরের যাত্রীছাড়াও বহু স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষও থাকে। পুরুষদের পরিহিত জামাকাপড় প্রায় বাঙ্গালীদের মতই। কিন্তু মেয়েদের জামাকাপড়ে স্বাতন্ত্র আছে। তারা দেহের উপর এক রকম কটিবাস ও ওড়না ব্যবহার করে যাকে বলে 'মেখলা'। সম্ভ্রান্ত-বংশের মেয়েরাই সাধারণতঃ মেখলা ব্যবহার করে। এই বিশেষ ধরণের কটিবন্ধ ও অন্যান্য পোষাক সাধারণতঃ 'এণ্ডি' থেকেই তৈরী করা হয়। এগুলি গ্রাম্য মেয়েদের কুটীর শিল্প। এণ্ডি কাপড় ও চাদরের প্রচলন এখানে খুব বেশী ও দামেও সস্তা।

যাত্রীদের একরকম ঠেলেই অমল এসে হাজির হল মন্দিরের মুখে। মন্দির প্রাঙ্গণে নামলেখা পাথর বাঁধান চাতালের উপর দাঁড়িয়ে সে দেখল নিচের দিকে সিঁড়ি ভেঙ্গে যাত্রীরা মন্দিরের তলদেশে প্রবেশ করছে এবং সেই সিঁড়িরই অপরপাশ ঘেঁসে যাত্রীরা মাকে দর্শন করে পূজা দিয়ে আবার ফিরে আসছে। সে কী ভীড়ের ঠেলাঠেলি! ঠিক ক'লকাতার কালীঘাটের অবস্থা। তফাৎ শুধু, এখানে আবছা অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে হয়। আলোর-উৎস শুধু মাঝে মাঝে এক একটি তেলের প্রদীপ।

অমল এখন কি করবে ভাবছে ঠিক সেই সময় একজন পাণ্ডা তার কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "দর্শন করবেন তো ?"

"ইচ্ছে আছে।"

"এর পূর্বে বংশের কেউ এখানে এসেছিল ?"

সন্দিগ্ধভাবে অমল প্রশ্ন করল, "কেন বলুন তো ?"

পাণ্ডাটি হেসে উত্তর দিল, "এখানে পাণ্ডা না হলে কোন কাজ হয় না। কিন্তু আপনার বংশের কোন নির্দিষ্ট পাণ্ডা আছে কিনা তা' জানা দরকার। এখানে কোন পাণ্ডাই অপরের যাত্রী বে-দখল করবে না।

কৌতূহলী হয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল, "নাম বললেই আপনি বলে দিতে পারবেন তিনি এখানে এসেছিলেন কিনা ?"

"হ্যাঁ। ঠিকানা বললে সাত পুরুষ আগেও বংশের কেউ এখানে এসেছিলেন কিনা বলে দিতে পারব।"

ইতিমধ্যে আরো দু'একজন পাণ্ডা সেখানে এসে উপস্থিত হল।

অমল আমোদ বোধ করে তার বাড়ীর ঠিকানা এবং পিতৃ-পিতামহের নাম বলে যেতে লাগল এবং সব পাণ্ডারাই যার যার হাতের মোটা 'পুঁথি' খুলে পাতা উল্টাতে লাগল।

বেশীদূর আর যেতে হলনা। পেছনের একজন পাণ্ডা চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে, এখানে রয়েছে। নাম—রমেশচন্দ্র দে, পিতার নাম —রাসবিহারী দে, সাকিন—কলিকাতা, ৮০নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, পাণ্ডা —শ্রীকালীকৃষ্ণ পাণ্ডা।" বলেই সে এদিক ওদিক দেখে বলল,—"না, তিনি এখানে নেই। ··· আচ্ছা, চলুন আপনাকে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছি। সেখানে চান্‌টান্‌ সেরে একেবারে পূজা দিতে আসবেন।" বলে পাণ্ডাটি অগ্রসর হল।

অমল তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হৃষ্টমনে তার অনুসরণ করল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দে তার ঠাকুরদাদার নাম।

আজ তিনদিন হল অমল কামাখ্যায় এসেছে। এরই মধ্যে সে

৺কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করেছে। মন্দিরের অতি তলদেশে সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাকে দর্শন করতে হয়—হাত দিয়ে বিগ্রহের নীচের কুণ্ডের জল স্পর্শ করতে হয়। একটি মাটির তৈল-প্রদীপের স্বল্পালোকে বিগ্রহ স্থানটি উদ্ভাসিত। সম্মুখে বসে আছেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

কালীকৃষ্ণ পাণ্ডা একে একে তাকে এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলিও ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছেন। তার মধ্যে প্রধান হল একটি প্রকাণ্ড দীঘি। এই দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে 'কল কল' করে ডাকলেই একটি প্রকাণ্ড কচ্ছপ জল থেকে তীরের কাছে এসে যাত্রীদের হাত থেকে কলা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য মুখ বাড়িয়ে নেয়। কথিত আছে—কোন দেবতা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে কচ্ছপের রূপ ধরে এই দীঘির জলে বাস করছেন এবং ভোগ শেষ হলে তিনি মুক্তি পেয়ে চলে যাবেন। দশমহাবিদ্যার মন্দিরটিও অমলের দেখা হয়েছে। এই মন্দিরের ভেতর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেই প্রতিটি ঘোরাব মুখে এক একটি কাল পাথরের বিরাটকায় মূর্তি দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। এই মন্দিরের খবর অনেকেই জানেনা; পাণ্ডাদের জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলে দেয়।

অবশেষে অমল দেখেছে ভুবনেশ্বরীর মন্দির। নীলাচল পাহাড়ের মাথায় এই মন্দির অবস্থিত। ট্রেনে আসবার সময় এই মন্দিরটিকেই কয়েক ষ্টেশন আগে থাকতেই দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পরিবেশটি অতি মনোরম। এখান থেকে নীচে তাকালে গোহাটী সহরটিকে দেখা যায় শিশুদের কয়েকটি খেলাঘরের মত। আর ঠিক পাহাড়ের নীচে ব্রহ্মপুত্র নদীটি যেন একগাছি সাদা সুতোর মত পরে আছে। কী নয়নাভিরাম সে দৃশ্য!

কালীকৃষ্ণ পাণ্ডার মুখে সে শুনেছে যাঁরা প্রথম কামাখ্যায় আসেন তাদের 'কুমারীপূজা' করতে হয়। পাণ্ডাদেরই অষ্টম বা তন্নিম্নবর্ষীয়া মেয়েদেরই কুমারীরূপে পূজার রীতি। অমলের পিতামহও

এই পূজা করেছিলেন বলে তাকে আর নূতন করে করতে হল না। আরো সে শুনেছে, প্রতি বছর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যা মন্দিরের দরজা সাত দিন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এই সাত দিন কোন যাত্রীই আর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ ঐ সময় মায়ের ঋতুস্রাব হয়।

কথিত আছে—কালাপাহাড় নিজের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য মন্দিরে মন্দিরে ধর্ণা দিতে থাকেন। কিন্তু মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়ায় কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভারতের বহু দেব-মন্দির ধ্বংস করে। ৺কামাখ্যা মন্দিরটিকেও সে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। পরবর্তীকালে কুচবিহারের মহারাজা এই মন্দিরটির পুনরায় সংস্কার করান। একদিন এই অম্বুবাচীর সময় তিনি সপরিবারে ৺কামাখ্যা দর্শনে এলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাঁকে ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করেন। তিনি হলেন রাজা; অধিকন্তু বর্তমান মন্দিরের সংস্কারক। তিনি পুরোহিতের কথা শুনবেন কেন! কাজেই তিনি পুরোহিতের কথা অগ্রাহ্য করে জোর করে মন্দিরে ঢোকবামাত্র মুখে রক্ত উঠে মারা যান্। পরে দেবী রাজবংশের সকলকে স্বপ্নাদেশ দেন, যেন বংশের কেউ এই মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত দর্শন না করেন। সেইথেকে রাজবংশের কেউ যতদূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখতে পাওয়া যায়, সেই দূরত্বের পর আর অগ্রসর হন না। এই ঘটনা কতদূর সত্য তা ঐতিহাসিকরাই বলতে পারেন।

মন্দিরের অপর একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে এখানে কোন মেষ বলি হয় না। পারাবৎ বলিই এখানে প্রচলিত! সেইজন্য মায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন এখানে আটটি পারাবৎ বলি হয়। এই বলির মাংসকে বলে মহাপ্রসাদ। এই প্রসাদ খেলে মহাপুণ্য হয়।

যেটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, সেটি হচ্ছে, তান্ত্রিক পূজার স্থান হলেও এখানকার পাণ্ডা অনেকেই বৈষ্ণব এবং বিষ্ণু পূজার স্থান পুরুষোত্তমের পাণ্ডারা অনেকেই শাক্ত।

সেদিন ছিল শনিবার, তার উপর অমাবস্যা! আজ রাত্তে কালীকৃষ্ণ ভৈরবের পূজা দেবার জন্য যাবেন উমানন্দ ভৈরবে। অনেকে উমানন্দ ভৈরবকে রাধানন্দ ভৈরবও বলে থাকেন। এখানকার শিব মন্দিরটি বড়ই জাগ্রত। যাঁরাই ৺কামাখ্যা দর্শনে আসেন, তাঁদের ভৈরব উমানন্দেরও পূজা দিতে হয়। খবরটা জানতে পেরে অমলও কালীকৃষ্ণের কাছে বায়না ধরল সেও সঙ্গে যাবে। কালীকৃষ্ণও আপত্তি না করে শুধু একটু হাসলেন।

গৌহাটি শহরের মুখোমুখী ব্রহ্মপুত্র নদীর ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ের উপর উমানন্দ ভৈরবের মন্দির। কেউ কেউ কামাখ্যার মন্দির থেকে দ্বিতীয় পথটি ধরে সোজা নেমে আসেন ব্রহ্মপুত্রের ধারে। কেউ কেউ আবার পাণ্ডু থেকে নৌকাযোগে এই পর্যন্ত এসে, এখান থেকে আবার রওনা হন উমানন্দের দিকে। যে পথটি সবচেয়ে সোজা, সেটি হল পাণ্ডু থেকে মোটরে গৌহাটি শহরে এসে সেখান থেকে নৌকাযোগে পাহাড়টির গায়ে ভেরবার চেষ্টা করা। কিন্তু বিপদ হল, ছোট্ট পাহাড় হলে কি হয়, এটা একটা সম্পূর্ণ পাথরের পাহাড়। কাজেই ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বান যখন এর গায়ে এসে উপ্ছে পরে তখন সেখানে জলের ও পাহাড়ের গায়ের সংযোগস্থলে একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়; আর সেই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে যদি কোন নৌকা একবার গিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই, একেবারে যাত্রীসমেত তলিয়ে যাবে পাহাড়ের তলে। তাই, অতি সাবধানে স্রোতের ধারা বিবেচনা করে পাকা মাঝিরা পাহাড়ের গায়ে নৌকা ভেরাতে সমর্থ হয়।

কালীকৃষ্ণ অমলকে নিয়ে এসে পৌঁছাল পাহাড়ের গায়ে। ধাপে ধাপে পাথরের খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে তাঁরা উপরে উঠে এলো। উপরটা সমতল, মাঝখানে প্রকাণ্ড শিবমন্দির। পাহাড়ের উপরটায় অনেক গাছপালাও আছে। হঠাৎ 'হুক্কু হুক্কু' ডাক শুনে অমল ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল হাজার হাজার উল্লুক যাত্রীদের

দেখে গাছে গাছে ডাল ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে আর ঐ রকম শব্দ করছে। এদের গায়ের রং মিস্‌কালো, আকৃতি বাঁদরের মত কিন্তু এদের লেজ নেই, আর, এদের চলবার ভঙ্গিটিও হচ্ছে ভালুকের মত রাজসিক কায়দায়। এরাই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। যাত্রী দেখলে এরা খাবারের আশায়, বিশেষ করে কলা পাবার জন্যই ঐরকমভাবে উল্লাস করতে থাকে। বহুদূর থেকে এমন কি ওপাড়ে গৌহাটি সহর থেকেও এদের এই উল্লাসধ্বনী শুনতে পাওয়া যায়। যাত্রীদের এরা কোন ক্ষতি করেনা, নির্ভয়ে এসে ওরা যাত্রীদের হাত থেকে খাবার নিয়ে যায়। পাহাড়টির পারিপার্শ্বিকতা অমলের মনে আনন্দ সঞ্চার করল।

সারারাত ধরে কালীকৃষ্ণ তান্ত্রিক উপাচারে শিবের পূজা করলেন, অমল তার পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে তাঁর কার্যকলাপ দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে পূর্বাকাশ ফর্সা হতে লাগল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কালীকৃষ্ণ অমলকে নিয়ে ফিরে এলেন কামাখ্যায়।

কামাখ্যায় পাণ্ডাদের মধ্যে কালীকৃষ্ণ সবচেয়ে বড় তান্ত্রিক। এই খবরে অমলের মন নেচে উঠল! অমলের ধরণধারণে ও ব্যবহারেও কালীকৃষ্ণের মনে মহা সন্দেহ উপস্থিত হল। তিনি যেন বুঝতে পাচ্ছেন কোন এক অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই অমল এখানে উপস্থিত হয়েছে। কারণ, তন্ত্রের কথা উঠলেই অমলের দুর্দমনীয় আগ্রহ প্রকট হয়ে পড়ে। বহুবার তিনি এটা লক্ষ্য করেছেন।

গভীর রাত।

কালীকৃষ্ণ নিভৃতে শয্যা ত্যাগ করে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একদিকে চলতে লাগলেন। অমল বুঝতে পেরে সেও অতি সঙ্গোপনে একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। কালীকৃষ্ণ এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না।

এ-গলি সে-গলি করে কালীকৃষ্ণ অবশেষে একটি সরু রাস্তা ধরে পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে লাগলেন। অভ্যস্ত পদক্ষেপে কালীকৃষ্ণ নানা বাধা অতিক্রম করে নিঃশব্দে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

চারদিকে ঘুরঘুটে অন্ধকার। অতি নিকটের জিনিসও অমলের ভাল করে নজরে পড়ছিল না। সামান্য অসতর্ক হলেই পা ফস্‌কে একেবারে শত শত ফুট নীচে পড়ে যাবার আশঙ্কা। আবার সামনের দিকেও নজর রাখতে হবে তাকে, যাতে কালীকৃষ্ণের ছায়ামূর্তি ক্ষণিকের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। এই গভীর রাতে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে অচেনা পথে অগ্রসর হওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তা' যারা এ অবস্থার মধ্যে না পড়েছে তারা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারবে না। ক'লকাতার ছেলে সে। আজন্ম শত শত বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত পিচ্‌ঢালা রাজপথে চলার অভ্যাস তার। কিন্তু ঘটনা বিড়ম্বনায় আজ তাকে যে পথে অগ্রসর হতে হচ্ছে, তা' সত্যিই যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি চমকপ্রদ। শুধু মনে অগাধ ভক্তি নিয়ে মায়ের নাম স্মরণ করেই সে এই কঠিন যাত্রাপথ পাড়ি দেবার চেষ্টা করছে।

এক ঘণ্টারও অধিককাল এইভাবে নেমে আসবার পর হঠাৎ কালীকৃষ্ণ ডানদিকে সরে গিয়ে একটিগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অমল কিছু বুঝতে না পেরে ছায়ামূর্তির খোঁজে সতর্ক দৃষ্টিতে একটু দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। কালীকৃষ্ণকে পাশ কাটিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবার অব্যবহিত পরেই একটি চাপা গুরুগম্ভীর আদেশে অমলের বুক শুকিয়ে গেল। তার কানে এল পাশের ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন বলল, "দাঁড়াও।"

অমল ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াতেই কালীকৃষ্ণ পাশ থেকে ধীরে ধীরে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। একমুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে কালীকৃষ্ণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাচ্ছ, এ পথে?"

"আপনার কাছে।"

"আমি কোথায় যাচ্ছি ?"

"তা' তো জানি না।"

"আমার কাছে কেন যাচ্ছিলে ?"

"দীক্ষা নেব বলে।"

কালীকৃষ্ণ শিউরে উঠলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "পারবে তুমি ?"

অকম্পিত চিত্তে অমল জবাব দিল, "গুরুর আশীর্বাদ থাকলে সবই পারব।"

"মায়ের তাই বোধহয় ইচ্ছা।··বেশ, অনুসরণ কর।" বলে কালীকৃষ্ণ পুনরায় অগ্রসর হলেন।

অমল উদ্বেলিত আনন্দে তাঁর অনুসরণ করল।

আরো কিছুক্ষণ নেমে আসার পর কিসের একটা চাপা গুরুগম্ভীর শব্দের প্রতি অমলের মন আকৃষ্ট হল। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। চারদিক দেখেও অমল কিছু ঠাওর করতে পারল না।

অমল এবার কালীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করল, "ও কিসের শব্দ ?"

"আমরা প্রায় নীচে নেমে এসেছি। ব্রহ্মপুত্রের জল পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ওই রকম শব্দ কচ্ছে।···ভয় পেয়েছ কি ?" কোমলকণ্ঠে কালীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

"না। আপনি সঙ্গে থাকলে ভয় করে না।"

"উত্তম। এস।" বলে কালীকৃষ্ণ এগিয়ে চললেন।

কয়েক ধাপ নীচে নেমেই কালীকৃষ্ণ একটি সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালেন।

বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাতেই অমলের নজরে পড়ল সমতল জায়গাটির এক ধারে যেন একটি ছোট্ট কুটির দেখা যাচ্ছে। অমল মনে মনে ভাবল, এই ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যে ও কুটির কার ? ওতে কে বাস করে ? সেকি এই পৃথিবীরই রক্ত মাংসে গড়া

জীব? না, অপরলোকের কোন অশরীরী আত্মা? তার গা'টা এই সময় কেমন ছমছম করতে লাগল।

কালীকৃষ্ণ অমলকে ইশারা করে ঝাঁপ ঠেলে সেই কুটিরে প্রবেশ করে একটা মোমবাতি জ্বালালেন। তার আলোকে অমল দেখল, ঘরের এক কোণে রয়েছে কয়েকটি মড়ার মাথার খুলি এবং তার পাশেই দাঁড় করান রয়েছে সিঁদুরমাখা একটি ভয়ঙ্কর ত্রিশূল। ঘরের অপর কোণে অমল দেখল একটা জলের কুঁজো রয়েছে, কিন্তু কোন গ্লাস সেখানে সে দেখতে পেলনা। তার পাশেই এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে কয়েকটা কাঁচের বোতল। কিসের বোতল কে জানে! তবে, স্থান-কাল-পাত্র অনুপাতে কক্ষের আসবাব্‌পত্রের চমকপ্রদ মিল আছে। হারমোনিয়াম-বাঁয়া-তবলা থাকলেই বরঞ্চ কক্ষটির অমর্যাদা করা হত।

কালীকৃষ্ণ এরপর গায়ের জামাকাপড় খুলে ঘরের এক কোণে রেখে একটি কৌপিন ধারণ করলেন। ঘরের এক কোণে পূর্বোক্ত বোতলগুলির কাছে গিয়ে তার মধ্য থেকে তিনি একটা বোতল তুলে নিয়ে, ছিপি খুলে, ঢক্ ঢক্ করে কি একটা বস্তু যেন নিমেষে পান করলেন এবং ঘুরে অমলের দিকে ফিরে বললেন, "খাবি?"

কিন্তু অমল কিছু বলবার পূর্বেই তিনি পুনরায় বললেন,—"না থাক্ —আজ নয়।"

এইবার কালীকৃষ্ণ ঘরের অপর কোণে গিয়ে সেই ত্রিশূলটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে অমলের কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি আমার সঙ্গেই যাবি, না, এইখেনে আমার জন্যে অপেক্ষা করবি?"

সমস্বরে অমল উত্তর দিল, "না, আমি আপনার সঙ্গেই যাব। এখানে আমি একা থাকবো না।"

তার এই প্রথম ভয় হ'ল যদি কালীকৃষ্ণ তাকে এখানে অপেক্ষা করতে আবার নির্দেশ দেন!

"কোথায় যাচ্ছি জানিস্?

"না।"

"যদি ভয় পাস্? তাই ভাবছিলুম—একটু খেয়ে গেলে হতো না?···না থাক্, ওর আর দরকার নেই।"

অমল সাহস সঞ্চয় করে জানাল, "না, আমি ভয় পাব না।"

এমন অনেক সময় আসে যখন মনের ভাব গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

"বেশ, তবে আয়!" বলে তিনি ঝাঁপ ঠেলে পুনরায় বাইরে বেরিয়ে এলেন। অমল ছায়ার মত তাঁর অনুসরণ করল। সময় বিশেষে আত্মরক্ষার জন্য ভয়ঙ্করেরও অনুগামী হতে হয়।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে কালীকৃষ্ণ অগ্রসর হতে লাগলেন, পেছনে অমল যেন গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যেও যেন ত্রিশূলের মাথার সিঁদুরের অস্তিত্ব অমলের নজরে পড়ছিল। হাতে ঐ ভয়ঙ্কর ত্রিশূলটি বজ্রমুষ্টিতে ধরে কালীকৃষ্ণ নামছেন, সোজা নীচের দিকে, যেন মহাকাল। অমলও বসবার ভঙ্গিতে পাহাড়ের বুকে পা ছড়িয়ে অতি সন্তর্পণে নামতে লাগল। কী ভয়ঙ্কর মুহূর্ত!

মনে হল তাঁদের ভয়াবহ যাত্রা বোধহয় শেষ হয়েছে। কানে স্পষ্টই ভেসে আসছে জলের কল্‌কল্ শব্দ। তাতেই মনে হচ্ছে নদীব কাছে তাঁরা এসে পড়েছেন। কিন্তু নদীর অত কাছে যাবার তাদের প্রয়োজন কি! ওখানে কি আছে! কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো কালীকৃষ্ণের! নানা কু-চিন্তায় অমলের মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। সে শুনেছে কামাখ্যায় কালীকৃষ্ণই সবচেয়ে বড় তান্ত্রিক। তান্ত্রিকরাই তো কাপালিক হয়। কাপালিকরা মা কালীর সামনে নরবলি দিয়ে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। নরবলি দেবার পূর্বে তারা উৎসর্গীকৃত মানুষকে জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নেয়। এই সময় নদীর ধারে তাকে এইভাবে নিয়ে আসবার তাঁর অপর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে! হঠাৎ কালীকৃষ্ণের মুখে পূর্বে উচ্চারিত 'মায়ের তাই ইচ্ছা' কথাটি তার মনে পড়ল। এক অজানা আশঙ্কায় তার মন কেঁপে উঠল, বুকের

ভেতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। ভাবল এর চেয়ে কুটিরে অপেক্ষা করাই যেন তার পক্ষে ভাল ছিল। কোন্‌টা যে ভা'ল আর কোন্‌টা যে মন্দ তা বিচার করা তার পক্ষে যেন কঠিন হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত 'মা যা করেন' বেদ বাক্যটি মনে মনে উচ্চারণ করে সে কাঁচ পোকার মত তাঁর অনুসরণ করতে লাগল।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর অমলকে এই মনোযন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। কালীকৃষ্ণও এই সময় দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ টেনে নীচের দিকে কি যেন দেখতে লাগলেন। পরে হাতের ত্রিশূলটিকে তিনি মাটিতে গেঁথে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অমল স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাঁর এইসকল কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল।

কালীকৃষ্ণ এইবার ঘুরে অমলের দিকে ফিরে তাকে আদেশ করলেন, "তুই এইখেনে অপেক্ষা কর্ ; আমি একবার দেখে আসি।"

চমকে অমল জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথায় যাবেন ?"

"কেন ? ওই জলের ধারে !"

"কেন ?"

হেসে কালীকৃষ্ণ জবাব দেন, "কাজ আছেরে। কেন, ভয় পেয়েছিস ? তখন যে সাহসের কথা বলছিলি ! সব ভুলে গেলি বুঝি ! ভয় কি ! আমিতো সঙ্গে রয়েছি !"

লজ্জিত হয়ে অমল উত্তর দিল, "না, ভয় পাইনি, অমনি জানতে চাইলুম।" বলে অমল বোধহয় একটু হাসবার চেষ্টা করল—অন্তত হাসবার মত কোন ভাব প্রদর্শনের আকুল প্রয়াস।

"এই তো মরদের মত কথা। নইলে দীক্ষা নিবি কি করে ? তুই এইখেনে অপেক্ষা কর্, আমি ঘুরে আসছি।" বলে কালীকৃষ্ণ সামনে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেলেন।

অন্ধকারকে লক্ষ্য করেই হ'ক বা কালীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করেই হ'ক অমল হতবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল—শুধু চাপ চাপ অন্ধকার আর শব্দহীন বিভীষিকা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

এবার অমল এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। এতক্ষণ কালীকৃষ্ণ সঙ্গে ছিলেন। পারিপার্শ্বিক কোন আশঙ্কাই তার মনকে অভিভূত করতে পারেনি। শুধু তাঁকেই যা ভয় ছিল তাঁর বিচিত্র ব্যবহারের জন্য। কিন্তু এখন এই গভীর নিশিতে নির্জন বনমধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে তার মনের মধ্যে এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হ'ল। কোন সামান্যতম শব্দেও যেন সে চমকে উঠতে লাগল। এদিক ওদিক ফিরে দেখবার পর্যন্ত তার সাহস হচ্ছিল না। কতকক্ষণ যে তাকে এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে তাই বা কে জানে! এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি!

মানুষ এ রকম পরিবেশের মধ্যে পড়লে তার কি করা উচিৎ এমন কোন সূত্র তার জানা নেই যা প্রয়োগ করে সে কিছুটা ধাতস্থ হতে পারত। তবুও যতটা তার পক্ষে সম্ভব ততটাই সে প্রয়োগ কচ্ছে' মানসিক উপদ্রবগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

হঠাৎ দূরে কিসের এক শব্দ শুনে সে সচকিতে নীচে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল শব্দটা নদীর দিক থেকেই আসছে। কিন্তু কিসের শব্দ, তা' সে ঠিক অনুমান করতে পারছে না বা বলা যেতে পারে, নূতন কিছু অনুমান করবার সব শক্তিই সে হারিয়ে ফেলেছে।

আরো কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর এবার মনে হল শব্দটা যেন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হচ্ছে। একটানা একঘেঁয়ে শব্দ। মনে হচ্ছে জল ভেঙ্গে কেউ যেন কোন একটা কিছু টেনে আনছে। সে আবার কি! এই সময় আলাদা করে কোন কিছু আর মনে না হওয়াই ভাল।

এক মুহূর্ত পরে শব্দটা নীচে ঠিক সামনা-সামনি এসেই যেন থেমে গেল। নিশ্বাস বন্ধ করে অমল পরবর্তী ঘটনার জন্য উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। আগ্রহের চেয়ে আতঙ্কের ভাবটাই বরঞ্চ এখানে অধিকতর প্রযোজ্য।

হঠাৎ কালীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর তার কানে এল, "অমল!"

অমল চম্‌কে সেইদিকে তাকাতেই পুনরায় কালীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "অমল, আস্তে আস্তে নেমে আয়। ভয় নেই, আমি এখানে আছি।"

ভয় নেই, বললেই তো আর ভয় উপে যায় না!

তবুও সাহসে ভর করে অমল এবার ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল।

কালীকৃষ্ণ বুঝতে পেরে বললেন, "ডান্‌দিকটা ঘেসে সোজা নেমে আয়। এই যে আমি এখানে।"

দেখেই হ'ক বা কতকটা অনুমান করেই হ'ক অমল এখনও নির্দেশ পালন করছে তার।

নদীর ঠিক ধারে এসে অমল সাশ্চর্যে দেখল কালীকৃষ্ণ সামনেই হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাকে দেখে কালীকৃষ্ণ উৎসাহে বলে উঠলেন, "এসেছিস! বেশ। এবার ধর্‌তো এটাকে দু'জনে মিলে টেনে তুলি? নেমে আয়?"

"ওটা কি?"

"আরে এসেই দেখ না। · ধর্‌ ওই দিকটা।"

'খানা খেতে হবে সাথে' মহাপুরুষদের কথাটার উপর যথেষ্ট সম্মান দিয়ে, অমল একটু জলে নেমে হাত বাড়িয়ে জিনিষটার গায়ে হাত দিয়েই চম্‌কে দু'হাত পিছিয়ে গেল। তার মুখ শুকিয়ে গেল। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে সভয়ে চীৎকার করে উঠল, "কি সর্বনাশ! এ যে একটা মৃতদেহ!"

"তাতে কি হয়েছে! আপাততঃ এটাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। মাকে পেতে চাস্‌ আর তার কাজগুলো কর্‌বিনে? নে, ধর্‌, টেনে তুলি।"

সাংঘাতিক ইঙ্গিত, অনুযোগও বলা যেতে পারে। এরপর

আর কথা চলে না; তাই অমল মন্ত্রমুগ্ধের মত পুনরায় এগিয়ে এসে মরাটার পা দু'খানি চেপে ধরল। তারপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে সেটাকে টেনে যেখানে ত্রিশূলটি পোঁতা আছে সেইখানে নিয়ে এল। মরাটাকে মাটির উপর ত্রিশূলটির ঠিক সামনেই রেখে কালীকৃষ্ণ বললেন, "এবার তুই বস্ ওইখেনে।"

অমল একপাশে গিয়ে বসল। ভাবল, এরপর না জানি কি আদেশ হয়। কিন্তু দৃষ্টি তার এখন অবধি সজাগ।

কালীকৃষ্ণ এবার একধারে সরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে কতকগুলি শুক্‌নো কাঠ এনে ত্রিশূলটির পাশে সাজিয়ে একটা দিয়াশলাই জোগাড় করে এনে, দিল সেই শুক্‌নো কাঠগুলির গায় আগুন ধরিয়ে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনের আলোয় অমল এবার জায়গাটিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল।

ছোট্ট একটু সমতল জায়গা। মনে হল, সদ্য সদ্য ঘাস তুলে কে যেন জায়গাটিকে পরিষ্কার করে রেখেছে।

অমল কৌতূহল দমন করে জিজ্ঞাসা করল, "ঐ সব শুক্‌নো কাঠ এখানে কে রেখেছিল! দিয়াশলাইটাই বা কোথায় পেলেন?"

"আমি যে আগেই একবার এসে সব ঠিক করে রেখে গিয়েছিলুম। মায়ের আদেশ নিতে হবে যে! নইলে ছেলেটা যে বাঁচবে না।" বলে কালীকৃষ্ণ মৃতদেহটাকে ঠিকমত সাজিয়ে নিল।

অমলের কৌতূহল ক্রমশঃই বেড়ে চলল। সে জানতে চাইল, "ছেলেটা আবার কে? আপনি কার কথা বলছেন?"

"গৌহাটি কলেজের প্রফেসার—আমার শিষ্য। তাঁর ছেলের যক্ষ্মা রোগ, প্রায় শেষ অবস্থা। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। তাই একবার মায়ের আদেশ নিয়ে দেখবো যদি কিছু করতে পারি।" বলে কালীকৃষ্ণ মৃতদেহের উপর জোড়াসন করে একটা মাটীর খুরি সামনে নিয়ে বসলেন। সামনেই সেই ভীষণদর্শন ত্রিশূল, আগুনের

আলোয় সিঁদুরের চিহ্নগুলি আরো বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। অমলও সেই দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তিনি এবার অমলকে সময়োচিত উপদেশ দিয়ে হাত দু'টি কোলের উপর রেখে চক্ষু মুদ্‌লেন।

বহুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর এক সময় কালীকৃষ্ণ চোখ খুললেন ও নিকটস্থ মাটীর খুরির মধ্য থেকে কি যেন তুলে নিয়ে সামনের আগুনে নিক্ষেপ করতেই আগুনের শিখা লক্ লক্ করে জ্বলে উঠে তাঁর দিকে তেড়ে এল।

কালীকৃষ্ণ অমনি 'মা মা' বলে চেঁচিয়ে উঠে সামাল দিয়ে আবার চক্ষু মুদে ধ্যানে বসলেন।

এইভাবে তিন তিনবার আগুনে আহুতি দিতেই তিনবারই অগ্নিদেব আহুতি গ্রহণ করলেন না। কিন্তু হতাশ না হয়ে তিনি পুনরায় ধ্যানস্ত হয়ে মাকে আহ্বান করে যেই চতুর্থবার আহুতি দিলেন, অমনি আগুনের শিখাটি এবার সবুজ হয়ে সোজা উপরে উঠে গেল। এর অর্থ এই যে অগ্নিদেব তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এখানে অগ্নিকে সন্তুষ্ট করাই মনকে সন্তুষ্ট করা।

এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। সেই প্রকাণ্ড ত্রিশূলটি যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে মাটির উপর তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল। কালীকৃষ্ণ 'মাভৈ' বলে চেঁচিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে ত্রিশূলটিকে চেপে ধরলেন এবং মাথা তুলে কাকুতিভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললেন, "মা, মুখ রাখিস মা!"

বহুক্ষণ যাবৎ অমল দম্ বন্ধ করে কালীকৃষ্ণের এই সকল ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিল। কিন্তু ত্রিশূলটিকে লাফাতে দেখেই অমল ভয়ে মূর্ছিত হয়ে মাটির উপর পড়ে গেল। কালীকৃষ্ণ শুধু একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলেন।

কালীকৃষ্ণের কাজ শেষ হয়েছে। সে এবার মূর্ছিত অমলের দেহটি কাঁধের উপর তুলে নিয়ে ত্রিশূলটি হাতে ধরে ফিরে চললেন

পাহাড়ের উপর তাঁর সেই কুটিরের উদ্দেশ্যে। মহাতান্ত্রিক কালী-কৃষ্ণের সুগঠিত দেহ যে কতটা সামর্থ তা' তার এই অভিযানেই বোঝা গেল; একটা পূর্ণবয়স্ক যুবকের দেহ আয়াসে কাঁধে ফেলে এইভাবে এগিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ে বনের রাস্তা ধরে, খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর কালাকৃষ্ণ এক নয়।

ধীরে ধীরে তার দেহটি অন্ধকারের মধ্যে নিমেষে ডুবে

বার

নানাস্থানে ঘুরেও যখন অমলের কোন সন্ধান মিলল না, তখন সত্যেন ও পতাই মনে করল—মা কালীর প্রতি যখন আসক্তি ছিল, তখন নিশ্চয়ই অমলকে বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপীঠেই পাওয়া যেতে পারে। যখন খোঁজাই হচ্ছে, তখন ঐ জায়গাটিই বা বাদ থাকে কেন! যেমন ভাবা আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ। একটি চাপা নিশ্বাস ছেড়ে যোগেশবাবু তাদের আশীর্বাদ করলেন যাতে তারা সফলকাম হয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু তারাপীঠে পৌছে তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেও অমলের কোন সন্ধান পেল না। অবশেষে তারা মন্দিরের সেবায়েতের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সেবায়েতের নাম স্বামী সারদানন্দ।

তাদের বক্তব্য শুনে সন্ন্যাসী বললেন, "হ্যাঁ, ওই নামে একটি ছেলে কিছুদিন আগে একবার এসেছিল বটে। তা' সেতো মাস দু'এক আগের কথা।"

উৎসাহিত হয়ে পতাই জিজ্ঞাসা করল, "সে তবে কোথায় গেল? আপনি কিছু সন্ধান দিতে পারেন না?

"নিশ্চয়ই আপনাকে কিছু বলেছিল সে?" সত্যেন বলল।

তাদের এইপ্রকার অধীরতা দেখে সন্ন্যাসী একবার উভয়ের দিকে ভ্রু-কুঞ্চিত করে তাকালেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এরা নিশ্চয়ই যুবকটির আপনজন কেউ হবে। তাই তিনি সস্নেহে তাদের বললেন, তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা করছ ছেলেটি কোথায় গিয়েছে আমি তা' জানি কিনা। আমি জানি বৈকি। আমিই তো তাকে তার অভীপ্সিত পথের সন্ধান দিয়েছি। তোমরা কি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মানসে এসেছ?

পতাই উত্তর দিল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। বাড়ীতে তার মা-বাবা তার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে মনে বড়ই আঘাত পেয়েছেন।"

উদাস কণ্ঠে সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,"আমি তো সবই বুঝতে পারি। কিন্তু বাছারা! সে যে বড় শক্ত ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েছে। ও ঘাট থেকে টেনে আনা কি সহজ হবে! কেউ তো আজ পর্যন্ত পারেনি বাবা!

অনুরোধের সুরে সত্যেন বলল, "বেশ তো, আপনি যদি জানেন সে কোথায় আছে, আমাদের বলুন, আমরা একবার চেষ্টা তো করতে পারব!"

তিনি বললেন, "সে আমার কাছেই এসেছিল। কিন্তু, যা' সে চেয়েছিল, তা' তো আমি তাকে দিতে পারতুম না। তাই, উগ্র তন্ত্র সাধনার দিকে তার গভীর আশক্তি দেখে আমি অবশেষে তাকে কামাখ্যায় যাবার উপদেশ দিয়েছি। বোধহয় সে ঐ দিকেই গিয়েছে।"

"আপনি কি তাকে কোন ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করল।

"না বাবা। আর ঠিকানার প্রয়োজনই বা কি। ওখানে গিয়ে সে নিজেই তার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।"

"আচ্ছা, আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি যা' বললেন আপাততঃ এতেই আমাদের যথেষ্ট হবে।" বলে সত্যেন ও পতাই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে এল।

একটি বৃক্ষের নীচে এসে উভয়ে বসল। উভয়েরই মুখমণ্ডল চিন্তাভারে জর্জরিত। বহু কষ্ট স্বীকার করে অনেক আশা করে তারা তারাপীঠে এসেছিল অমলের সন্ধান পাবে বলে। তাই, সর্বাগ্রে তাদের এই কথাটাই মনে হল—কামাখ্যায় গিয়েও কি তাদের এই রকম হতাশ হয়ে ফিরতে হবে নাকি। কিন্তু তাই বলে চুপ করেও তো

বসে থাকা যায় না। কথাটা যখন কাণে এসেছে তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে বৈকি।

এক সময় পতাই চিন্তাগ্রস্ত সত্যেনকে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, এখন তা'হলে কি করবি? যাবি নাকি কামাখ্যায়?"

"তা' ছাড়া আর উপায় কি! যেতে হবে না? খবর যা' হক একটা যখন পাওয়াই গেছে, তখন দেখতে হবে বৈকি! তুই কি বলছিস্?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করল।

"আমারও ওই মত।...তাহলে এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজই রাতের ট্রেণে রওনা হওয়া যাক্।" পতাই তার অভিমত প্রকাশ করে।

সত্যেন বলল, "কিন্তু যাবার আগে জায়গাটা ভাল করে দেখে নেব না? শুধু মন্দিরটাই দেখলুম। কত পুণ্যের জোর থাকলে তবে লোকে এখানে আসতে পারে। ইচ্ছা থাকলেই কি সকলে এখানে আসতে পারে! ঘটনা পরম্পরায় যখন একবার এসেই পড়েছি, তখন এখানকার সব রহস্য জেনেই তবে যাব।"

"রহস্য মানে?"

"রহস্য নয়? যদিও এটি বাহান্নপীঠের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও সিদ্ধপীঠ বলেই সকলে একে জানে। এই তারাপীঠের আশে পাশে পাঁচটি কি ছ'টি পুরানোক্ত বাহান্নপীঠের অন্তর্গত পীঠ ছড়িয়ে আছে। পুরাণে আছে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই তারাপীঠেই তন্ত্রসিদ্ধ হন। যেখানে তিনি তন্ত্র সাধনা করেন সেই শিলাখণ্ড আজো নাকি বিদ্যমান আছে। তিনিই তারাপীঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও তারা মায়ের একটি শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পুরাকালে এই জায়গাটি এত সিদ্ধ ও জাগ্রত ছিল যে পরবর্তীকালে বহু মহাতান্ত্রিক মহাপুরুষ এই তারাপীঠে এসেই সিদ্ধ হন। ভৃগু, দুর্বাসা, ইদানীং কালেও বিশে ক্ষ্যাপা, মোক্ষদানন্দ, কৈলাসপতি এবং বামাক্ষ্যাপা

এইখান থেকেই সিদ্ধিলাভ করেন। কাজেই জায়গাটা ভাল করে দেখতে হবেনা!" বলে সত্যেন পতাইর দিকে তাকাল।

পতাইরও উৎসাহ জেগে উঠল। কিন্তু প্রশ্ন হল—তাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবেই বা কে আর কোন্‌টার কি রহস্য, বলেই বা দেবে কে! কিন্তু মা যখন একবার তাদের আসবার সুযোগ দিয়েছেন, তখন কি আর ওর জন্য আটকাবে! লোকও জুটে গেল একজন, নাম রাখহরি। মন্দির থেকে কিছু দূরেই তার বাড়ী। তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিকটে এগিয়ে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, "বাবুরা সব ঘুরে দেখতে চান বুঝি? আমি আপনাগেরে সব দেখিয়ে আনবো।"

"তুমি কি করে আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পারলে?" সত্যেন জানতে চাইল।

"এজ্ঞে, আমার তো এই কাজটা বটে—দেখলেই বুঝে নিতে পারি।"

সুতরাং আর কালক্ষেপের প্রয়োজন নেই। রাখহরিকে সামনে রেখে তারা এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়ে সকলে একটি নদী দেখতে পেল। নদীটির দু'পাড় ঘেঁসেই বিস্তৃত বালুর চর জেগে উঠেছে। এই বালুচরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত জলধারা খরস্রোতা। বর্ষাকালে দু'ধারের বিস্তৃত চর প্লাবিত করে বিক্ষুব্ধ জলরাশি ভীমগর্জনে সাগরের দিকে ধেয়ে চলে। নদীর নাম দ্বারকা।

রাখহরি বলে, "ওই যে ও পাড়ে গ্রাম দেখছেন বটে ওটা হল আটলা গাঁ। অনেক বামুন কায়েতের বাস ও গাঁয়ে। ওখানেই ছেল সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী।"

"তিনি আবার কে?" পতাই জানতে চায়।

বিস্মিত চোখে রাখহরি বলল, "সেকি বাবু! আপনারা জানতে লারছেন? মেজ ছেলেটা তো হল বটে বামাক্ষ্যাপা। বামুন বড় গরীব ছেলেন বাবু। কিন্তু ছেলেকে কোন কাজে নাগাতে পারেনি।

ছোটবেলা থেকেই তার ঐ কেমন এক ভাব ছিল বটে। কোন কাজেই মন দিতে লারতো ; কিন্তুক পূজা করবার ধান্দা পেলেই তার উৎসা বেড়ে যেত।"

"খুব ভাল করে পূজা করতেন বুঝি তিনি ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করল।

"হায়রে কপাল !" রাখহরি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল,— "পূজার কোথায় কি ! শুধু জবাফুলগুলো মায়ের পায়ে ছুঁড়ে দিয়েই বলতো—মা, তুই খা, আমি খাই। ব্যস ! হয়ে গেল পূজা ; শুধু খাবার ধান্দা বটে। সাহসেরও বলিহারি বলতে হয় বাবু-মশাইরা !" বলে রাখহরি হাসতে লাগল।

পতাই কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু মা পূজা নিতেন ?"

"তাহলে আর বলছি কি ! একদিন কি হয়েছিল বলি শুনুন।" রাখহরি একবার গলাটা খাঁকারী দিয়ে বলতে লাগল, "—সেদিন পূজার বড্ড ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তুক পুরুৎ ঠাকুরের শরীলটা খারাপ ছেল বলে 'হাউড়ের' উপরেই পূজার ভার পড়ল।

"হাউড়ে আবার কে ?" পতাই প্রশ্ন করে।

"ওই যে গো ! ছোট্টবেলায় পাগলেটে আর বোকা বোকা ছেল বলে লোকে খ্যাপাকে হাউড়ে বলে ডাকতো। বলি শুনুন না—"

"হ্যাঁ বল ?" সত্যেন বলল।

রাখহরি বলে চলল, "ক্ষ্যাপা বাবা তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে মন্দিরে গলেই দেখে ভাঁড়ে ভাঁড়ে খাবার আর ফলমূল সাজান রয়েছে। আর যায় কোথা বাবুমশাইরা। হাউড়ে তখন মন্দিরের দরজা আচ্ছা করে সেঁটে দিয়ে পূজা করতে তো বসল বটে। সোময় কেইটে যায়, দরজা আর খোলে না। বেলা কের্‌মে বেইড়ে চলল। তখন সকলে ব্যাপার কি জানবার জন্যে জোর করে ধাক্কা মেইরে দরজা খুলেই দেখে ক্ষ্যাপাবাবাজীবন সব খাবার আর ফলমূল সব খেইয়েদেইয়ে মায়ের কোলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে চিৎপাত হয়ে

শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মরদের বেটা বটে! মায়ের মুকেও খাবারের দাগ নেগে রয়েছেন। এই না দেখে সক্কলে বামার হাত-মাথা ধরে হিঁচড়ে টেইনে বাইরে নিয়ে এসেই—দে মার। মারের চোটে বামার গা-হাত-পা ফুলে এই ঢোল, বুঝলেন বাবু মশাইরা? তারপর সক্কলে তখন গলা ধাক্কা দিয়ে তাকে মন্দিরের বার করে দিলে।"

"আর, বামাক্ষ্যাপা তখন কি করল?"

"কি আর করবে! দূরে দাঁইড়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে মাকে শাঁইসে বলল—তুই-ই তো রাক্ষুসী আমায় খেতে বললি! খাইয়ে দাইয়ে মার খাওয়ালি? আর তোর দ্বোরে আমি আসবো না বটে, কিছু খাবও না। বইলে সে শ্মশানে গিয়ে বসে রইল।"

"শ্মশান কোথায়? সত্যেন জানতে চাইল।

"চলুন না; সেই দিকেই তো যাচ্ছি। সামনে ওই যে বড় মাঠটো দেখছেন, ওও তো শ্মশানেরই অংগ। আগে মন্দির থেকে এ সক্কলটাই শ্মশানের মধ্যেই ছেল।"

"হ্যাঁ, তারপর কি হল?" পতাই অস্থিরতা প্রকাশ করে।

রাখহরি বলতে লাগল, "এখন ব্যাপার, হল কি—তারামায়ের মন্দিরটি হচ্ছে নাট্টোরের জমিদারীর মধ্যে। মায়ের পূজার সমস্ত বিলি ব্যবস্থাই নাট্টোর এস্টেট্ থেকে হয়। আর, সেই রেতেই নাট্টোরের মহারাণী স্বপন ঘোরে দেখলেন যেন তারামা তাঁর সামনে এসে কেঁদে বলতেছেন—তোর মন্দিরের পুরুৎ আর দরান মিলে আমার ছেলেকে ধরে মেইরে মন্দির থেকে তাইড়ে দিয়েছে। আমি তাকে খেতে বলেছিনু। তাই সে ভোগের পেসাদ খেয়ে আমার কোলে একটু জিইড়ে নেচ্ছিল। সারা দিনরাত সে শ্মশানে উপোস করে বসে আছে। ছেলের খাওয়া না হলে কি আমি খেতে পারি! তাই, আমিও ঢালা উপোস রয়েছি!—শুনেই তো মহারাণীর হয়েছে আর কি! হাতজোড় করে তিনি মাকে বললেন যে তিনি এর বিহিত করবেন বটে; মা যেন এবারের মত তাঁকে ক্ষমা করেন।

মা তখন বললেন—আমার ছেলে আগে না খেলে তো আমি খেতে লারবো! তুই সেই ব্যবস্থা কর্।—রাখহরি থামল।

পতাই বলল, "রাণী মা তারপর কি করলেন।"

"আবার কি! তারপরই মহারাণী তারাপীঠে এইসে দোষীদের সাজা দেলেন আর ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন—তেখন থেকে মায়ের পূজার আগে হাউড়ে ক্ষ্যাপাকে খেতে দিতে হবেক। সাবাস বেটা! এই দেখুন আমরা শ্মশানে এসে গেইছি।" বলে রাখহরি হাত তুলে সামনের দিকে নির্দেশ করল।

বিস্তীর্ণ মাঠ।

মাঠের পাশ দিয়ে দ্বারকা নদী কূল কূল করে বয়ে যাচ্ছে। দূরে মাঠের অপর দিকে দেখা যাচ্ছে ঘন বৃক্ষরাজি—বন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ঘুরে ঘুরে তারা শ্মশানে এক জায়গায় একটা সিমূল গাছের নীচে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা পাকা বেদীর উপর একটা ছোট্ট মন্দির। তার পাশেই রয়েছে আরো একটা অপেক্ষাকৃত ছোট্ট মন্দির।

জিজ্ঞাসুনেত্রে রাখহরির দিকে তাকাতেই লোকটি বলল, "এই বেদীটো হালে তৌরী করা হয়েছে। আগে এখানে একটা খুব বড় পাথর ছেল। নোকে বলে—বশিষ্ঠমুনি এই পাথরটার উপর বসে সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিল। তার পরেও অনেক্কেই এর উপর বসে সাধনা করেছে। ক্ষ্যাপাও তাই করেছেন গো। নোকে আরো বলে যে এই পাথরের উপর বসে যিনি এক নক্ষবার মায়ের নাম জপ করতে পারবে, তিনিই সিদ্ধিলাভ করবেক—"

বাধা দিয়ে পতাই বলল, "—এ আর এমন কথা কি!"

হেসে রাখহরি উত্তর দিল, "বাবু, শুনতে তো খুব সোজা বটে। কেউ তো পারে না।...হ্যাঁ, যে কথাটো হচ্ছিল—এই পাথরের নীচে একটা সুড়ুঙ্গ ছেল। সেটা কোথায় গিয়ে যে শেষ হয়েছেন তা

আজো কেউ বলতে লারে। এখন এই বেদী দিয়ে সেই সুড়ুঙ্গটাকে ঢেকে দিয়ে তার উপুর এই মন্দির তৌরি হয়েছে। ওই দেখুন, মন্দিরের ভেতরে রয়েছেন বশিষ্ঠদেবের সেই পাথরের তারামায়ের মূর্তি। আর ওই পাশের মন্দিরটিই হল বামাক্ষ্যাপার সমাধি-মন্দির। ওইখেনেই বাবাকে পোড়ান হয়েছিল।"

সকলে তখন সেই বেদীর উপর বসে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। মন তাদের উদাস হয়ে গেল।

এই সেই তারাপীঠের মহাশ্মশান।

বিশালতা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে শ্মশানের মৌন বিস্তৃতি মানুষের মনে এনে দেয় এক ভাবগম্ভীর উন্মাদনা। কোলাহলময় জগতের এ যেন একটা ব্যতিক্রম। এখানকার আবহাওয়া মানুষের মনে এক বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়ে তোলে; পার্থিব ভোগব্যসনের কলুষিত আবহাওয়া থেকে তার মনকে টেনে নিয়ে যায় এক ভাবজগতের স্বপ্ন রাজ্যে, যেখানে সে হারিয়ে ফেলে নিজের স্বত্বাকে।

হঠাৎ সত্যেন ও পতাইএর নজরে পড়ল নদীর কোল ঘেঁসে এক জায়গায় যেন চিতা জ্বলছে। একটা উৎকট গন্ধ তাদের নাকে আসতেই সত্যেন রাখহরিকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। রাখহরি বলল, "ওই দেখছেন না ওখানে মড়া পুড়ছে বটে। এ মহাশ্মশানে দিবানিশিই চিতা জ্বলে। কখনো এর বিরাম হবেক নাই। আর এখানে মড়াটো পুরোটাই পোড়ান হয় না। শেয়াল কুকুর ও শকুনের খাবারের জন্যে কিছু অংগ আধপোড়া পড়ে থাকে। সেই আধপোড়া পচা দেহের দুগ্‌গন্ধই আপগার নাকে এসে নেগেছে।"

রাখহরির কথা শুনে সত্যেন ও পতাই বিস্ময় প্রকাশ করে।

সত্যেন তাকে জিজ্ঞাসা করে, "কেন, এখানে মড়া সম্পূর্ণ পোড়ান হয় না কেন?"

রাখহরি বিজ্ঞের মত তাঁকে বুঝিয়ে বলে, "নোকের বিশ্বাস, এখানে পোড়ান হলে আত্মার সংগতি হয়। কাজেই চিতার আগুন

কখ্নো এখেনে নেভে না। আর, ক্ষ্যাপাবাবা রাতদিন এই শ্মশানেই পড়ে থাকতেন গো। এইটাই ছেল তার নীলাভূমি। সঙ্গী ছেল তার লালু, ভুলু, শ্মশান কুত্তার দল, শেয়াল শকুন এই সব। তাগেরে না খাইয়ে তিনি খেতেন না। সেইজন্য, মরা আত্মার সংগত্তির জন্য এখনো নোকে শেয়াল, কুত্তা ও শকুনের খাওয়ার জন্যে শরীলের কিছু অংগ ঐভাবে রেখে যায়। ওই যে গো, দেখতে পাচ্ছেন না—এখানে সেখানে কত্ত মাথার খুলি, হাড় ও পচা মাঁস সব ছইড়ে রয়েছে! দিনের বেলা, তাই আমার সঙ্গে আপনারা এখানে আসতে পেরেছেন। অন্ধকার রাত হলে আপনারা এ বাঁকে এগুতে লারতেন। তখন ভূত, পেত, দানা, দত্যি সব ইচ্ছেমত এখানে ঘুরে বেড়ায়; এইটা তখন তাগেরই রাজত্ব। সারা রাত ধরে চলে তখন এক পিচাশের হুল্লোড়। নানা নরক ভয়ের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি শব্দে এখানকার আকাশ বাতাস সব ভরে ওঠে। দূর থেকেও সেই সব শব্দ শুনে তাজা মানুষগার বুকও ভয়ে শিউরে ওঠে।"

রাখহরির কথা শুনে সত্যেন ও পতাইএর বুকের ভেতর যেন কি রকম করতে লাগল। একটা অস্বস্তির আবহাওয়া তাদের মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এক সময় পতাই বলল, "দেখাতো হল। আর এখানে থাকবার প্রয়োজন কি? এবার ওঠা যাক্!"

অন্য সময় হলে সত্যেন পতাইএর এই প্রকার ভাবান্তরের জন্য কিছু রঙ্গরস না করে ছাড়তো না। কিন্তু নিজের মানসিক অবস্থার কথা মনে করে সে কথাটা বেমালুম চেপে গেল।

রাখহরি বলল, "উঠবেন বলতেছেন? আর একটু ঘুরে দেখবেন না?"

সত্যেন মন্তব্য করল, "আর কি দেখবার আছে এখানে? শুধুই তো মাঠ!"

সমজদারের হাসি হেসে রাখহরি বলল, "মাঠে দেখবার কিছু

নেই বাবু! দৃষ্টি দিয়ে দেখলে'ও বুঝলে আর এখান থেকে নড়তে পারবেন। যাঁরাই এই মাঠকে বুঝেছিলেন গো, তাঁরাই কীর্তি রেখে গেছেন। যাক্, চলুন, ক্ষ্যাপাবাবার মাকে যেখানে পোড়ান হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখিয়ে আনি। ঐতো ঐ সিধে নদীর ধার বরাবর।"

"চল দেখেই আসি। বামাক্ষ্যাপার মাকেও তাহলে এখানেই দাহ করা হয়েছিল ?" বলতে বলতে সত্যেন উঠে দাঁড়াল।

"হ্যাঁ ; ওই তো সেথা, আসুন না—।" বলে রাখহরি এগিয়ে চলল।

এরপর রাখহরি যে সব কথা বলল তার মর্মার্থই এখানে দেওয়া হল।

চলতে চলতে ডানদিকে হাত তুলে রাখহরি দেখাল, "ওইযে বাবু দূরে একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পাচ্ছেন—ওইটে হল মুণ্ডমালীতলা। শাস্ত্রে আছে—রোজ শেষ রাতে তারা মা নূপুর পায়ে ওই ঘরে গিয়ে উঠতেন এবং তাঁর গলার-মুণ্ড মালাটা ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তিনি দ্বারকার জলে স্নান করতে যেতেন। এক সন্ন্যাসী, নিকটেই তাঁর আশ্রম ছিল, রোজ শেষ রাতে নূপুরের ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ শুনতে পেতেন। একদিন রাতে তিনি গোপনে অনুসরণ করে মায়ের সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলেন এবং পরের দিন রাতে যেই মা নদীতে স্নান করতে গেলেন তখনই সন্ন্যাসীঠাকুর ঘরে ঢুকে সেই মালাটিকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মা সব বুঝতে পারলেন। তাই, তিনি আর ফিরলেন না—ঘাট থেকেই অন্তর্ধান করলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর সেই মালাটিকে এনে তারাপীঠের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন ভক্তিভরে তাঁর পূজা দিতে লাগলেন।"

কৌতূহলী হয়ে সত্যেন প্রশ্ন করল, "তারাপীঠের মন্দির-প্রতিষ্ঠার তাহলে এইটাই ইতিহাস ?"

"তা' ঠিক জানিনে বাবু। তবে আর একটি প্রবাদও লোকের

মুখে মুখে চালু আছে। জয়দত্ত নামে এক সদাগর তারাপুর গাঁয়ে এসে তাঁর বজরা নঙ্গর করেন। তখন এ অঞ্চলে কলেরার মহামারী দেখা দিয়েছিল। তারাপুরে পৌঁছেই জয়দত্তের ছেলে কলেরায় মারা যায়।

এদিকে বজরার মাঝি মাল্লারা মাঠে তাদের তাঁবুতে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিল। কয়েকজন মাঝি শাল মাছ কেটে ধোবার জন্য গাঁয়ের দিকে গিয়েছিল। চণ্ডীপুরের কাছে একটা ডোবায় যখন তারা কাটা মাছগুলিকে ধোবার জন্য জলে ডুবিয়েছে, অমনি মাছগুলি জোড়া লেগে জ্যান্ত হয়ে জলের মধ্যে চলে গেল! এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তারা হতভম্ব হয়ে বজরার কাছে ছুটে এল। বজরার মধ্যে তখন কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

মাঝিরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

হঠাৎ মাঝিরা কিছু চিন্তা করে জয়দত্তের মরা ছেলেটাকে তুলে নিয়ে সেই ডোবার কাছে ফিরে এল। জয়দত্তও ব্যাপার কি জানবার জন্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। মাঝিরা যেই ছেলেটাকে ডোবার জলে চুবিয়েছে, অমনি ছেলেটি বেঁচে উঠল। এই ব্যাপারে জয়দত্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন—জীবৎ-কুণ্ডতে জলের নীচে মা অবস্থান করছেন। তাঁকে তুলে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবার নির্দেশও তিনি পেলেন। বলাবাহুল্য, যে ডোবাটিতে জয়দত্তের ছেলেটাকে ডোবান হয়েছিল, সেই ডোবাটির নামই জীবৎ-কুণ্ড।

তখন জয়দত্ত জীবৎকুণ্ডতে ফিরে গিয়ে জলের তলা থেকে একটা কাল পাথরের 'ব্রহ্মশীলা' উদ্ধার করলেন। শিলাটির মাঝখানে এমনই সব খাঁজ কাটা রয়েছে যে, দেখলেই মনে হয় যেন জগন্মাতা সস্নেহে মহাকালকে স্তন পান করাচ্ছেন। তারপরেই জয়দত্ত ব্রহ্মশিলা খণ্ডটিকে নিয়ে এসে যথারীতি শাস্ত্রমতে সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তারামায়ের পূজার ব্যবস্থা করলেন।"

এই পর্যন্ত বলে রাখহরি থামল ও পরে মুরুব্বিচালে জিজ্ঞাসা করল,"—আপনারা যে এলেন, তা, তারামায়ের ভোগ পেয়েছেন ?"

"কৈ, নাতো ! আর আমরা অসময়ে গিয়েছি তো !" সত্যেন বলল।

"এখানকার ভোগের একটু বিশেষত্ব আছে।"

"কি রকম ?"

"মায়ের ভোগে ডিম, পেঁয়াজ, মুড়ি, পায়স, চীনাবাদাম অনেক কিছুই থাকে।" রাখহরি জানাল।

রাখহরির কথা শুনে সত্যেন ও পতাই উভয়েই চম্‌কে উঠল, "সেকি ! মা ওই সব জিনিসে ভোগ নেন ?"

"কেন ? ভক্ত ভক্তিকরে যা' দিয়ে মায়ের ভোগ দেবেন মা তাই নেবেন। আর, খাদ্যদ্রব্যের আবার বিচার কি ! শাস্ত্রেইতো আছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা দশরথও দেবতাদের খাবারের জন্য সকলের মত নিয়ে একটা কচি ঘোড়া বধ করেছিলেন। আবার বাসুদেবের আদেশ নিয়ে পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একটা বুনোশূওর বধ করেছিলেন। তার তুলনায় এ আর এমন কি ! 'বক্কাল' ভোগের নাম শুনেছেন ? কৌতূকভরে রাখহরি সত্যেনের দিকে চাইল।

সত্যেন উত্তর দিল, "না তো ? সে আবার কি ?"

হেসে রাখহরি বলল, ক্ষ্যাপাবাবা মাকে দেবার জন্য নিজে একটি ভোগ তৈরী করতেন। তাতে থাকতো—দুধ, দই, ছানা, আটা, ময়দা, চিংড়ি মাছ, মাংস, কারণবারি এবং আরো নানা রকমের জিনিস। এই ভোগটি বাবা খুব ভালবাসতেন।" রাখহরি চুপ করল।

সত্যেন পতাই, রাখহরির এইসব কথা ঠিক বিশ্বাস করল কিনা তাতে একটু সন্দেহ আছে। তাদের বিদেশী পেয়ে রোজগারের আশায় অনেক আজগুবি কথাওতো সে বলতে পারে। যা'হক তারা

ক্ষ্যাপাবাবার মায়ের দাহস্থান আর কতদূর জানতে চাইলে রাখহরি বলে উঠল, "ওইতো আর এক কদম!……জানেন বাবুমশাইরা, ক্ষ্যাপাবাবার মায়ের নাম ছিল রাজকুমারী দেবী। তিনি বড়ই দুঃখিনী ছিলেন বাবু!"

"কেন?" পতাই প্রশ্নই করে।

রাখহরি বলে চলল, "তিনি মরবার কিছুদিন আগেই তাঁর স্বামী সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মারা গেছলেন। তিনিও মরবার সময় বামাচরণকে কাছে পান নি। ক্ষ্যাপাবাবার ভাল নামই ছিল বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ছোট ছেলে রামচরণই তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন। ক্ষ্যাপাবাবা তখন এই বেদীর ভেতরের সেই শিলার উপর মহা সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ তার কাণে এল বহুদূর থেকে ভেসে আসা শব্দ—বলহরি হরিবোল! ক্ষ্যাপা চমকে নদীর অপর পারে তাকাতেই দেখতে পেলেন যেন বহুলোক একটা শবকে বয়ে এনে নদীর পারে নামিয়ে রাখল। সন্দেহ হতেই তিনি নদীর ধারে এসে দেখলেন সত্যিই তো, এরা তাঁরই আত্মীয় স্বজন! ক্ষ্যাপাবাবা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর মায়ের চিতা তারাপীঠের মহাশ্মশানেই জ্বলবে। যেই ভাবা, সেইমত কাজ। ক্ষ্যাপাবাবা খরস্রোতা দ্বারকা নদীর উত্তাল তরঙ্গের কথা ভুলে গিয়ে 'তারা তারা' বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারামায়ের আশীর্বাদে দেখতে দেখতে তিনি ওপারে গিয়ে উঠলেন। এইসময়ে এই অবস্থায় তাঁকে দেখেই সকলে ভড়্কে গেল।"

সত্যেন প্রশ্ন করে, "কেন্? ভড়্কে গেল কেন?"

"পাগল লোকত? যদি কিছু অঘটন-টঘটন ঘটিয়ে বসে!"

"আচ্ছা তারপর কি হল?"

রাখহরি বলতে লাগল, "বাবা তখন ছোট ভাই রামের সাহায্যে মায়ের মাতৃদেহকে নিজের পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আবার নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং অবলীলাক্রমে নদী সাঁত্রে এসে তিনি

তারাপীঠের মহাশ্মশানেই মায়ের চিতা সাজিয়ে তাঁর শেষ কাজ করলেন।”

“সত্যি! মাতৃভক্তি না হলে কেউ এ কাজ করতে পারে না! বলে সত্যেন উদ্দেশ্যে দু'হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম জানাল।

“মায়ের শ্রাদ্ধটা যে বাবা কিভাবে সারলেন, সেটাতো এখনো শোনেন নি বাবু মশাইরা!” বলে রাখহরি একবার মুরুব্বিচালে উভয়ের দিকে কটাক্ষ করল।

“হ্যাঁ বলুন, শুনবো।” পতাই তার আগ্রহ প্রকাশ করে।

রাখহরি একটা হাই তুলে আরম্ভ করল, “মায়ের শ্রাদ্ধের তো আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। রামচরণ কি করবে কিছুই বুঝতে না পেরে মহা ফাঁপরেই পড়ল। দাদাতো মহাশ্মশানে বসে তারা নামে আকাশ বাতাস তোলপাড় করে তুলছেন। তাঁর কি শ্রাদ্ধের বিষয়ে কোন হুঁস আছে! উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সে শ্মশানে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করল। ক্ষ্যাপাবাবা রামচরণকে দেখেই আদেশ দিয়ে বসলেন—মায়ের শ্রাদ্ধ যেন বেশ ঘটা করেই হয়। পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোককে যেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়ে দেওয়া হয়। ওমা, একি কথা! শুনেই তো রামচরণের হয়েছে আর কি! কিন্তু দাদার কথার অবাধ্য হওয়াও বিপদ। কাজেই রামচরণ ঘরে এসে দাদার কথামতো আনুষ্ঠানিক সব কাজ করে ফেলল। কি হবে, টাকা পয়সার ব্যবস্থা কি হবে, কেনা-কাটা সব কিভাবে হবে তা' ভগবানই জানেন!

এদিকে হয়েছে কি, শ্রাদ্ধের দিন সকাল থেকেই তো ক্ষ্যাপাবাবা শ্মশানে চোখ বুজে বসে আছেন। আর ওদিকে তাঁর বাড়ীতে ভোর না হতেই ভারে ভারে নানারকম খাবার এসে পৌঁছাতে লাগল। দেখেই তো রামচরণের চক্ষু স্থির! এত সব জিনিসপত্তর কোথা থেকে আসছে! কে পাঠাচ্ছে—!”

"সত্যিই তো! এ যেন ভোজরাজি! কেমন করে তা' সম্ভব হল?" পতাই জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল।

"বাবার ব্যাপারই আলাদা। তাঁর সব বড়লোক ভক্তরা মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বাবার বাড়ীতে ভারে ভারে সব জিনিস পাঠাতে সুরু করেছে। এটা যেন তাদের একটা কর্তব্য।"

যাক্, সব ব্যবস্থাই তো হল। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রচণ্ড ঝড়ের নাচন সুরু হল। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টিধারা নেমে আসবার উপক্রম হল। শ্রাদ্ধের সব আয়োজনই বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়! রামচরণ প্রমাদ গণল।

হঠাৎ দেখা গেল ক্ষ্যাপাবাবা ভীমবেগে গাঁয়ের দিকে ধেয়ে আসছে। বাড়ীর কাছে পৌঁছাতেই রামচরণ দৌড়ে গিয়ে আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করল—"কি হবে দাদা!"

—দাদা বলল, "কি আর হবে! সবাইকে খেতে বসিয়ে দে। আমি দ্বোর আগলাচ্ছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! সারা গাঁয়ের উপর দিয়ে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব বয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের খাওয়া শেষ না হল, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রাদ্ধবাসরে একফোঁটা বৃষ্টির জল বা একটু জোর হাওয়াও বইল না। নির্বিঘ্নে সকলে খেয়ে দেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে সত্যেন বলে উঠল, "সত্যিই তিনি মহাপুরুষ! ঐশী শক্তি না থাকলে কি আর এমন হয়!" শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মাথা নত হয়ে এল।

"মহাপুরুষ কি বলছেন বাবু! তিনিই তো ছিলেন তারাপীঠ ভৈরব! এছাড়া আরো কত কি বিভূতি যে তিনি দেখিয়ে গেছেন। কতশত লোকের যে তিনি উপকার করে গেছেন তার কি ইয়ত্তা আছে! মরা লোককেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন।...ঐ দেখুন আমরা এসে গেছি।" বলে রাখহরি একটা চিহ্নিত জায়গার পাশে গিয়ে থামল। সত্যেন ও পতাই তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তারাপীঠের মহাশ্মশান থেকে সত্যেন ও পতাই যখন মন্দিরে ফিরে এল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকেই সকলে দেখতে পেল স্বামী সারদানন্দজী কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। পতাই ভাল করে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "আরে! "সৌরেনদা' না? কি ব্যাপার এখানে?"

সত্যেন টিপ্পনী কাটে, "ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে শেষকালে কি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই সৌরেন উত্তর দেয়, "আরে না, যা ভাবছিস্ তা নয়; মাকে দর্শন করবার জন্যই আসা।"

পতাই ব্যঙ্গ করে, "মা-কে দর্শন করতে এলে কি কাপড়-জামা গেরুয়া রঙে রাঙ্গিয়ে নিতে হয়? যাক্, যার জন্য আমাদের আসা তাকে যখন পেলুমই না, তখন আর খালি হাতে ফিরি কেন, তোমাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে জায়গামত জমা করে দি; তবু কাজের কাজ একটা হবে।"

স্বামীজী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে জানা-পরিচয় আছে। তা' তোমাদের বন্ধুটি তো কথার মাঝে আমাকে এক ভীষণ প্রশ্ন করে বসেছে।"

পতাই জিজ্ঞাসা করে, "কি প্রশ্ন?"

"প্রশ্নটা হল—ভগবান আছেন কিনা। যদি ভগবান থাকবেনই তবে এত পাপ দেখে শুনেও তিনি চুপ করে আছেন কেন? কেউ হয়তো কাউকে ভিখিরী বানিয়ে তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে বেশ বহাল তবিয়তে ভোগ করে যাচ্ছে। আবার দেখতে পাওয়া যায় সমাজবিরোধীরা দিনের পর দিন নানাভাবে গৃহস্থদের ঠকিয়ে যাচ্ছে। তাতে কি তাদের কোন সাজা হচ্ছে?—প্রশ্নটা বড়ই জটিল, তবে মীমাংসার বাইরে নয়।"

সত্যেন সাগ্রহে বলে, "সত্যি, উত্তরটা জানবার জন্য আমাদেরও কম আগ্রহ নেই।' আপনি বলুন।" বলেই সত্যেন অপর বন্ধুদের দিকে তাকাতেই তারাও তার কথার সমর্থন জানাল।

স্বামীজী বলতে থাকেন, "ভগবানের বিচার বড়ই চুলচেরা, কোন অপরাধীই তার বিচার থেকে রেহাই পায় না কখনো। তবে একটু বোঝবার বিষয় আছে। সামান্য অপরাধের জন্য কোন দোষীকে সামান্য সাজা পেতে হয়, যা' গা সওয়া হয়ে যায়। আবার পরকে ঠকিয়ে কেউ হয়তো অবস্থার উন্নতি করেছে। এই অবস্থায় তার কোন সাজা হলে তার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কারণ, কষ্ট সহ্য করা তার অভ্যাস আছে ; সাজা হ'লে না হয় আর একটু বেশীই কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু সেই অপরাধীকে যদি প্রশ্রয় দিয়ে দোষ আরো গভীরতর করে তোলবার সুযোগ দেওয়া হয়, অধিকন্তু তার অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়ে যদি তাকে যথেষ্ট ভোগী করে তোলা যায়, আর সেই সময় তাকে যদি একটা কঠিন ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া যায়, সে ধাক্কা আর সে সহ্য করতে পারে না। সমাজের সাজার চেয়ে ভগবানের সাজাটাই তখন তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং অনুশোচনায় সে তার শেষ দিন গুনতে থাকে। কিন্তু আমরা এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারিনে বলেই ভগবানকে আমরা দোষারোপ করি। কথায় বলে, 'ভগবানের মার দুনিয়ার বার'।"

এই সময় সৌরেন যেন একটু উস্‌খুস্ করতে থাকে। মনে হয়, সে যেন তার কোন মানসিক অব্যবস্থার মীমাংসা-সূত্র পেয়ে গেছে। সে বলে, "ধৈর্যের একটা মূল্য আছে ; কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেই মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।"

স্বামীজী, বলেন, "ধৈর্য্য সীমাহীন, ধৈর্য্যই সাধনা—দেবতার সান্নিধ্যে আসার প্রথম সোপান। এই সোপান যে অতিক্রম করতে পারে সেই সাধক ; সেই জানে দুঃখকষ্টের আবেষ্টনীর মধ্যেই ভগবানের উপলব্ধি আসে, আর, এই আত্ম-উপলব্ধিই সফলতার পথ সুগম করে দেয়। তোমাদের বন্ধু সৌরেন নিশ্চয়ই আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে।" বলে তিনি একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

তের

চারদিনের দিন দ্বিপ্রহরে যখন পতাই ও সত্যেন এসে ৺কামাখ্যা মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াল তখন স্থানটির অভিনবত্বে তারা মুগ্ধ হল। ভক্তিভরে তারা উভয়েই হাতজোড় করে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। দেবতা না টানলে নাকি দেব-দর্শন হয় না। হয়তো বা তাই। নতুবা ৺কামাখ্যা দর্শনের ইচ্ছা থাকলেও কোনদিন যে এ সুযোগ তারা পাবে, এ ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। যে উপলক্ষ্য করে তারা আজ এখানে এসেছে, তা' যেমনি আকস্মিক তেমনি রোমাঞ্চপূর্ণ। একেই বলে ভবিতব্য।

এখন তাদের মনে প্রথমেই যে প্রশ্নটা উদয় হল তা' হল কি করে এবার অমলের সন্ধান পাওয়া যায়। নিতান্ত অপরিচিত জায়গা। এখানে কোথায়ই বা তাকে খুঁজবে তারা, আর কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে।

হঠাৎ কাদের আহ্বানে তাদের চমক ভাঙতেই পেছনে ফিরে তারা দেখতে পেল দু'জন লোক তাদের যেন কি জিজ্ঞাসা করছে।

একজন পুনরায় তাদের জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের কোন পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি?"

সত্যেন উত্তর দিল, "কেন বলুন তো?"

"পাণ্ডা তো দরকার হবে! আপনাদের কেউ কখনো এখানে এসে থাকলে তাঁর এ পাণ্ডাই আপনাদের পাণ্ডা।"

"নাম বললেই আপনারা বলে দিতে পারেন?"

"নিশ্চয়ই। কি নাম বলুন?" অপর পাণ্ডাটি এবার জিজ্ঞাসা করল।

এই সময় সত্যেনের চোখ দু'টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কি এক সম্ভাবনায় তার মন সাড়া দিয়ে উঠল। সে একবার পতাইএর দিকে

কটাক্ষ করে যে নাম বলল, কিছু বুঝতে না পেরে সে ভ্রু-কুঞ্চিত করে একবার সত্যেনকে দেখে নিল।

পাণ্ডাটি তার খাতা খুলে পুনরায় প্রশ্ন করল, "বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন তো?"

সত্যেন বাড়ীর ঠিকানা বলতেই কিছুক্ষণের মধ্যে পাণ্ডাটি তার পুঁথির এক জায়গা নির্দেশ করে বলল, "এখানে ঐ ঠিকানা থেকে যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম লেখা রয়েছে শ্রীরমেশচন্দ্র দে। ইনি কি যোগেশবাবুর কেউ হন?"

"হ্যাঁ, তাঁর বাবার নাম ছিল ঐ।"

তখন পাণ্ডাটি তার হাতের পুঁথি বন্ধ করে বলল, "আপনাদের পাণ্ডার নাম কালীকৃষ্ণ পাণ্ডা।"

সত্যেন তখন তাদের কাছ থেকে কালীকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ীর যথাযথ নির্দেশ পেয়ে পতাইকে নিয়ে সেই দিকে রওনা হল।

রাস্তায় যেতে যেতে পতাই সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করল, "তা' তুই ওদের নাম করলি কেন? তোদের বংশের কারও নাম করলে তো তোদের নির্দিষ্ট পাণ্ডাটারই সাক্ষাৎ পেতি?"

"পেতুম ঠিকই। কিন্তু তাতে তো অমলের কোন হদীস্ পেতুম না! বলে সে কৌতূহলী পতাই'র মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুষ্টুমীভরা মুখে হাসতে লাগল। সে আরো জানাল, "পাণ্ডাটার প্রশ্ন শুনেই আমি বুঝে নিলুম অমলও জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তার বংশের পরিচয় দিয়ে নির্দিষ্ট কোন পাণ্ডার বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই তার দেখা পেতে হলে ঐ পরিচয় দেওয়াই প্রশস্ত পথ। আর হলও ঠিক তাই!"

পতাই এবার সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে সত্যেনের তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা না করে পারল না। সত্যিই! তারও পূর্বাহ্ণেই এ ব্যাপারটা বোঝা খুবই উচিত ছিল। কথাটা মনে হতেই তার লজ্জা বোধ হল।

এক সময় সে বলল, "কিন্তু লোক দু'টি কেমন পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছিল, নারে ?"

সত্যেন উত্তর দিল, "হ্যাঁ আমি তো শুনেছি কামাখ্যার পাণ্ডারা সব বাঙ্গালী। আর, এঁদের বিবাহাদিও সব পাণ্ডাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পাহাড়টি ছাড়া এর বাইরের জগতের সঙ্গে এঁদের কোন সমাজবন্ধন নেই। আমি আরো শুনেছি, এখানকার পাণ্ডারা এত সৎপ্রকৃতির ও ধার্মিক যে, এঁদের পূজা করলেও ফল পাওয়া যায়। ভারতের বেশীর ভাগ দেবস্থানের পাণ্ডাদের নামেই অল্প-বিস্তর অপবাদ শুনতে পাওয়া যায়—কোথায়ও বেশী, কোথায়ও কম। কিন্তু সেদিক থেকে এখানকার পাণ্ডারা বিমুক্ত।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই পথে জিজ্ঞাসাবাদ করে উভয়েই অবশেষে কালীকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ীর দো'র গোড়ায় এসে হাজির হল।

খবর পেয়ে কালীকৃষ্ণ বাইরে এসে তাদের পরিচয় পেয়ে সাদরে তাদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন।

স্নানাদি সেরে মন্দিরে গিয়ে পূজা দিয়ে যখন সকলে গৃহে ফিরে এল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে।

সত্যেন ও পতাইর থাকবার জন্য কালীকৃষ্ণ গৃহেরই একটি প্রকোষ্ঠ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আপাততঃ উভয়েই সেই প্রকোষ্ঠের একধারের একটি তক্তপোষের উপর বিছানা বিছিয়ে আরাম করে বসল। কিন্তু তাদের উৎসুক চোখ সর্বক্ষণই কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সব সময়ই তাদের আশা হচ্ছে, এইবার বুঝি অমলের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু এখন অবধি তারা অমলের কোন হদিস্ বা সাড়াশব্দই পেল না। তবে কি অমল এখানে নেই! এত দূর দেশে এত কষ্ট স্বীকার করে এসে কি তাদের শেষকালে হতাশ হয়েই ফিরতে হবে! কালীকৃষ্ণ তো জেনেছে আমরা অমলেরই আত্মীয়। কিন্তু তিনিও তো কোনো কিছু বলছেন না! ব্যাপারখানা কি! নানারকম দুশ্চিন্তায় তাদের কিশোর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল!

একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পতাই নিম্নস্বরে সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করল, "কিরে ? কি বুঝছিস্ ?"

সত্যেন চোখ বুজে বসেছিল। সে সেইভাবেই উত্তর দিল, "বুঝছি—চিচিং-ফাঁক !"

"মানে ?"

"মানে, পাখী উড়ে গেছে !"

"বলছিস্ কিরে ?" পতাইর কণ্ঠস্বরে হতাশার ভাব।

"আমার তো তাই মনে হয় ! এখানে থাকলে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে এতক্ষণ দেখা হতো। অন্তত, কালীকৃষ্ণও সে কথা বলতেন।"

"এমনও তো হতে পারে সে বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছে।"

সত্যেন উত্তর দিল, "হয়তো তোর কথাই ঠিক। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনের অসাচ্ছন্দতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ও একটা সোজা উপায়। যাক্, পরে কালীকৃষ্ণের কাছ থেকে সব খবরই জেনে নেব। এখন এসো তো ব্রাদার! এ ক'দিন তো শরীরটাকে একটুও বিশ্রাম দাওনি। তার ওপর, পাহাড় ঠেঙ্গিয়ে উঠে আসার দরুণ পা ছু'টো যা' টন্ টন্ করছে বলবার নয়।"

"তা' যা' বলেছিস্। ঠাট্টা করবি বলে এতক্ষণ বলিনি—পা ছু'টো কেমন ফুলেছে দেখ্ ?" পতাই তার পা ছু'টো বার করে দেখাল।

"তা' আর কি হবে ! আমরা তো আর এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোর্কে নই !" বলে সত্যেন পতাইর পায়ের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে পুনরায় বলল, "—ও কিরে ? পা ছু'টো তোর অত ফুলে উঠেছে ! মাইরি, দেখতে যা' হয়েছে। তবে বরাবর এ অবস্থা থাকলে মন্দ হয় না।" সত্যেন হাসতে লাগল।

"তা' যাই বলিস্, আমি তো ভাই শুয়ে পড়লুম। শরীর আর বইছে না।" বলেই পতাই ধপাস্ করে বিছানার উপর শরীরটাকে ছুঁড়ে মারল।

"আপাততঃ আমারও ঐ মত।" সত্যেনও তার অনুসরণ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ে গভীর নিদ্রায় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে কালীকৃষ্ণ এসে ডাকতেই উভয়ে ধড়্‌মড়্‌ করে বিছানার উপর উঠে বসল ও হাই তুলে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "তা বাবারা, একটু চা-টা চলবে না ?"

এ যেন চাতক না চাইতেই জল। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বিজ্ঞজনেরা কি ব্যবস্থা দেবেন বলা যায় না, তবে ব্যবহারিক জীবনে এটা যে নিতান্ত প্রয়োজন তা' অনস্বীকার্য। তাই, এ হেন সময়ে এমন একটি মধুর 'অফারের' সম্ভাবনায় কোনরূপ বিরূদ্ধমন্তব্যের অবকাশ না রেখে সত্যেন কৃতজ্ঞতাভরে উত্তর দিল, "তা' যদি কোন অসুবিধা আপনাদের না হয় দিতে পারেন। আমরা চা খাই।"

"নিশ্চয়ই! আমার এখানে যখন উঠেছ, যখন যা' দরকার হবে তখনই আমায় জানাবে। তোমরা মুখহাত ধুয়ে নাও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে কালীকৃষ্ণ বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু উঠে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আসবার দৈহিক সংগতিও যেমন তাদের ছিল না, মানসিক কোন প্রেরণারও তেমনি যথেষ্ট অভাব ছিল।

বেশীক্ষণ তাদের এই মনোযন্ত্রণা ভোগ করতে হল না। দেখা গেল একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে একটা থালার উপর দু'বাটি চা ও অপর একটি প্লেটে কয়েকটি বিস্কুট নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ছেলেটিকে দেখে তাদের আনন্দ পাবার কোন কারণ উপস্থিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। তবে তার উপস্থিতি উভয়ের মনে একটু উৎসাহের সঞ্চার করল।

থালা থেকে চায়ের বাটি ও প্লেটটি বিছানার এক পার্শ্বে নামিয়ে রেখে ছেলেটি যাবার উপক্রম করতেই সত্যেন তাকে প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি ?"

ছেলেটি ফিরে উত্তর দিল, "এজ্ঞে শরৎ।"

"তুমি এই বাড়ীতে কাজ কর ?"

"এজ্ঞে।"

"কতদিন আছ ?"

শরৎ উত্তর দিল, 'তা পেরায় তিন, বছর হবে। কিছু আনবো বলছেন ?"

বাধা দিয়ে সত্যেন উত্তর দিল, "না না, কিছু আনতে হবে না। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।"

শরৎ বলল, "বেশতো, বলুন না। আমায় তো সকলেই জিজ্ঞাসা করে।"

পতাই এই সময় একটু নড়ে বসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কি জিজ্ঞাসা করে ?"

"আমি তো সব জানি কিনা তাই। কি কি এ বেলা খাওয়া হবে, কোথায় কি দেখবার আছে। আমি তো সব নিয়ে গিয়ে দেখাই।" শরৎ বলে চলল।

সত্যেন তাকে ইশারায় কাছে ডেকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে কোন লোক এসেছে ক'লকাতা থেকে ?"

"কৈ নাতো! এক ঐ যা' অমল বাবুই রয়েছেন। আর তো কেউ নেই!"

এই সময় সত্যেন ও পতাই একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল।

সত্যেন আবার জিজ্ঞাসা করল, "তা' তোমার ঐ অমলবাবুকে তো কই দেখতে পাচ্ছি না ? কোথায় আছেন তিনি ?"

"মায়ের মন্দিরে।" শরৎ সংক্ষেপে জানাল।

সত্যেন চমকে উঠল ; জিজ্ঞাসা করল, "মায়ের মন্দির আবার কোথায় ?"

শরৎ একদিকে হাত তুলে নির্দেশ করে বলল, "ওই তো, বাড়ীর পাশে বাগানে। বিরাট কালীমন্দির, খুব জাগ্ গত। অমল দাদাবাবু-তো ওখানে বসেই ধ্যান করেন। খুব ভক্তি।"

"আমরা সেখানে যেতে পারি ?" সত্যেন বলল।

"পাণ্ডা বাবাকে বললে নিয়ে যাবে। তেনারই তো মন্দির।"

গলাটাকে আরো একটু খাটো করে সে আরো জানাল, "পাণ্ডাবাবা কাপালিক—মড়ার উপর বসে ধ্যান করে, কিচ্ছু ভয় পায় না।"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে সত্যেন বলল, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও। আমরা কি কি দেখবো এখানে, পরে তোমায় জানাবো।"

"এজ্ঞে—" বলে শরৎ চলে গেল।

পতাই গম্ভীরভাবে বলল, "কি বন্ধু! শুনলে তো? এবার আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কি?"

'এখানকার পোস্ট্ অফিসটি কোন্ দিকে জানতে হবে।" সত্যেন উত্তর দিল।

"পোস্ট অফিস্?" কেন, কি হবে?"

"এখুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে অমলের বাবার নামে। যা' বুঝলুম, ওঁরা না এলে কোন কাজই হবে না। অথচ আর দেরী করলেও চলবে না।"

পতাই একটু ভেবে উত্তর দিল, "আমি ভাবছি কালীকৃষ্ণকে একবার জিজ্ঞাসা করে আরো কিছু খবর জেনে নিলে হত না?"

"না; যদি ওঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, আমাদের আগ্রহ দেখে হয় তো অমলকে অন্য কোথায়ও সরিয়ে দিতে পারে।"

"হ্যাঁ, কথাটা ঠিক!...আরে যাঃ! চায়ের দফা গয়া!" পতাই হতাশ ভাবে চায়ের বাটির দিকে তাকাল।

হেসে সত্যেন উত্তর দিল, "আরে, ওই নমঃ নমঃ করে আপাততঃ চালিয়ে নাও।.. হ্যাঁ, আর দেরী নয়। চল, বাটি দু'টোকে সাব্ড়ে এই সময় বেরিয়ে পড়ি।"

দিন চলে যায় একটার পর একটা। সত্যেনরাও অস্থির হয়ে পড়ে।

চতুর্থ দিন দ্বিপ্রহরে মালতিদেবী এসে হাজির হলেন কালীকৃষ্ণ পাণ্ডার বাড়ীতে। সঙ্গে আছে প্রতিমা ও সরযু। বৌমার অসুবিধার কথা ভেবেই দয়ালকে তিনি রেখে এসেছেন।

কালীকৃষ্ণকে দেখে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রথমেই মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "কৈ? আমার ছেলে অমল? কোথায়?"

কিছু অনুমান করে কালীকৃষ্ণ বললেন' "ও! তোরই ছেলে অমল? পুণ্যবতী মাগো! এসে পড়েছিস্ যখন, দেখা তখন হবেই। ভেতরে এসে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে কি সব কথা হয়রে!" বলে সকলকে নিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালীকৃষ্ণ বড়ই ফাঁপরে পড়লেন। মায়ের প্রাণ! তাঁকে কি সহজেই বোঝান যায়! ছেলেকে না দেখা পর্যন্ত মালতিদেবী জলস্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।

কালীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "অবুঝ্ হস্‌নি মা! আজ প্রায় তিন মাস্ হল তাকে আমি মন্ত্র দিয়ে শেষ ফলের জন্য তৈরী করে এনেছি। আর মাত্র সাতটা দিন বাকী। আগামী মঙ্গলবার অমাবস্যার রাতেই তার শেষ পরীক্ষা। তার পরেই তুই তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাস্। কিন্তু এই সময় তার মন সামান্য বিভ্রান্ত হলেই সব শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। তাতে যে কাজ আরো দেরী হয়ে যাবে মা! এই ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাক্ মা।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিমাও তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করল, "কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে কি তুমি ফেরাতে পারবে মাসিমা? তাতে শুধু জটিলতাই বেড়ে যাবে। আমার তো মনে হয় "

তাকে শেষ করতে না দিয়ে মালতিদেবী প্রশ্ন তুললেন, "তোরা কাজ কাজ করছিস্, কিন্তু কাজটা কি?"

কালীকৃষ্ণই উত্তর দিলেন, "মা! তুই কি কিছু বুঝবিনে! ছেলেকে তুই এখনও চিনিসনি মা! যাঁকে দেখবার জন্য জগৎ পাগল, যাঁকে

পাবার জন্য সাধু সন্ন্যাসীরা সর্বস্ব ত্যাগ করে, তোর ও ছেলে যে সেই মোক্ষম প্রাপ্তির আশায় বিভোর হয়ে আছে মা! ওর এ সাধনা শুধু এক জন্মেরই ফল নয়। পূর্বজন্মের অসমাপ্ত ফলই এ জন্মে ওকে প্রেরণা জুগিয়েছে। নইলে ও কি আর এমনি আমার কাছে ছুটে এসেছে! ধৈর্য ধর্ মা!"

"আমি তার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করব না। আমি শুধু তাকে একবার দেখবো!" আকুলকণ্ঠে মালতিদেবী বললেন।

"বেশ, তবে তাই হ'ক মা! তোরা আয় আমার সঙ্গে।" বলে কালীকৃষ্ণ এগিয়ে চললেন।

মালতিদেবী সকলকে নিয়ে নিঃশব্দে তাঁর অনুসরণ করলেন। সত্যেন ও পতাইও তাঁদের সঙ্গে চলল।

বাড়ীর পেছনেই সংলগ্ন একটি বাগান। তারই একপাশে একটি ছোট্ট কালীমন্দির। পরিবেশটি দেখলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। বাগান বলতে ফুলবাগান নয়। বিরাট জায়গা ব্যাপি দেবদারুর গাছ আর ঝোপজঙ্গলের সমাহার। অন্যান্য গাছও যে না আছে তা নয়। অর্থাৎ একে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিৎ হবে।

মন্দিরের দরজাটি ঈষৎ ভেজান।

কালীকৃষ্ণ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কি ভেবে তিনি ঘুরে নিঃশব্দে মন্দিরের অপর পাশে চলে গেলেন। যাবার আগে পেছনে ফিরে তিনি অপর সকলকে তাঁর অনুসরণ করতে বললেন।

অপরধারে গিয়ে কালীকৃষ্ণ মন্দিরের জানালার কাছে দাঁড়ালেন। জানালাটি খোলাই ছিল। তিনি সঙ্কেতে সকলকে নিকটে ডেকে জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে বললেন।

মালতিদেবী এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর মন ভেতরে ভেতরে হাহাকার করে উঠল। তিনি দেখলেন, অমল কৌপিন পরে সোজোভাবে জোড়াসন পেতে বসে কোলের উপর হাত দু'খানি রেখে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। সামনেই তার দাঁড়িয়ে

আছে মিশ্‌মিশে কালো পাথরের তৈরী এক শ্মশানকালীর মূর্তি। মায়ের মুখখানি এতই সজীব, যেন মনে হচ্ছে, তিনি অমলের এই কাঁচা বয়েস দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। ভীষণদর্শনা শ্মশানকালীর মুখে যে এত কমনীয়তা থাকতে পারে, মালতিদেবী পূর্বে তা' জানতেন না। তিনি সজল চোখে পার্শ্বে তাকাতেই প্রতিমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল এবং প্রতিমাও তাঁর ব্যাকুলতা সম্যক্‌ উপলব্ধি করে ঠিক এই সময় ইশারায় তাঁকে সংযত থাকতে ইঙ্গিত করল।

সংযত থাকতে বললেই যে সংযত থাকা যায় এমনতো নাও হতে পারে! তবে কোন কিছুর আশঙ্কা করেই মালতিদেবী তাঁর মনের ইচ্ছা দমন করলেন।

তাগাদা দিয়ে অস্থির কালীকৃষ্ণ তাঁদের ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

ঘরে ফিরে মালতিদেবীর অশান্ত মন আরো দিশেহারা হয়ে পড়ল। পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা! এ নিশ্চয়ই অমলের কিশোর মনকে 'তুক' করে তাকে ঘরের বার করবার ফন্দি; পরীক্ষা না হাতি! প্রতিমাও তো মেয়েছেলে! তারও তো একটা বিশেষ দরদ বা আকর্ষণ আছে অমলে উপর; কিন্তু তার মনতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে না! কিন্তু কেন! এই 'কেনর' উত্তর খুঁজতে হলে সারা মহাভারতখানাই খুঁজে দেখতে হয়, আর এতেই পাবে সঠিক উত্তর।

দেখতে দেখতে রাত গভীর হয়ে এলো।

চৌদ্দ

ঘন অন্ধকার রাত্রি।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মনে হয় শীঘ্রই বৃষ্টি হবে।

যখন সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, ঠিক সেইসময়ে কালীকৃষ্ণ ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। অন্ধকারের মধ্যেই সে মাথা উঁচু করে একবার আকাশের দিকে তাকালেন। হয়তো প্রকৃতির ভাবটাকে বুঝে নেবার জন্যই তার এই সতর্কতা।

কিছুক্ষণ কি ভেবে তিনি ধীরে ধীরে বাড়ীর বাইরে এসে বাগানের দিকে চলতে লাগলেন। এই বাগানেই কালীমন্দিরে বিগ্রহের সামনে বসে অমল একাত্মচিত্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। কালীকৃষ্ণ প্রতি রাতেই, যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে তখন সকলের অলক্ষ্যে বাগানে এসে মন্দিরের চারপাশে ঘুরে বেড়ান, যাতে ভয় পেয়ে অমল চীৎকার করলেই তার সাহায্যের জন্য তিনি এগিয়ে যেতে পারেন তাকে সাহস দেবার জন্য। অমাবস্যার রাতে চরম পরীক্ষার দিনও অমলের এগিয়ে এসেছে। আর মাত্র চারটে দিন াকী। তন্ত্রক্রিয়ায় সফলতা যতই এগিয়ে আসে, সাধকের মনের পর তখনই নানা রকম অলৌকিক ও ভৌতিক কার্যকলাপ প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করে। অলৌকিক ও ভৌতিক ার্যকলাপ বলতে এই বোঝায় যে, যাতে সাধক মহামায়াকে হজেই নিজের আয়ত্বের মধ্যে না আনতে পারে সেজন্য নানা রকম পার্থিব ও নৈসর্গিক মায়া-উৎপাতের সৃষ্টি হয়। এইসব উৎপাতের হোতা যে কে তা কে বুঝতে পারে! হয়তো সাধক নিজেই জানে া। তবে তার জানা উচিৎ সাধকের মনকে যাচাই করে নেবার ন্যই মায়ের এই মায়া-খেলা। এই খেলায় জয়ী হতে পারলেই রম পাওয়া। আবার, সময়ের সুযোগ গ্রহণ করে অনেক

অশরীরীদেরও এই সময় তৎপর হতে দেখা যায়। যে এতে ভয় পায়, সেই বিফলতার দিকে পেছিয়ে পড়ে। নূতন করে তাকে আবার মনস্থির করে অতি সতর্কভাবে কাজে এগোতে হয়। এতে কাজ বিলম্বিত হয়। এসব কাজে চিত্তই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। চিত্তের বিকার উপস্থিত হলেই কাজ পণ্ড হবার আশঙ্কা থাকে।

বাগানের মধ্যে ইতস্ততঃ কতকগুলি পাইন ও শাল গাছ এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে। সেইজন্য পূর্বেই বলেছি, স্বভাবতই স্থানটিকে জঙ্গলাকীর্ণ বলে মনে হয়। কালীকৃষ্ণ এইরকম একটি পাইন গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। অদূরে মন্দিরটির অস্তিত্বও তাঁর অভ্যস্থ দৃষ্টিতে তিনি যেন উপলব্ধি করতে পারছেন। অমাবস্যার রাত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; কাজেই মন্দিরটিকে নজরে আনতে হলে কালীকৃষ্ণের মত অভ্যস্ত দৃষ্টি নিয়েই তাকে দেখতে হয়। স্থান-কাল পাত্র, তিনের প্রভাবে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কালীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন। উৎকর্ণ হয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এই আলোকে অতিমাত্র বিস্মিত চোখে কিছু যেন দেখে কালীকৃষ্ণ চমকে উঠলেন। তিনি তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কি এক বিজাতীয় ভাবে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল, তা' যেমনি অলৌকিক, রোমাঞ্চকর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। তিনি স্পষ্টই যেন দেখলেন—কালো শাড়ী পরে একটি নারীমূর্তি মন্দিরের বারান্দার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে কান রেখে কি যেন শোনবার চেষ্টা করছে! যে ভঙ্গীতে মূর্তিটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তাতে মনে হয়, বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিসের আশায় সে যেন অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু কে এই নারী!

এই দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারময় নিশুতি রাতে যে নারী এইরকম

একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশকে মনের আয়ত্তে আনতে পারে, সেতো সাধারণ নারী নয়! শ্মশান ও শক্তি মন্দির—ভীষণতার দিক দিয়ে উভয় স্থানই সম ভীতিব্যঞ্জক। বিশেষ করে রাত্রিকালে এইরকম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে শুধুমাত্র শক্তিসাধক ছাড়া সাধারণ জীবের পক্ষে এসব জায়গায় যাতায়াত করা খুবই দুঃসাহসিক কাজ!

কালীকৃষ্ণ কালবিলম্ব না করে ধীরে ধীরে অতি সতর্কপদে এগিয়ে চললেন মন্দিরের দিকে। বাঘিনী যেমন অপর কোন হিংস্র জানোয়ারকে তার বাচ্চাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের রক্ষার জন্য ঐ জানোয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য ওঁৎ পেতে এগিয়ে যায়, কালীকৃষ্ণও তেমনি ভয়াল মূর্তিতে এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে যাতে কোন অশরীরীই অমলেরধ্যানের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাতে না পারে। তন্ত্র সাধনার মহাক্ষেত্র কামাখ্যার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ তান্ত্রিক তিনি। কোন ভৌতিক উপদ্রবকেই তিনি তাঁর কাজে বাধা জন্মাতে দেবেন না। তাঁর পাকা ঘুঁটিকে কাঁচিয়ে দেবার যে কোন শক্তিকেই তিনি তাঁর তন্ত্র বলে ধ্বংস করে দেবেন। কালীকৃষ্ণের সেই সময়কার ভীতিব্যাঞ্জক ও হিংস্র মুখ দেখলে যে কোন মানুষ ভয়ে আঁৎকে উঠবে! হয়তো এতে তার মৃত্যুও হতে পারে।

অলক্ষ্যে তিনি মন্দিরের নিকটবর্তী হলেন। কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তিনি চারদিকে চাইলেন। কিন্তু কারও অস্তিত্বই সেখানে তিনি অনুভব করলেন না। তবে কি তিনি যা' দেখলেন তা' মায়া! সে কি তবে তাঁর দৃষ্টিবিভ্রমতা! দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি মন্দিরের দাওয়ায় উঠে জানালা দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অমল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তার পাশে তৈল প্রদীপটি ধক্ ধক্ করে জ্বলছে, আর সেই কম্পমান আলোর রশ্মি মায়ের মুখের উপর পড়ে যেন তাঁকে বিভীষিকাময়ী করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, মা যেন দুষ্টুমিভরা চোখে কালীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে তাঁর এই অহেতুক আশঙ্কাকে উপহাস করে মুচকি মুচকি হাসছেন। কালীকৃষ্ণও হাসলেন। এ যেন মায়ে ও

ছেলেতে এক বিচিত্র ভাব-উপলব্ধি। মায়ের ভক্তরাই শুধু এই ভাব উপলব্ধি করবার সার্থক অধিকারী।

কালীকৃষ্ণ দাওয়া থেকে নেমে এলেন এবং মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি একবার মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে এলেন। না, কোথাও তিনি কোন জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলেন না। কিন্তু মনের খট্‌কাও তাঁর দূর হল না। পরক্ষণেই তিনি পুনরায় অন্ধকারে আত্মগোপন করে মন্দিরের উপর কড়া নজর রাখলেন।

এইভাবে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও তিনি আর কিছু দেখতে পেলেন না।

বহুক্ষণ এইভাবে কাটল।

শেষরাতের দিকে তিনি মন্দিরে ঢুকে অমলের ধ্যান ভঙ্গ করে তাকে সে রাতের মত বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিলেন।

পরদিন আবার সেই গভীর নিশুতি রাত।

চারদিককার চাপ চাপ অন্ধকার ভেদ করে একটি ছায়ামূর্তি ধীর পদবিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে সামান্য একটু শব্দেও মূর্তিটি চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক লক্ষ্য করছে। তার এইপ্রকার সতর্কতা ও চালচলন দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে সে কোন নীতিবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত।

মূর্তিটি ধীরে ধীরে মন্দিরের পেছনে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই আশ্বস্তচিত্তে সে মন্দিরের কাছে এসে দেওয়ালে কান পেতে কিছু যেন শোনবার চেষ্টা করল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর সে ঘুরে মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে মাথা নত করে ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করে বারান্দায় উঠে নিঃশব্দে জানালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। যাতে মন্দিরের ভেতরের প্রতিটি জিনিস তার নজরে পড়ে। একভাবে কী-এক আবেশে সে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভক্ত পূজারিণীর মত বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কেন? তার

সঙ্গে এই মন্দিরের সম্পর্কটাই বা কি? কিন্তু কে এ কথার উত্তর দেবে!

এই সেই পূর্বরাতের প্রহেলিকাময়ী নারীমূর্তি।

কিন্তু কেন সে রহস্যময় ভাবে গভীর রাতে মন্দিরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়! কেনই বা সে আকুলভাবে আত্মনিবেদনের অভিব্যক্তিতে জানলার কাছে বসে থাকে। কি সে চায়! তার উদ্দেশ্যই বা কি! তবে কি কালীকৃষ্ণের আশঙ্কাই ঠিক। তাঁর পরমশিষ্য অমলের কাজে বাধা জন্মাবার জন্যই কি কোন অপদেবী নারীরূপ ধরে তাকে ছলনা করতে এসেছে! কিন্তু তার হাবভাবে তো তা' প্রকাশ পাচ্ছে না! বরঞ্চ তাকে দেখে মনে হয়, কী এক গভীর আবেগে, কিসের এক আকর্ষণে সে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কে এই নারী!

কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসে ছিল, বোধহয় সে তা নিজেও জানতে পারেনি। হঠাৎ নিকটবর্তী কোন গাছের উপর থেকে একটা পেঁচা কর্কশস্বরে কেঁদে উঠল এবং সেই শব্দে রাতের সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা যেন খান্ খান্ করে ভেঙ্গে গেল। মনে হল, সেই বিকট শব্দে নারীমূর্তিও চম্‌কে উঠল। তার ভয় হল কেউ হয়তো তাকে দেখে থাকবে। চঞ্চলভাবে সে ধীরে ধীরে মন্দিরের বারন্দা থেকে নেমে এসে একবার চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অতি ত্বরিৎপদে চলতে সুরু করল। কোথায় সে যাবে এই গভীর ভয়ঙ্কর রাতে? সবই যেন ক্রমশঃ দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে উঠছে। তবে কি সে ভয় পেয়েছে?

বাগান থেকে বেরিয়ে মূর্তিটি এবার ডানদিকে ঘুরতেই তার যেন মনে হ'ল, কে যেন তার অনুসরণ করছে। সে আরো জোরে চলতে সুরু করল।

অনুসরণকারীর পদশব্দ এবার অধিকতর স্পষ্ট।

হঠাৎ সে থেমে ঘুরে দাঁড়াল। পদশব্দও যেন অদূরে থেমে গেল। কিন্তু সে কাউকে দেখতে পেলনা। কিন্তু তার নিশ্চিতই মনে হল, কেউ যেন অলক্ষ্যে থেকে তার অনুসরণ করছে। সে আর অপেক্ষা না করে পুনরায় দ্রুতপদে চলতে লাগল।

অনুসরণ-কারীর পদশব্দও এবার দ্রুততর হল।

কিন্তু কি আশ্চর্য!

কালীকৃষ্ণের বাড়ীর উঠোন পেরিয়ে মূর্তিটি একটি ঘরের দাওয়ায় উঠে দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে অনুসরণকারী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। পরে জিনিসটা ভাল করে বুঝে সে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা তার বোধগম্য হল। কিন্তু এই অনুসরণকারী কে?

অনুসরণকারী কালীকৃষ্ণ।

উঠোনের মাঝখানে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কালীকৃষ্ণ। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, তাঁর মুখে তখন ফুটে উঠেছে এক মধুর স্বস্তির হাসি। কিন্তু কেন? স্বস্তির হাসি এইভেবে যে প্রতিমা অমলের প্রতি কতটা আসক্তা। আবার দুঃখও হল এইভেবে যে এর পরিণতি কোথায়, কারণ অমল যে বিবাহিত। তাকি সে জানে না? তবে? এই 'তবের' উত্তর কে দেবে।

কালীকৃষ্ণ ফিরে চললেন মন্দিরের দিকে।

আবার সেই ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমি।

মন্দিরের অদূরে পৌছতেই হঠাৎ তার কানে এল অমলের ভয়-বিহ্বল কণ্ঠস্বর। তিনি তাকে সাহস দেবার জন্য চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'মাভৈ···মাভৈ!' তাঁর এই গুরুগম্ভীর অভয়স্বরে ক্ষণকালের জন্য রাতের নিস্তব্ধতা ব্যাহত হল এবং পরক্ষণেই স্থানটি এক ভীতিপূর্ণ পরিবেশে পূর্ণ হয়ে গেল। কালীকৃষ্ণ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দাওয়ায় উঠে দু'হাতে মন্দিরের দরজার কবাটে ধাক্কা মারতেই যে দৃশ্য তাঁর নজরে পড়ল তাতে তিনি চমকে উঠলেন।

তিনি দেখলেন, অমল উপুড় হ'য়ে দু'হাতে মায়ের পা দু'টি ধরে অবশের মত পড়ে আছে।

তিনি ডাকলেন, "অমল!"

মনে হল, ডাক শুনে অমল যেন একটু চম্‌কে, নড়ে উঠল।

কালীকৃষ্ণ আবার ডাকলেন, "অমল!"

অমল মাথা উঁচু করে মায়ের মুখের দিকে একবার দেখে নিয়ে পেছন ফিরতেই দেখতে পেল দরজার দু'কবাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কালীকৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ভয়হারী মহাকাল। তাঁকে দেখেই কিছুটা আশ্বস্ত হ'য়ে অমল স্থির হয়ে ঘুরে বসল। তার চাহুনিতে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ।

"কি হয়েছে বাবা?"

অমল কম্পিতকণ্ঠে শুধু উত্তর দিল, "মা!—"

স্নেহের সুরে কালীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্‌-মা কি?"

"আমি দেখলুম মা যেন দু'হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন! কাছে আসতেই দেখলুম, মায়ের মুখের উপর ভেসে উঠেছে যেন আর একখানি আব্‌ছা মুখ—বড়ই স্নেহময়, বড়ই কমনীয়! আমি যেই আসক্তভাবে সেই মুখখানির দিকে তাকিয়েছি, আর অমনি মনে হল চারদিকে আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে! ধোঁয়ায় সবকিছু একাকার হয়ে গেল। আমার মনে ভয় হল—আমি চেঁচিয়ে উঠলুম!" অমল থামল। সে তখনও কাঁপছিল।

কালীকৃষ্ণ গম্ভীর হয়েও একটু হাসলেন। বললেন, "পাগলা ছেলে কোথাকার! হাতে পেয়েও সামান্য ভুলের জন্য ছেড়ে দিলিরে! এইটাই হয়! এই সময়টাতেই মনকে ভয়ানক নজরে রাখতে হয়! একটু ভুলেই ভরাডুবি।"

একটু থেকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "—যে মুখখানা তুই দেখেছিস তাকে তুই চিনতে পেরেছিস? সেটা বোধহয় তোর—"

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট! অমলও সেটা বুঝতে পেরে সলজ্জে দৃষ্টি নত করল।

"তোর স্ত্রীর মুখ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবেই দেখ্ কোথায় ভুল করেছিস্।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!"

"বুঝিয়ে না দিলে কি তুই বুঝতে পারবিরে! শোন্—" বলে তিনি এগিয়ে অমলের কাছে বসে পড়লেন। স্নেহময়ভাবে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন,—"জানিসরে, এখন আমি বড় আশান্বিত হয়ে পড়েছি। ভুল যখন হয়েছে বুঝতে পেরেছি, তখন তার সংশোধনেরও উপায় আছে। এই ভূল না হলে তো কোথায় আছিস্ বা তুই কতদূর এগিয়েছিস্ তা বুঝতে পারা যেত না। সাবাস্ বেটা!" বলে তিনি আনন্দে তার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

কৃতজ্ঞচিত্তে অমল জিজ্ঞাসা করল, "আমায় পরবর্তী নির্দেশ?"

"দেবো, দেবো! তার আগে শোন্ বলি। মায়ের রূপ যখন ধ্যান করবি, তখন মাকে যে রূপে চাইবি সেই রূপেই পাবি। মাকে তত্ত্বময়ীরূপেও ধ্যান করতে পারিস, আবার ভাবময়ীরূপেও পারিস। তত্ত্বময়ীরূপে মাকে চাইলে বিরাটত্বের মধ্যে পড়ে যাবি—সহসা মনকে বশে আনতে পারবি না। মায়ের এই তত্ত্বময়ী রূপটা হ'ল অসীম অন্ধকারের মধ্যে এক নিরাকার রূপকল্পনা, যার উপলব্ধি করা বড়ই কঠিন। এ যেন বিরাট এক অন্ধকারের ব্যাপ্তির মধ্যে অন্ধের মত হাতড়ে খুঁজে মরতে হয় সেই আরাধ্যা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভের জন্য। একি আর সোজা কথারে! তার চেয়ে বরং ভাবময়ীরূপেই তাঁকে ধরবার চেষ্টা কর্। মনের মধ্যে যেকোন রূপকে মায়ের রূপকল্পনা করে একেবারে ডুবে যাবি ভাবসাগরে—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রভাবই যেন তোকে বশীভূত করতে না পারে। জগতে শুধু তুই, আর,তোর কল্পনাময়ী। মনে রাখবি—তীব্র সংবেদ বা সংকল্প

নিয়ে যারা কাজে নামে, তাঁরাই যোগের অধিমাত্র বা উত্তম অধিকারী! এ কথা পাতঞ্জলি বলে গেছেন। ভয় কি! আমি তো তোর কাছেই আছি! কারো সাধ্য নেই তোর কাজে বাধা দেয়। কালীকৃষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাইলেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগে অমল বলল, "কিন্তু আবার যদি আমার স্ত্রীর মুখ মনে পড়ে? আবার যদি—"

বাধা দিয়ে কালীকৃষ্ণ বললেন,—"তুই বড় বোকা! ওকেই চেপে ধর্—ওই মুখকেই কল্পময়ীরূপে জাগিয়ে তোল্—ওরই মধ্যে আছে তোর সাধনার লক্ষ্য বস্তু। দেখছিস না—ঐ মা হাসছেন!—মা মা, মুখ রাখিস মা!" কালীকৃষ্ণ গভীর আবেগে দু'হাত তুলে মায়ের দিকে চেয়ে চোখ মুদ্লেন।

পরক্ষণেই তিনি ভাবমুক্ত হয়ে অমলের দিকে ফিরে আদেশ করলেন,—"আজ আর নয়; এখন তোর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। শেষ কাজের পূর্বে আবার তোকে ব'সতে হ'বে এইখানে। সময় আর নেই। পথের কাঁটা অনেক, কিন্তু পথের শেষে পাবি অনাবিল শান্তি।"

পনেরো

আজ অমাবস্যা।

এই দিনটির জন্য কালীকৃষ্ণ এক উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর গৃহের অপর সকলের মনের অবস্থাও তদ্রূপ। বিশেষ করে মালতিদেবীর।

দ্বিপ্রহরের পর থেকেই কালীকৃষ্ণকে আর দেখা গেল না। মালতিদেবী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য বারে বারে তাঁর খোঁজ নিতে লাগলেন। কিন্তু কেউ কোন সঠিক খবর দিতে পারল না। কি করবেন কিছুই বুঝতে না পেরে তিনি সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা এই সময় একবার বাগানে মন্দিরে গিয়ে অমলের সঙ্গে দেখা করলে হত না? দোষ কি?"

সত্যেন কি উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারল না। চট্ করে কিছু একটা বলে ফেলাও নিরাপদ নয় বিবেচনা করে সে চুপ করে রইল। কিন্তু মালতিদেবীর অধৈর্যভাব দেখে অনন্যোপায় হয়ে সে একবার পতাইর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল তারও এ বিষয়ে মৌন অসম্মতি রয়েছে। কাজেই সে মালতিদেবীকে বুঝিয়ে বলল, "মাসিমা! আপনি এই সময় এতটা বিচলিত হবেন না। এখন আপনার মনকে যথেষ্ট শক্ত করা প্রয়োজন। এতদিন যখন পারলেন, তখন আর একটা দিন কি আপনি ধৈর্য ধরতে পারবেন না! এমনও তো হতে পারে, আমাদের সকলের উপস্থিতির কথা মোটেই অমল জানে না! সে ক্ষেত্রে, তার সঙ্গে দেখা করা মানেই তার মনের উপর একটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা। হয়তো আবেগে সে তার কর্তব্য ভুলে যেতে পারে। আমার তো মনে হয়, ও-যুক্তি সকলের পক্ষেই খারাপ হবে।"

"তা' কেনে দাদাবাবু! মাকে দেখলে দাদাবাবুর মনটায় আনন্দও তো হতি পারে? অনেক দিন তো দেখেনি! মা বলে কথা!"

"তুমি চুপ করতো সরযূ! এ অনেক বোঝবার ব্যাপার। এর উপর নির্ভর করছে তোমার দাদাবাবুকে ফিরে পাবার কথা—নইলে, চিরদিনের মত তাকে আমাদের হারাতে হবে।" পতাই মন্তব্য করল।

"তবে থাক্! কিন্তু আমিই বা কি করি? আমার মনটাও তো তোরা বুঝবি?"

মালতিদেবীর করুণ আবেদনে সাড়া দিয়ে সত্যেন বলল, "মাসিমা, কালীকৃষ্ণ পাণ্ডার সেদিনকার একটা কথা কিন্তু আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে। সত্যি! এযুগে এমন ছেলে পাওয়া যেকোন মায়ের ভাগ্যের কথা! আমরাও ভাগ্যবান যে, তার মত বন্ধু আমরা পেয়েছি। কাজেই মাসিমা, ছেলে যদি ফেরে, তবে সে নিজের ইচ্ছাতেই ফিরবে—জোর করেতাকে এপথ থেকে ফেরানো যাবে না। অন্ততঃ আমার তো তাই ধারণা।"

কথা কয়টি বলে সত্যেন দেখতে পেল মালতিদেবীর দু'গণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। অভিভূত হয়ে সত্যেন বলল, "একি মাসিমা! আপনিই যদি এমন করেন—"

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে মালতিদেবী বললেন, "না বাবা, আমি ঠিক থাকবো! তোরা দেখে নিস্—আমি ঠিক থাকবো!...কিন্তু কাজটা কি হবে? তোরা কিছু জানিস্?"

কোন কিছু শোনবার আগেই প্রতিমা ধীরে ধীরে এসে মালতিদেবীর পাশে বসল। কিছু অনুমান করে সে একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে একসময় মালতিদেবীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি কথা এতক্ষণ হচ্ছিল মাসিমা? আমি কিছুই শুনতে পেলুম না!"

হঠাৎ মালতিদেবীর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই সে বিস্ময়ে বলে উঠল, "একি মাসিমা! এই সেরেছো তুমি! আজ যে অমলদা'র শেষ পরীক্ষা! আজই তো তিনি জয়ের মালা গলায়

পরে আমাদের কাছে ফিরে আসবেন! তুমি ভারী বোকা তো!” বলে সে মোহময়ভাবে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগল।

আবেগভরা কণ্ঠে মালতিদেবী তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুই কি করে বলছিস, কাজ শেষ হলেই সে আবার সংসারে ফিরে আসবে? সন্ন্যাসধর্মও তো গ্রহণ করতে পারে?”

“পারে বৈকি—নিশ্চয়ই পারে, একশোবার পারে। কিন্তু মাসিমা, নিম গাছে নিম ফলই ফলে—তা’ যেখানেই তাকে লাগাও না কেন।”

“বুঝলুম না তোর কথা!” মালতিদেবী কী এক সম্ভাবনায় প্রতিমার দিকে তাকালেন।

প্রতিমার চোখে আজ লুকোচুরীর খেলা। কিসে যে তাকে আজ পেয়ে বসেছে, তা সেই জানে। রহস্যময়ভাবে সে মালতী-দেবীর কথার উত্তর দিল, “গুরুই শিষ্যের পরিচিতি। গুরুর নির্দেশই নিদান।”

“কিন্তু গুরু যদি সে নির্দেশ তাকে না দেন?”

“তুমি কিছু বোঝনা মাসিমা। বোঝবার চেষ্টাও কর না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে কালীকৃষ্ণকে সে নির্দেশ দিতেই হবে।” বলে প্রতিমা একবার মাসিমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে দুষ্টুমিভরা কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, “—আচ্ছা মাসিমা, তুমি বোধহয় শুধু একটা কথাই সব সময় ভাবছ, কি করে ছেলেকে তুমি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবে! তাই নয়?”

“জানিনে বাপু!” অভিমানভরে মালতিদেবী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

“রাগ কর কেন মাসিমা! ঐটাই ঠিক।”

মুখ ফিরিয়ে মালতিদেবী বললেন, “আর, তোর বুঝি সেটা ইচ্ছে নয়?”

“কেন নয়, মাসিমা!”

“তবে কেন বলছিস্?”

প্রতিমা এবার দৃঢ়স্বরে জানাল, "আমারও ইচ্ছে, তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কাজের আগে নয়—কাজটি শেষ হলে তবে।"

"হ্যাঁ! কাজ শেষ হলেই সে কিছু আমাদের কাছে ফিরে আসবে—যেমন ফিরে এসেছিল নিমাই—ফিরে এসেছিল নিতাই! আমায় আর বোঝাস্‌নে। এ পথের হিসাব আমি সব জানি!"

"তবেই দেখ মাসিমা, তুমি কোথায় ভুল করছ!"

কিছু বুঝতে না পেরে মালতিদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আমায় কি বোঝাতে চাইছিস্? খুলেই বল্‌না।"

"মাসিমা, তুমি যাঁদের নাম করলে তাঁদের গুরুর পরিচয়টা তুমি নিয়েছ?"

চম্‌কে মালতিদেবী প্রশ্ন করলেন,—"তার অর্থ?"

এই সময় সত্যেন ও পতাইও প্রতিমার এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি বুঝতে না পেরে উৎসুক ভাবে তার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ভাবগম্ভীর ভাবে মাসিমার মুখের দিকে চেয়ে প্রতিমা বলল, "তুমি যাঁদের কথা বললে বা আরো যাঁদের কথা তুমি জানো, তাঁরা যাদের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন সন্ন্যাসী—সংসারত্যাগী। কাজেই, গুরুর নির্দেশেই তাঁরা আর সংসারে ফিরে আসেননি।"

শঙ্কিত মনে মালতিদেবী বললেন,—এখানেও যে সেটা হবে না, তার নিশ্চয়তা কি?"

"আরে—কালীকৃষ্ণ নিজেই যে গৃহী। নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে তো তিনি রায় দিতে পারেন না।"

প্রতিমার মুখে এই আভাষ পেয়ে সকলের চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সত্যিই তো! এ সম্ভাবনার কথা তো তাদের মনে কখনো উদয় হয়নি! সত্যেন ও পতাই মনে মনে প্রতিমার এই নিশ্চিত

ধারণার জন্য তাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না। মেয়েমানুষের কাছ থেকে যে ইঙ্গিত তাঁরা পেলেন, সত্যি তা, অভাবনীয়। মালতিদেবী আবেগে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। কিন্তু তিনি কি একবারও এ কথাটা ভাবলেন যে, যে আশার আকাঙ্খায় তাঁর মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, তাতে প্রতিমার কতটুকু স্বার্থ পূরণ হবে! তিনি মা—ছেলেকে বুকে ফিরে পাবেন। কিন্তু প্রতিমা কি পাবে? কিন্তু প্রতিমা তো বুদ্ধিমতী। সবকিছু জেনে এবং বুঝেও তো তার মন নেচে উঠেছে? এ তবে কিসের অনুপ্রেরণা? এক অন্তর্নিহিত সমবেদনায় মালতিদেবী প্রতিমার মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরলেন। মনে হল, এই সময় একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস যেন প্রতিমার অন্তর ভেদ করে বেরিয়ে এল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। কিন্তু এখনও কালীকৃষ্ণের দেখা নেই। সকলেই যেন এবার অস্থির হয়ে পড়ল। মালতিদেবী ইতস্ততঃ করে সত্যেনকে বললেন, "তুই না হয় একবার চুপে চুপে মন্দিরে গিয়ে দেখে আয় আমার অমু কি করছে? আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইনে। তুই শুধু খবরটা এনে দে!"

"কোথায় তাঁকে পাবে মাসিমা। মন্দিরে? তিনি সেখানে নেই।" সরলভাবে প্রতিমা কথা কয়টি বলে চিন্তাশূন্য দৃষ্টিতে মাসিমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

প্রতিমার কথা শুনে মালতিদেবীর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কি এক অশুভ আশঙ্কায় তার মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি ধরা গলায় প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি করে জানলি অমল মন্দিরে নেই?"

"আমি আবার জানিনে! তাঁর প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আমার কাছে ধরা আছে।"

"কি করে! তুই তাহলে সেখানে যাস্? অমলের সঙ্গে

নিশ্চয়ই তবে তোর দেখা হয়েছে ? বল ? আমার কাছে লুকোস্ নে মা ?”

“তুমি খেপেছ মাসিমা ! আমি কি এতই বোকা যে তাঁর কাছে নিজেকে ধরা দেব ? ইচ্ছে করে কেউ আত্মঘাতী হয় মাসিমা ! আর—”

প্রতিমার কথা শেষ হবার পূর্বেই কালীকৃষ্ণ যেন ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বড়ই চঞ্চল মনে হল ! কিন্তু তাঁর সেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুখে ফুটে উঠেছে সফলতার দৃঢ় আভাষ—কর্তব্যের এক কঠোর ইঙ্গিত।

এই সময় প্রতিমার দিকে চোখ পড়তেই কালীকৃষ্ণ মধুর হাস্যে তার মুখের দিকে তাকালেন। লজ্জায় প্রতিমার গাল দু'টি লাল হয়ে উঠল ও সঙ্কুচিতভাবে সে তার মাথা নত করল।

“মা আমার বড় সাবধানী—”

কালীকৃষ্ণ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কিছু একটা ভেবে তিনি বাক্ সংযম করে ফেললেন। সত্যিই তো ! এ কথাটা তো তার মনে একবারও উদয় হয়নি ! অমল তো বিবাহিত ! তাহলে ? কিছু একটা অনুমান করে প্রতিমার প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর মন ভরে উঠল। কিন্তু আবার একথাও তিনি ভেবে পেলেন না, বুদ্ধিমতি হয়ে কোন্ আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য তার এই ভুলের অভিযান। এই অভিযানের কি মাশুল তাকে দিতে হবে, তা' হয়তো সে জানেও না। কালীকৃষ্ণের মনটাও যেন অযথাই বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল। বিষণ্ণভাবে তিনি মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন।

ক্ষণপরেই মুখ তুলে মালতিদেবীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, “মাগো, তোর সঙ্গে যে আমার একটু পরামর্শ আছে ! আর তো বেশী দেরী নেই ; শুভলগ্ন যে এগিয়ে আসছে মা ! চল্, চল্ মা কথাটা সেরে নিই !” বলেই কালীকৃষ্ণ মালতিদেবীর কক্ষে প্রবেশ

করলেন। মালতিদেবীও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন।

সন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'য়ে এল।

* * *

ঘন অন্ধকারময় গভীর রাত্রি।

আবার সেই বিভীষিকাময় তান্ত্রিক ক্রিয়ার স্থান, যেখানে কিছুদিন আগে কালীকৃষ্ণ শবাসনে বসে মায়ের ধ্যান করেছিলেন। কিন্তু আজ আর কালীকৃষ্ণ নন্—শবাসনে দু'চোখ বুজে একাত্মভাবে বসে আছে অমল। সম্মুখে তার রয়েছে একটা ছোট্ট কুণ্ড। তা' থেকে ধিক্ ধিক্ করে মৃদু আগুনের শিখা বেরিয়ে জায়গাটাকে আরো বিভীষিকাময় করে তুলেছে। আগুনের লাল আলো কপালে ও সারা গায়ে প্রতিফলিত হয়ে বাতাসে দুলে দুলে অমলের চেহারাটাকেও রহস্যময় করে তুলেছে।

চারদিক নিস্তব্ধ—এক পৈশাচিক পরিবেশ যেন প্রভাব বিস্তার করে আছে। কিন্তু এই সময় কালীকৃষ্ণ কোথায়! নিশ্চয়ই আশে-পাশে কোথাও তিনি ওঁৎ পেতে বসে আছেন।

অদূরে কয়েক ধাপ্ উপরে রাস্তার পাশে অন্ধকারে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন সেই মহাতান্ত্রিক কালীকৃষ্ণ। হাতে তার ত্রিশূল—ভয়ঙ্কররূপী সাক্ষাৎ মহাকাল।

তারও আরো কয়েক ধাপ্ উপরে সেই পূর্বদৃষ্ট পর্ণকুটিরে বসে অপেক্ষা করছেন মালতিদেবী। তার পাশেই রয়েছে সত্যেন, পতাই ও প্রতিমা!

মালতিদেবীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতেই উপায়ান্তর না দেখে কালী-কৃষ্ণ অবশেষে এই ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি তাঁকে উপদেশ এবং অনুরোধ করে গেছেন যাতে কোনরকম গোলমাল না করে তিনি শেষ দেখার জন্য যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন। তাঁর সামান্যতম ভুলের জন্যও হয়তো একটা বিভ্রাট ঘটে যেতে পারে।

তবে প্রতিমা সঙ্গে আছে বলে কালীকৃষ্ণের যা'কিছু ভরসা। কিন্তু এত লোক থাকতে তিনি ওই একরত্তি মেয়ের উপরই বা ভরসা করলেন কেন? হয়তো তাঁর এর কোন সতুত্তর আছে।

একটু একটু করে রাত গভীর হতে লাগল। চারদিকে যেন এক প্রেতের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একটুতেই যেন গা ছমছম করে উঠছে। অচিরেই সেখানে অলৌকিক কিছু একটা ঘটবে আশা করে সকলেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল। শুধু প্রতিমা এককোণে ভাবলেশহীন মুখে নিথর হয়ে বসে আছে। হয়তো শেষ দেখবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

নীচে মাঝপথে কালীকৃষ্ণ ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে!

এই সময় কিসের শব্দে কালীকৃষ্ণের শিক্ষিত ও জাগ্রত কান দু'টি খাড়া হয়ে উঠল। চোখ টান করে তিনি সামনে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি।

আবার সেই শব্দ! এবার তিনি বুঝতে পারলেন, অমল বিড়্-বিড়্ করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। তিনি বেশ অনুমান করলেন অমলের কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাষ! তাই তিনি গুটি গুটি করে এমন জায়গায় নেমে এলেন যেখান থেকে হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হলে যাতে তিনি সাহায্য করতে পারেন।

হঠাৎ অমলের ভীতি-বিহ্বল চীৎকার শোনা গেল—"মা—মা!"

কালীকৃষ্ণও 'মাভৈ-মাভৈ' রবে চীৎকার করে অমলকে সাহস দিতে লাগলেন। তাঁর সেই গুরু-গম্ভীর ভয়াল কণ্ঠস্বর রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে দিল। টাল্ খেয়ে সেই শব্দ ভেসে এল উপরে সেই পর্ণকুটিরে, যেখানে মালতিদেবী ও অপর সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলেন। ভয়ে তাঁদের বুক কেঁপে উঠল। উত্তেজনাভরে মালতিদেবী উঠে দাঁড়াতেই প্রতিমা, সত্যেন ও পতাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে আবার কালীকৃষ্ণের সেই সাব-

ধানী কণ্ঠস্বর জেগে উঠল। মনে হল, সে কণ্ঠস্বরে যেন উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান। মালতিদেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকলের বেষ্টনি ছিঁড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন কুটিরের বাইরে। তাঁর দেহে তখন বাঘিনীর বল দেখা দিয়েছে। হিংস্রবেগে তিনি ছুটে আসতে চাইলেন অন্ধকারের আস্তর ঠেলে। অপর সকলেও তাঁকে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে এল।

এদিকে নীচে কালীকৃষ্ণ তখনও চীৎকার করে চলেছেন। কিন্তু মনে হল তাঁর অভয় বাণীতে কোন ফল হল না।

এদিকে অমল তখন মহাভয়ে শবাসন ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে 'গুরুদেব—গুরুদেব' বলে দৌড়াতে দৌড়াতে উপরে উঠতে লাগল যেখানে কালীকৃষ্ণ রয়েছেন।

কালীকৃষ্ণও কয়েক পা নেমে এসেছেন তখন। ঠিক সেই সময় অমল তাঁর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "গুরুদেব—গুরুদেব, আমি পারলুম না—আমি পারলুম না—"

কালীকৃষ্ণ তাকে বুকে চেপে ধরে কোমলস্বরে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলেন, "কি হয়েছে বাবা? কি দেখেছিস্ তুই? আমি যে এখানে রয়েছি বাবা! ভয় কি? আমায় খুলে বল? আমি মহাতান্ত্রিক কালীকৃষ্ণ—যমেরও সাধ্য নেই আমার কাজে বাধা জন্মাবার। বল্, আমায় বল্।"

অমল তখনও কাঁপছে। সে বলতে লাগল, "গুরুদেব! আমি যখন মাকে ডাকছি, ঠিক সেই সময় আমি দেখলুম—এক ভয়ঙ্করী মূর্তি আমাকে গ্রাস্ করবার জন্য বিকট দাঁত বার করে আমার দিকে ধেয়ে এল। আমি তখনও 'মা—মা' বলে ডেকে চলেছি। তারপরেই দেখলুম আমার চারদিকে আগুন জ্বলে উঠল—সেই আগুন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল আর তার মাঝখান থেকে দু'টো ভয়ঙ্কর হাত বেরিয়ে আমার গলা টিপে ধরবার জন্য উদ্যত হল। গুরুদেব! আমি আর থাকতে পারলুম

না, ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—ছুটে পালিয়ে এলুম—!"

"সাবাস্ বেটা সাবাস্! আমি ভাবছিলুম—যুদ্ধই যদি সুরু না হল, শত্রু যদি কাছেই এগিয়ে না এল, তবে তুই যুঝবি কার সঙ্গে! ওরাতো সাম্না-সামনি আসেনা রে! যখন হারবার ভয় আসে, তখনই মরিয়া হ'য়ে ওরা ছুটে আসে গদি দখলের জন্য। ওরা কি চায়রে যে তুই মাকে ওইসব চেলা-চামুণ্ডাদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনিস্! ওরা বুঝেছে যে এবার শক্ত পাল্লায় পড়েছে। তুই যা' – বুকে করে মাকে নিয়ে আয়! ভয় কি! আমি যে তোর জন্যই এখানে পাহারায় রয়েছি—জয়মাল্য আজ তোকে পরতেই হবে! নে,এগিয়ে যা—"

কালীকৃষ্ণের উপদেশও বোধহয় বিফল হয়! অমল ভয়ে উত্তর দিল, "গুরুদেব! আপনি সে দৃশ্য দেখেননি—আমি দেখেছি! আমি —আমি বোধহয় পারব না গুরুদেব—!"

"—অমল!"

অমল চম্কে সাম্নে উপরের দিকে তাকাল।

কালীকৃষ্ণও নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল।

অমলের চক্ষু বিস্ফারিত! সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এখানে এই রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে সে যে তার মাকে দেখতে পাবে, এটা তার কল্পনাতীত। তার হতচকিত মুখ দিয়ে শুধু একটা মৃদু শব্দ উচ্চারিত হল, "মা!"

কালীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন তার এতদিনকার কষ্ট-সাধনা বোধহয় ধূলিসাৎ হয়ে গেল; এবপরও কি তিনি আশা করেন অমলের বিভ্রান্ত মনকে তিনি আবার সংযত, কেন্দ্রীভূত করে কাজে বসিয়ে শেষ রক্ষা করতে পারবেন? তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ল মালতিদেবীর উপর। কিন্তু তিনিও অত সহজেই হাল ছাড়বার পাত্র নন। এবার দেখা যাক কার ক্ষমতা কতদূর,—মাতৃস্নেহ, না, গুরুর কল্পনির্দেশ।

এরপর সকলকে হতচকিত করে মালতিদেবীর গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর

ভেসে উঠল—'হ্যাঁ, বাবা! তুমি কি ভয় পেয়ে আরব্ধ কাজ ফেলে পালিয়ে এসেছ? ছিঃ বাবা! ভয় কি! সামনে তোমার গুরুদেব রয়েছেন, আমরা রয়েছি—ভয় কি!" মালতিদেবী বলতে বলতে তার আরো কাছে এগিয়ে এলেন।

ঘটনা পরম্পরায় বিমুগ্ধ কালীকৃষ্ণের মন উৎসাহে নেচে উঠল। মালতিদেবীকে এই সময় এই অবস্থায় দেখে কালীকৃষ্ণের মনে ভয় হয়েছিল, এই বুঝি সব কাজ পণ্ড হয়ে গেল, তাঁর এতদিনকার স্বপ্ন বুঝি সব বিফল হয়ে গেল, মাতৃভক্ত সন্তান তার ঠিক বিফলতার মুখেই মাকে পেয়ে বুঝি সব ভুলে গিয়ে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করবে! কিন্তু এখন মালতিদেবীর কথায় কালীকৃষ্ণ আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, এমন মা নাহলে কি আর এমন ছেলে পায়! এযে হতেই হবে—হতেই হবে! শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় মালতিদেবীর প্রতি তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি এতক্ষণে বুঝলেন সত্যিই তিনি মা! এক অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে তিনি মালতিদেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অমল আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "মা! তুমি বলছ আমি পারব? তুমি আশীর্বাদ কর—"

"—হ্যাঁ, বাবা! আমি যে মা! আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি—তুমি জয়যুক্ত হও! যাও বাবা আর দেরী নয়—আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। দেখছ না, আমরা সকলেই তোমার মুখপানে চেয়ে আছি! সে তবে কিসের আশায়? মনে রেখো, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যে কাজে প্রবৃত্ত হয়, জগতের কোন শক্তিই তাকে পরাভূত করতে পারে না। যাও—"

অমল মায়ের পদস্পর্শ করে চেঁচিয়ে উঠল, "মা—মা, আমি পারব—আমি পারব, আর আমার কোন ভয় নেই। জয়গুরু—" বলে অমল কালীকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিয়ে উত্তেজনায় পাগলের মত ছুটে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। অধীর আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করছেন। নানারকম অশুভ আশঙ্কায় তাঁদের মন ক্ষণে ক্ষণে ভরে উঠছে।

কালীকৃষ্ণ আর এক ধাপ্ নেমে গিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়ালেন। ওই তো দূরে স্তিমিত অগ্নিকুণ্ডের আলোকে দেখা যাচ্ছে অমল শবাসনের উপর উর্ধমুখে বসে আছে মহাযোগীর মত। তার দেহ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে একটা অদ্ভুত জ্যোতি। কী সুন্দর মূর্তি!

এইভাবে আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ যেন অমলের দেহে কম্পন দেখা দিল। অস্থিরভাবে সে যেন দুলছে—ঠোঁট দু'টি তার থর্থর্ করে কেঁপে উঠছে! ঐ তো তার মুখে ফুটে উঠেছে কী এক আতঙ্কের ছাপ! অমল চেঁচিয়ে উঠল, "গুরুদেব—গুরুদেব"

কালীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তর দিলেন, "—মাভৈ—মাভৈ—"

মালতিদেবী ও অপর সকলে নিস্পন্দ দেহে স্তব্ধ হয়ে ঘটনার পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

কালীকৃষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে অমলকে লক্ষ্য করছেন। হঠাৎ তাঁর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কিসের আনন্দে যেন তিনি আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি একদৃষ্টিতে অমলের সৌম্য-সুন্দর ধ্যানমগ্ন মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

অমলের ভাবাবেশ এসেছে। সুন্দর কচিকচি ঠোঁট দু'টি তার যেন একটু নড়ে উঠল। মুখে যেন তার স্পষ্টই ফুটে উঠল এক স্বস্তির অভিব্যক্তি—যেন স্পষ্ট তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল—"মা, মা!"

অমল কুণ্ডে আহুতি নিক্ষেপ করল।

সম্মুখের কুণ্ডের আগুন যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। একটা সরু নীল রেখা সেই কুণ্ড থেকে বেরিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। অমলের মুখে ফুটে উঠল এক মধুর স্নিগ্ধ হাসি। কালীকৃষ্ণ এ ইঙ্গিত বুঝলেন।

একটি তুড়ি লাফ দিয়ে তিনি 'জয় মা' বলে পাগলের মত ছুটে গেলেন অমলের কাছে।

তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করে মালতিদেবীও প্রতিমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, "জয় মা!"

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিমা মালতিদেবীর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দেহের ভেতর থেকে একটা শাঁখ বার করে তাতে ফুঁ দিল। শাঁখের গুরুগম্ভীর শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ভেসে গেল দূরে বহুদূরে পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি তুলে।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে ক'লকাতায় বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার উপর উঠে বসে যোগেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে, ও লগণ—আরে কে আছিসরে—"

কর্তার ডাকে দয়াল ছুটে বাবুর দোর-গোড়ায় এসে হাজির হতেই যোগেশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "—ওরে দেখ্‌তো শাঁখ বাজছে কেন?" বলতে বলতে তিনি উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

শঙ্খধ্বনি তখনও বেজে চলেছে একটানাভাবে। দয়াল বলল, "বাবু, মনে হচ্ছে বাগানের দিক থেকেই যেন শব্দটা আসছে।"

"চল তো দেখি, ব্যাপারখানা কি!—" বলে তিনি দয়ালকে নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন বাইরের দিকে।

বাগানে পড়েই তিনি দেখলেন, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে লীনা—সৌম্যশান্ত মূর্তি। হাতে তার শঙ্খ।

নিকটে গিয়ে যোগেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌমা! তুমিই শাঁখ বাজাচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ, বাবা!"

"কেন, কি ব্যাপার?"

"ব্রত শেষ হল কিনা তাই—" বলে লীনা নেমে এসে এই প্রথম শ্বশুরকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

যোগেশবাবু হক্‌চকিয়ে গেলেন। মনের উত্তেজনায় তিনি শুধু লীনার মাথায় হাত ঠেকালেন।

তিনদিন পর যোগেশবাবুর বাড়ীর ফটকের কাছে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামলেন মালতিদেবী ও কালীকৃষ্ণ। তারপরেই নামল প্রতিমা ও অপর সকলে।

প্রথমেই সকলে এসে উপস্থিত হলেন বাগানে মন্দিরের কাছে। লীনা তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্য মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

কালীকৃষ্ণই প্রথমে কথা কইলেন, 'মাগো, মা! সহজেই কি তোকে চেনা যায় মা—" বলে তিনি নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই লীনা এক পা সরে গিয়ে বলল, "ছিঃ বাবা! এটা যে দেবতার মন্দির! ...আসুন, বসুন সকলে—" বলে লীনা নিজেও বারান্দার উপর বসে পড়ল!

* * *

সেদিন মঙ্গলবার।

মন্দিরের বারান্দায় উৎসবান্তে এসে বসেছেন সকলে। মালতি-দেবী, কালীকৃষ্ণ, অমল ও প্রতিমা সকলেই উপস্থিত আছেন। অমলের বন্ধুরাও বাদ নেই। আর আছে দয়াল ও সরযূ।

সকলের মধ্যে বসে লীনা কালীকৃষ্ণের কথার উত্তরে বলল, "সংসার-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। জগতের সকলকেই সেবা করবার সুযোগ পাওয়া যায় এই সংসারজীবনের কল্যাণময় নানারূপ আচারের মধ্য দিয়ে। জগৎ বড় সুন্দর—যদি তাকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়। আর, এ দায়িত্ব তো আপনাদেরই। আমার কাজ তো শেষ হয়েছে। প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিমাই ওর পাশে থেকে ওকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে সৎপথে চালিত করবে।" বলে সে একবার অমলের ও পরে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে চোখ মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হল।

সকলে তার সেই ধ্যানমগ্ন সৌম্যসুন্দর মুখের দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ কালীকৃষ্ণ দেখলেন, লীনার দেহ যেন অতি ধীরে ধীরে শূণ্যে উঠছে। বড় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—সকলেই কি তা বুঝতে পারে? কিন্তু কালীকৃষ্ণ মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। তিনি আবেগে চীৎকার করে উঠলেন, "মা—মা! পালাচ্ছিস্ মা!",

তাঁর চীৎকারের প্রতিধ্বনি তুলে অমলও "লীনা—লীনা" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

লীনার ধ্যান-গম্ভীর মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি!

কোন কিছু আশঙ্কা করে সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে লীনার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

———